~ www.amarboi.com ~

মৃণাল সেন

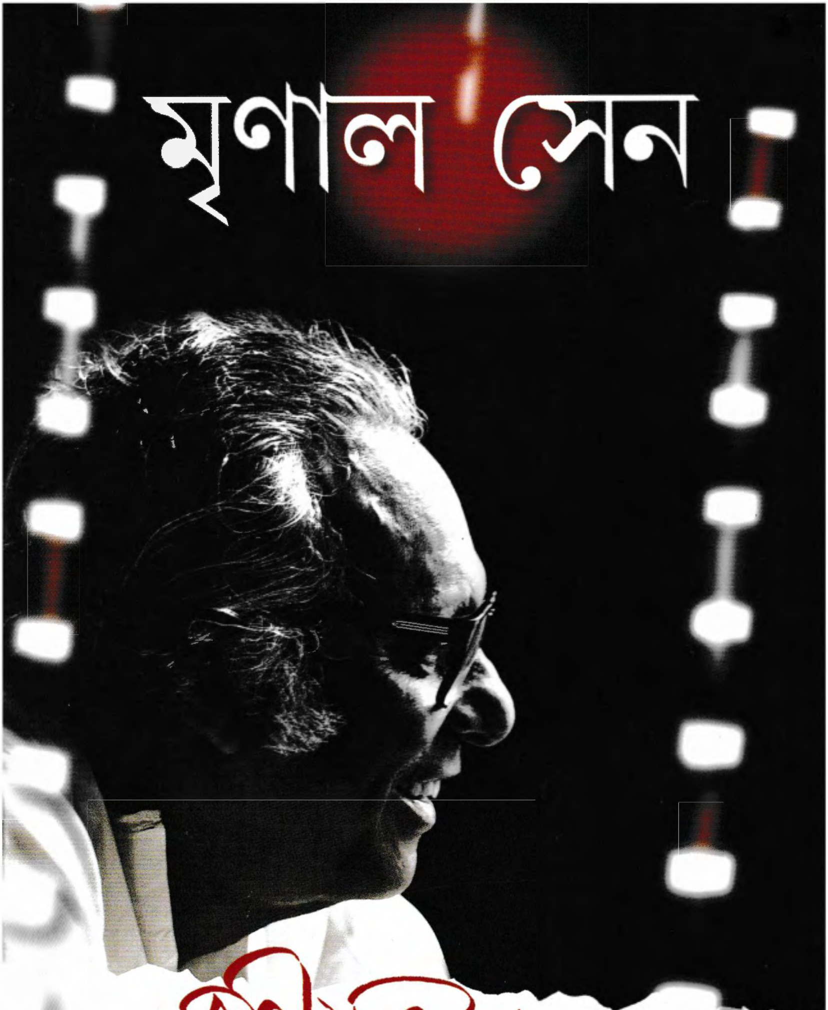

তৃতীয় ভুবন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় ভুবন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় ভুবন

মৃণাল সেন

আনন্দ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'Always Being Born' by Mrinal Sen
গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত
প্রথম প্রকাশ ২০০৪
Stellar Publishers Pvt., Ltd. New Delhi 110015
© Stellar Publishers Pvt. Ltd. 2004
© Photographs: Subhas Nandy, Nemai Ghosh, Aranya Sen

প্রথম আনন্দ সংস্করণ এপ্রিল ২০১১
চতুর্থ মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১৫
© বাংলা সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

গ্রন্থে ব্যবহৃত আলোকচিত্র: সুভাষ নন্দী, নিমাই ঘোষ, প্রতাপ দাশগুপ্ত, অরণ্য সেন

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 978-81-7756-975-9

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং বসু মুদ্রণ ১৯এ সিকদার বাগান স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৪ থেকে মুদ্রিত।

TRITIYO BHUBAN
[Memoir]
by
Mrinal Sen

Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta-700009

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

গীতা

ও

কুণাল, নিশা-কে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

চারদিকে কত কী-ই না দেখি। শুনিও কত কী। পড়ি, লিখি। এই শোনা-দেখা-পড়া-লেখা— এই সবকিছুর মধ্য দিয়ে করবার মতো করিও বেশ কিছু। লেখাজোখা। কেউ বলেন, আত্মজীবনী! না, ঠিক তা নয়। সেসব লিখতে অনেক অনেক রেকর্ড রাখতে হয়। সেই রেকর্ড রাখাটা হয়নি তেমন করে। অনেকটাই স্মৃতির ওপর নির্ভর করতে হয়। আমার ছেলে আমার ব্যাপারটা মোটামুটি জানত। আমাকে একদিন সাবধান করে দিল। শিকাগো থেকে বলল, শিকাগোতেই থাকে, বলল, 'স্মৃতিকে কখনও চোখ বুজে বিশ্বাস করো না, স্মৃতি আসলে রিকনস্ট্রাকশন র‍্যাদার দ্যান বিইং ফোটোগ্রাফিক।' সত্যি বলতে কী, আমি শ্রুতিধর নই, জাতিস্মর তো নই-ই। তাই আত্মজীবনী লিখতে ভরসা পাই না। যদি লিখি তো লিখব অনেকটা ছুঁয়ে ছুঁয়ে, আবছা আলোর মতো। ভুলচুক হয়তো হবে।

তাই হচ্ছে, তাই করছি। স্পষ্টত, আত্মজীবনী নয়, তবে, হ্যাঁ, আত্মশ্লাঘার স্পর্শসুখ পাওয়ার চেষ্টা আদৌ করছি না। একেবারেই না।

আমি সিনেমা নিয়ে ঘর করি। আমি সিনেমার গঠনপদ্ধতি ও পরিবেশ-রচনার জটিল প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িয়ে থাকি। ক্রমাগত পট-পরিবর্তন, নান্দনিক উৎকর্ষ, সিনেমামনস্কতার নানা রঙঢঙে বিশিষ্ট থেকে বিশিষ্টতর হয়ে ওঠার যে ইতিহাস, সেই ইতিহাসের নিত্যসঙ্গী হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। থামা নেই। ঘড়ির কাঁটার মতো। আর, প্রতি মুহূর্তে বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও মননের প্রথাসিদ্ধ নিয়ম ভেঙে বেনিয়মের খেলায় মেতে থেকেছি। যা করেছি, যা করে চলছি, ঠিক বা বেঠিক, পরোয়া করিনি কখনও। ভাবনা কীসের! সিনেমার শেষ কোথায়, আছে কি নেই, কে বলবে? এদেশে ওদেশে সর্বত্র।

এইসব নিয়েই আমার কারবার, আমার লেখাজোখা। আরও কত কী-ই। তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

ছাড়া, শুধুই কি সিনেমা? আমার চারপাশে যত কিছু ঘটছে, ভাল মন্দ, সেইসব ঘটনা বাদ দিই বা কেমন করে!

লিখতে গিয়ে, বলতে গিয়ে, ভাবতে গিয়ে যাকে ছাড়া আমার চলেনি কখনও, হাজারটা কাজের দুঃসহ চাপ সত্ত্বেও যে আমাকে সঙ্গ দিয়েছে আমার চেতনার রাজ্যে, তার কথা আমি ভুলব কেমন করে! আমি বলছি যার কথা সে শিলাদিত্য সেন। নানা কারণে যখনই দেখেছি শিলাদিত্য অনুপস্থিত, তখনই বুঝেছি আমার লেখাজোখার কাজ প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠছে। তবু, হ্যাঁ, বইটি আমারই, একান্তই আমার। এবং আর এক ব্যক্তি, শিলাদিত্যর বন্ধুস্থানীয়, তাঁর কথাও মনে পড়ছে ভূমিকার একাংশে: দেবব্রত নিয়োগী।

মৃণাল সেন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্র থ ম অ ধ্যা য়

শেষ পর্যন্ত সিনেমার রাজ্যেই চলে এলাম!

আশ্চর্য, আমি কোনওদিনই স্বপ্নেও ভাবিনি যে আমি ছবি তৈরি করব। এটা নিছক একটা অ্যাক্সিডেন্ট। কেউ কেউ বলেন, আমি এমন একজন মানুষ, ভাঙতে ভালবাসে যে। কেউ-বা ভাবেন, আমি সবসময় সুন্দর সহজ চিরাচরিত বিশ্বাসকে আঘাত করতে ভালবাসি, শাণিত করি আমার অস্ত্রকে পুরনো ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে, যার পেছনে নাকি তেমন কোনও কারণ নেই। আমি নিজেও ঠিক জানি না যে ওঁরা যা বলেন সেটা কী! কয়েক বছর আগে যখন ওঁরা এই শহরটার নতুন নামকরণের কথা ভাবনাচিন্তা করছিলেন, আমি তখন প্রতিবাদ করেছিলাম। ওঁদের বক্তব্য ছিল যে এ-নামটা, 'ক্যালকাটা', ব্রিটিশদের দেওয়া, সেই ইংরেজ যাঁরা শোষণব্যবস্থা, ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ধারক ও বাহক। আমি তাঁদের প্রশ্ন করি, তা হলে কি এভাবেই আপনারা এই ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারের সঙ্গে লড়াই করবেন?

যাই হোক, আমি তাঁদেরই একজন যাঁরা নাম পালটানোর পক্ষে নয়। কিন্তু এ শহরের যাঁরা তাবড় তাবড় মানুষ অর্থাৎ মন্ত্রী আমলারা, তাঁরা নামটা পরিবর্তন করলেন। কারণ এটা তাঁরা চেয়েছিলেন। এ-নামটার পেছনে তাঁরা এমন কোনও গন্ধ পেয়েছিলেন যে নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সাম্রাজ্যবাদ ও শোষণের গল্প। সুতরাং কাগজে কলমে নামটা বদলে গেল। ক্যালকাটা পুলিশ হল কলকাতা পুলিশ, ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন হল কে এম সি এবং এরপর থেকে আমরা এই শহরকে ইংরেজিতে ক্যালকাটা না বলে বলছি কলকাতা। ঠিক যেমন বোম্বে হল মুম্বই, মাদ্রাজ হল চেন্নাই, ত্রিবান্দ্রম এখন তিরুবনন্তপুরম, কালিকট হল কোজিকোড়। আরও কিছু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। আমার আতঙ্ক যে সংক্রামক ব্যাধির মতো এ-ব্যাপারটা ছড়িয়ে না যায়। এতে যদি ভয়ংকর

দুনিয়ার পাঠক এক হও

পরিস্থিতি হয় তা হলেও অবাক হওয়ারও কিছু নেই। এমনও হতে পারে যে দেশটার নাম হল হিন্দুস্থান। নামটা বদলে গেল। ভারত আর থাকল না।

যে নামই হোক— কলকাতা বা ক্যালকাটা, আমার শহর আমারই। খারাপ, ভাল, উদাসীন যাই হোক না কেন, এ এমন এক শহর যাকে ছিঁড়েখুঁড়ে খাচ্ছে নিন্দুকেরা, যা আবার ভালবাসাও পেয়েছে প্রচুর। এটা ঠিক যে আমি এই শহরে জন্মাইনি কিন্তু মানুষ হয়েছি এখানেই। এই শহরের যে প্রান্তেই যাই, এই শহরের সঙ্গে অন্য কোনও শহরের তুলনা হয় না, বনিবনা তো হয়ই না। যে প্রান্তেই যাই না কেন, সে প্রান্তেই আমি নিজের সঙ্গে কথা বলি। সেই অতীত এই বর্তমান এ-সব কথা ভাবতে ভাবতে আমি আমার তরতাজা যৌবনকে ফিরে পাই। অরুন্ধতী রায়ের ভাষায়, at my 'dieable' age-এ, চলে যাওয়ার বয়সে, দিন গোনার বয়সেও আমি যুবক।

ওঁরা বললেন এ শহরটা নাকি ১৬৯০ সালে জন্মেছিল। ওঁরা আরও বললেন, কে এক জোব চার্নক এ শহরটাকে জন্ম দেয়। সেই সময় নাকি স্বর্গ আর মর্ত্য দুটোই ছিল আর ছিল ম্যালেরিয়া জ্বরের কারখানা। এটা সত্য যে ১৬৯০ সালের একটি সুন্দর বিকেলে সুতানুটির বাজারে হই হই করে মানুষজন চেঁচাতে শুরু করল। একটি বিদেশি জাহাজ গঙ্গার ঘাটে নোঙর ফেলেছে। মানুষ আতঙ্কিত হল। সেই জাহাজটিকে চালাচ্ছে ধবধবে ফরসা সাদা চামড়ার এক বিশাল লোক যাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ রীতিমতো সাহেবি। পায়ে চামড়ার জুতো। সে সাহেবটি সাহেবই অর্থাৎ ব্রিটিশ, কিন্তু জলদস্যু নয়। সে লোকটা সুতানুটিতে বাস করতে লাগল। ধীরে ধীরে সুতানুটির ব্যবসাদারদের সঙ্গে মিলেমিশে গিয়ে সেখানকারই একজন হয়ে গেল। প্রায় আড়াই বছর তিনি সেখানে বাস করেন। কিন্তু সেখানকার জল-বাতাসে তিনি আর বাঁচতে পারলেন না। স্ত্রী ছিলেন সুন্দরী এবং তিনি সে-দেশেরই যুবতী। কোনও বিদেশিনী নন। সেই সাহেব, সেই জোব চার্নক যে কবরে শায়িত আছেন, সেখানেই তাঁর স্ত্রী সেই ভারতীয় নারীও শায়িত। যতদূর জানা যায়, এই কবরের ওপর যে স্মৃতিসৌধ বিরাজ করছে সেটিই এই শহরে সবচাইতে প্রাচীন ।

এসব কথা জানা যায় যশস্বী লেখক খুশবন্ত সিংহের বই 'কালিঘাট টু ক্যালকাটা' থেকে। বলতে দ্বিধা নেই, সে বইটিতে ভূমিকা লিখতে হয় আমাকে। বইটি প্রকাশ হয় ১৯৯০ সালের জানুয়ারি মাসে, ঠিক যখন এই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

শহরের তিনশো বছর পূর্তির উৎসব চলছে। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও জোব চার্নকই সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতার স্রষ্টা, এ-ব্যাপারটা কিছুতেই মানতে পারি না সত্য বলে। বাস্তব বলে। কারণ, প্রমাণগুলো তেমন যথেষ্ট জোরালো মনে হয় না আমার কাছে।

যাই হোক, এক সময়ের ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী এই 'ক্যালকাটা'তে আজ আর ব্রিটিশ রাজত্বের তেমন কোনও নিদর্শন নেই, একমাত্র ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ছাড়া। সিপাহি বিদ্রোহের পর ইংরেজ মাতব্বরেরা তড়িঘড়ি করে রানি ভিক্টোরিয়াকেই এই সরকারের দেখভাল করার দায়িত্ব দেন। সেই সিপাহি বিদ্রোহের এখন নাম হল স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ। ময়দানের আশপাশে ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের নায়কদের যেসব মূর্তিগুলো ছিল, যেগুলো উপড়ে ফেলা হল, সেগুলো যেন আজ নিঃসঙ্গ, পরিত্যক্ত। যেসব রাজনৈতিক দলগুলো আমূল পরিবর্তনের পক্ষপাতী, তারা এ-সব মূর্তিগুলোকে রাস্তার প্রধান প্রধান স্থান ও কেন্দ্রস্থল থেকে সরিয়ে লোহার শেকলে বেঁধে খোলা লরিতে তুলে নিয়ে ফেলে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বাগানে। মনে হয় এক সময়ের দুর্দান্ত প্রতাপশালী রাজা মহারাজারা যেন সব নির্বাসনে, সমস্ত মূর্তিগুলো যেন গৃহবন্দি। আউট্রামের মূর্তিটা দেখলে সব চাইতে বেশি দুঃখ হয়। লোকটা যুদ্ধজয়, যথেচ্ছাচারিতার প্রতিভূ ছিলেন। ঘোড়ার পিঠে চড়ে যুদ্ধ করতেন, আদেশ করতেন, সেই আউট্রাম ভিক্টোরিয়ার বাগানে চরম অবহেলায় পরিত্যক্ত জীর্ণ। এমনকী ডেভিড অক্টারলোনি নামটা অনেক আগেই আকাশছোঁয়া মনুমেন্টের মাথা থেকে সরে গিয়েছে। এখন সে মনুমেন্টের নাম হয়েছে শহিদ মিনার। শহিদদের উপলক্ষ করে এ নামটা। এই শহিদ মিনারের মাথাটা একসময়ে লাল রঙের করা হয়েছিল, কিছু অত্যুৎসাহী মানুষের দৃষ্টিতে টকটকে লাল, একটা দারুণ ব্যাপার। রাস্তার পথচলা মানুষ তাকিয়ে দেখত মাথাটা লাল। অনেকটা শিবলিঙ্গের মাথায় লাগানো সিঁদুরের মতো। বিশিষ্ট মানুষেরা প্রতিবাদ করলেন, লেখালেখি হল বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। তাঁদের অভিমত মনুমেন্টের রঙটা ঠিক হয়নি। ঠিক মতো শিল্পবোধ, রুচির পরিচয় পাওয়া যায়নি।

প্রতিক্রিয়াস্বরূপ তৎকালীন মন্ত্রীর অসন্তোষ ও রাগের পরিপ্রেক্ষিতে এ রঙটা রাতারাতি মুছে ফেলা হয়। এগুলো আর কিছুই নয়, বিশিষ্ট মানুষ ও সাধারণ মানুষের ক্রোধ ও বিদ্বেষের প্রতিক্রিয়া, যাঁরা বিদেশি শাসন সম্পর্কে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ওয়াকিবহাল। জানি না। হয়তো বা এমনিই একটা পরিবর্তন সবাই চেয়েছিল এবং সেটাকে কেন্দ্র করে এক ধরনের মজা হয়েছিল।

এখানকার শিক্ষিত ও জ্ঞানী মানুষজন এখনও মনে রেখেছেন সেই সব সাম্রাজ্যবাদীদের, তাঁদের পৃষ্ঠপোষকদের, কতরকম বিচিত্র উক্তি আছে তাঁদের এই শহরটার সমস্যা নিয়ে।

সাম্রাজ্যবাদের ধারক ও বাহকের উক্তির কিছু কিছু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

> লর্ড ক্লাইভের উক্তি: 'দ্য মোস্ট উইকেড প্লেস ইন দ্য ইউনিভার্স।' এই লর্ড ক্লাইভই ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠাতা।
>
> স্যার জর্জ ট্রেভিলিয়নের উক্তি: 'এ জায়গাটা এত খারাপ এবং এখানকার পরিবেশ এত খারাপ যে মানুষ শত চেষ্টাতেও একে এর চেয়ে বেশি খারাপ করতে পারবে না।'
>
> রুডইয়ার্ড কিপলিং-এর উক্তি: 'শহরটা রোমহর্ষক রাতের শহর।'
>
> উইনস্টন চার্চিলের উক্তি: 'আমি আনন্দিত এ কথা ভেবে যে, এ শহরটায় আর আসতে হবে না আমাকে।'

১৯৭৫ সালে ঠিক এমার্জেন্সি বা জরুরি অবস্থা জারির কয়েক মাস আগে গুন্টার গ্রাস এই শহরে এসেছিলেন এবং কিছুদিন ছিলেন। এখানে কিছু কিছু মানুষের সঙ্গে তিনি দেখা করেন। এমনকী আমার মতো সাধারণের সঙ্গেও দেখা হয়েছিল। একসময়ে খুব হইচই হয়েছিল তাঁর 'টিন ড্রাম' বইটি নিয়ে। এ-বইটি অনেকের মতো আমারও খুব প্রিয়।

তবে এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হয়েছিল যখন গুন্টারের উপন্যাস 'দি ফ্লাউনডার'-এ তাঁর সৃষ্ট চরিত্র ভাসকো, আমার সম্পর্কে ভুল মন্তব্য করেছিলেন এবং তিনি শহরটাকে জুড়ে দিয়েছিলেন ভগবানের বিষ্ঠা তৈরির খোঁয়াড়ের সঙ্গে। স্বাভাবিক ভাবে আমি খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছিলাম। আমি একটি কথা পরিষ্কারভাবে বলতে চাই যে, এ-শহরটাকে আমি যেমন পবিত্র বলে মনে করি না, আবার এটাও মনে করি যে এ-শহরটা আমার এলডোরাডো। গুন্টার গ্রাসের উপন্যাসটি পড়ে সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল একটি বই, লিখেছিলেন একটু

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

অযত্ন সহকারেই, পৃথিবীর এক বিখ্যাত সিনেমার পরিচালক— পিয়ের পাওলো পাসোলিনি। তিনি একজন কবি, ঔপন্যাসিক, ছবিনির্মাতা।

এই ভদ্রলোক ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর সময়ে এই শহরে এসেছিলেন। বিখ্যাত লেখক ইতালির আলবার্তো মোরাভিয়ার সঙ্গী হয়ে। মোরাভিয়া এসেছিলেন এখানকারই সরকারের আমন্ত্রণে।

পাসোলিনি একটি ছোট্ট পুস্তিকা লিখেছিলেন যেটির নাম ছিল 'দি সেন্ট অফ ইন্ডিয়া'। অত্যন্ত তাড়াতাড়ি লিখেছিলেন, যেটি তাঁর উচিত হয়নি। অথচ চিত্রপরিচালক পাসোলিনির নাম ডাক তুলনারহিত।

যাই হোক, গুন্টার গ্রাসের বারোটি বছর কেটে গেল এই ধারণায় উপনীত হতে যে এই শহরটাকে ভালবাসা যায়। এবং সত্যিই তিনি এই শহরের দুরন্ত প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন। এটা ছিল গুন্টার গ্রাসের দ্বিতীয়বার এই শহরে পদার্পণ এবং এবারে সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ছিলেন। দ্বিতীয়বার যখন তিনি এখানে এলেন তখন তিনি দীর্ঘকাল এখানে ছিলেন। একটু সময় নিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত তাঁর বই 'শো ইয়োর টাং' এ-শহরের মানুষের মনকে জয় করতে পারল না। আমি বলতে পারি না কেন জয় করতে পারল না। হতে পারে আমি হয়তো ভুল বলছি। হয়তো বা ঠিকই বলছি।

গুন্টার গ্রাস প্রচুর তথ্য ও রসদ জোগাড় করতে এসে বহু মানুষের সঙ্গে দেখা করলেন। কথা বললেন। এমনকী বহু মানুষের সঙ্গে কথা বলবার জন্য একটি ছোট্ট দল তৈরি করলেন, অনর্গল মানুষের সঙ্গে কথা বলা এবং ভাব বিনিময় করবার জন্য। এই সময়ে আমার সঙ্গে গুন্টার গ্রাস দেখা করেন। একবার নয় বেশ কয়েকবার। একদিন গুন্টার এবং তাঁর স্ত্রী উটে আমার ছোট্ট ফ্ল্যাটে বেশ কয়েক ঘণ্টা সময় কাটালেন। তখন আমি গুন্টারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কলকাতা থেকে কুড়ি কিলোমিটার দূরে সেই বারুইপুর গেলেন কেন! সেখানে মশার উৎপাত, বিশেষত মশককুল সন্ধেবেলায় মানুষদের ছেঁকে ধরে। উপরন্তু রোজ ভিড়ে ঠাসা লোকাল ট্রেনে কলকাতায় যাতায়াতে অসুবিধে হচ্ছে না? এই শহরে রোজ ট্রেনে করে আসতে নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। হতে পারে গুন্টার কলকাতা থেকে দূরে থাকতে চেয়েছিলেন। আমার মনে হয়েছিল ওঁরা ভুল করেছেন। এবং সে কথা ওঁদের দু'জনকে আমি বলেওছি। আমি কোনও কিছু গোপন করিনি, কিন্তু আমি ভয় পেয়েছিলাম যে গুন্টারের এই রাতজাগা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দুঃস্বপ্ন এবং সে স্বপ্নের ব্যর্থ দিকগুলো এই বইটাতে প্রকাশ পেতে পারে। এখন আমি বুঝেছি আমি ঠিকই ভেবেছিলাম, ঠিকই ভয় পেয়েছিলাম।

গুন্টার কোনও ঝুঁকি নেননি এবারে। প্রচুর তথ্য ও রসদ জোগাড় করেছিলেন। 'শো ইয়োর টাং' এমন একটি বই যেটি আমার হৃদয়ের কাছাকাছি যেতে পারত। অসাধারণ গদ্য। কিন্তু এই শহরের বিস্তারিত বিবরণ এবং এখানকার মানুষদের কথা একটু একপেশে।

মনে পড়ছে এক ব্রিটিশ সাংবাদিকের এক বিস্ময়কর উক্তি। সাংবাদিকের নাম জেমস ক্যামেরন। বিদেশি শাসনের অবসানের পঁচিশ বছর পরেও তিনি লিখেছিলেন: 'মাই রোমান্টিক অ্যাসোসিয়েশন উইথ ক্যালকাটা।'

> Every time I return to Calcutta, I feel it must be surely impossible that it can continue much longer than this. Yet it always does. An interval of a year makes the visual impact more painful, the squalor more squalid, the poverty more militant, the despair more desperate. Every time I return to Calcutta, I find it an intimidating and even infernal city, unredeemed and probably doomed.

বাস্তবিকই, কথাগুলো অপ্রতিরোধ্য!

যদি একটু বেশি পেছনে তাকাই, তা হলে দেখব বিখ্যাত কবি মির্জা গালিব প্রায় এক বছরের বেশি এই শহরে বাস করেছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন, 'আমি যদি অবিবাহিত হতাম, যদি সংসার-ধর্ম না করতাম, আমি তা হলে এই শহরে আমৃত্যু থেকে যেতাম। এখানে থাকতাম সাধারণ মানুষের মতো। রাজা মহারাজা সম্রাটের জীবন আমার চাই না।'

আমিও যদি নিজের পুরনো জীবনটাকে দেখি, সেখানে এখন যদি বেশিরভাগটাই ব্যর্থতা ধরে নিই, যদি সফলতার ব্যাপারটা খুবই কম হয়ে থাকে, তা হলেও আমি নিজেকে বলতে পারি যে, সাধারণ মানুষের চাইতেও আমি আরও সাধারণ।

আমি যাই হই না কেন আমি একজন মানুষ। রাজা বা মহারাজা নই। শাসকও নই। সারা জীবনটা এ শহরে বাস করে আমি প্রাণ পেয়েছি। উৎসাহিত হয়েছি। এমনই একটা শহরে বাস করি যে আমাকে অভিভূত করেছে। আমাকে বিরক্ত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করেছে, রাগিয়ে দিয়েছে, হাসিও ফুটিয়েছে, আবার দুঃখও দিয়েছে। মাঝে মাঝে খোঁচা মেরেছে, আবার আমাকে আমার ভেতরে লড়াই করার শক্তিও জুগিয়েছে।

একটি ছোট্ট গল্প বলতে হয়, এ-শহরটাকে নিয়ে যে কাহিনি শুনেছিলাম আমার প্রিয় বন্ধু গুলজারের কাছে। সেই মুম্বইয়ের গুলজার। ছবির নির্মাতা, কবি, লেখক গুলজার। কলকাতার দক্ষিণে বেশ কিছুটা সময় গুলজার বসবাস করেছিলেন। একদিন বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন, তাঁর হাতে ছিল একটা থলে। এক প্রতিবেশী, অবশ্যই বাঙালি, গুলজারকে সকালবেলা দাঁত মাজতে মাজতে বললেন, 'মাছ কিনতে যাচ্ছেন মশাই? ওই দিক দিয়ে চলে যান।' এই দিকে তখন গোলাগুলি চলছিল। হাসতে হাসতে আমাকে গুলজার কাব্য করে বলেছিলেন, 'এই হল কলকাতা। একটা যুদ্ধক্ষেত্র অথচ সব শান্ত স্বাভাবিক।'

সত্যি বোধহয় এ শহরটা একটা যুদ্ধক্ষেত্র। অন্যভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে বলতে গেলে এ শহরটা শান্ত সমাহিত, রাতের আগেও, আবার পরেও, সেই ১৯৬৮ সালের শেষের দিকটা। একটা সময় ছিল! সেইসময় একদিন এই শহরের পুলিশি ব্যবস্থার কথা মনে পড়ে। বিশাল গোলাকার একটি ব্যারিকেড এসপ্ল্যানেড ইস্টের বিশাল রাস্তায়। মানুষে মানুষে ছয়লাপ। ব্যারিকেডের পেছনে বড় বড় পুলিশের ভ্যান, লম্বা লম্বা বড় বড় বাস। পশ্চিমদিকে সমৃদ্ধশালী রাজভবন। একটু নিরাপদ দূরত্বে উৎসাহী মানুষের ভিড়, যারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে। চারিদিকে একটা অদ্ভুত অস্বস্তিকর নীরবতা। ঠিক এরকম একটা দিনে বিকেলবেলায় আমি আর আমার ক্যামেরাম্যান সেখানে গিয়ে হাজির। আমাদের সঙ্গে মোটামুটি ক্যামেরা ও ছবি তোলার অন্যান্য সরঞ্জাম রয়েছে। এসব টুকিটাকি কাজ আমি অনেক আগেই সেরে রাখি যাতে আমার ছবিতে এসব দৃশ্য সুযোগ মতো ব্যবহার করা যায়। একটা সময়কে ধরবার চেষ্টা করব যে দুঃসময় এ-দেশের মানুষ, এ শহরের নাগরিকরা, দেখে এসেছে। সেই সময়টাকে সম্পূর্ণভাবে ধরবার জন্য এসব করতাম।

একটা ভ্রাম্যমাণ পুলিশের গাড়ি হঠাৎ সেই ব্যারিকেডের সামনে এসে থেমে গেল। এক পুলিশ অফিসার গাড়িটি থেকে লাফ দিয়ে নামলেন। সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারলাম। আমার এক বন্ধু। আমি ওঁর কাছে চলে গেলাম। সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। বন্ধুটি স্মিত হাসলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি এখানকার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'ল অ্যান্ড অর্ডার'-এর দায়িত্বে আছেন? তিনি গদগদ হাসি হাসলেন। আপনি কি এখানকার ব্যাপারটা ক্যামেরায় চান? মানে পুলিশ আর ছাত্রদের সংঘর্ষের ব্যাপারটা? হ্যাঁ, প্রায় দু'লাখের ওপর মানুষ সেখানে। বিভিন্ন জায়গার ছাত্র ইউনিয়ন সমাবেশ, যাঁরা পুলিশের কর্ডন ভাঙতে চায়।

আমি আমার পুলিশ বন্ধুটিকে বললাম, আমার সঙ্গে এক বিদেশি অতিথি আছেন, আপনি যদি আমার বন্ধুটিকে আমার সঙ্গে ছবি তুলতে দেন তা হলে খুব উপকার হয়। যদিও আমি ভেবেছিলাম তিনি হয়তো নিষেধ করবেন। কারণ তাঁর ক্ষমতা আইনের শৃঙ্খলে বাঁধা। বিদেশিরা এদেশের রাজনৈতিক ডামাডোলের তেমন ছবি তুলতে পারেন না। নিষেধাজ্ঞা আছে। কিন্তু উল্টোটা হল। পুলিশ বন্ধুটি জিজ্ঞেস করলেন, 'ওঁরা কোথাকার লোক।' খুবই ভদ্রভাবে তিনি জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, 'ফ্রান্স।' বড় বড় উজ্জ্বল চোখে তিনি আমাকে বললেন, 'ছবি তৈরি করেন? পরিচালক?'

'তিন জনের টিম। এঁদের মাথা লুই মাল।'

'লুই মাল এখানে!' সেই পুলিশ অফিসার বন্ধুটি আর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা চিৎকার করে উঠলেন। 'আমি লুই মালের সঙ্গে দেখা করব। আমি ওঁর ভক্ত। কোথায় তিনি!'

লুই মাল আগেও এ-শহরে এসেছেন, গতকাল রাতে উনি নেমেছেন কলকাতায়। সঙ্গে ক্যামেরাম্যান ও রেকর্ডিস্ট। তিনি বললেন, এ-শহরের মানুষের ভিড় নিয়ে ছবি করবেন।

আমি বললাম, জনতার সঙ্গে পুলিশের একটা ঝামেলা খণ্ডযুদ্ধ আছে। একটাই অসুবিধে, এসব ব্যাপারে আইনগত সমস্যা আছে। তবুও তিনি আশা নিয়ে প্রাইভেট গাড়ি ভাড়া করে ঘটনাস্থলে চলে এলেন।

সেই পুলিশ অফিসার বন্ধুটি বললেন, 'আমি অবশ্যই ওঁর সঙ্গে দেখা করব।'

আমি দৌড়ে গিয়ে গাড়ি থেকে লুই মালকে বের করলাম প্রায় টেনেই। গাড়িটা দূরে নিরাপদে দাঁড়ানো ছিল। মালকে বললাম, 'আপনার এক ভক্ত বাইরে অপেক্ষা করছে।'

'আমার ভক্ত এখানে! এরকম জায়গায় এই সময়ে!' একটু অবিশ্বাস্য ভাবে বললেন মাল।

'হ্যাঁ। আপনার ভক্ত। তিনি আবার পুলিশ অফিসার। নবীন ভট্টাচার্য।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

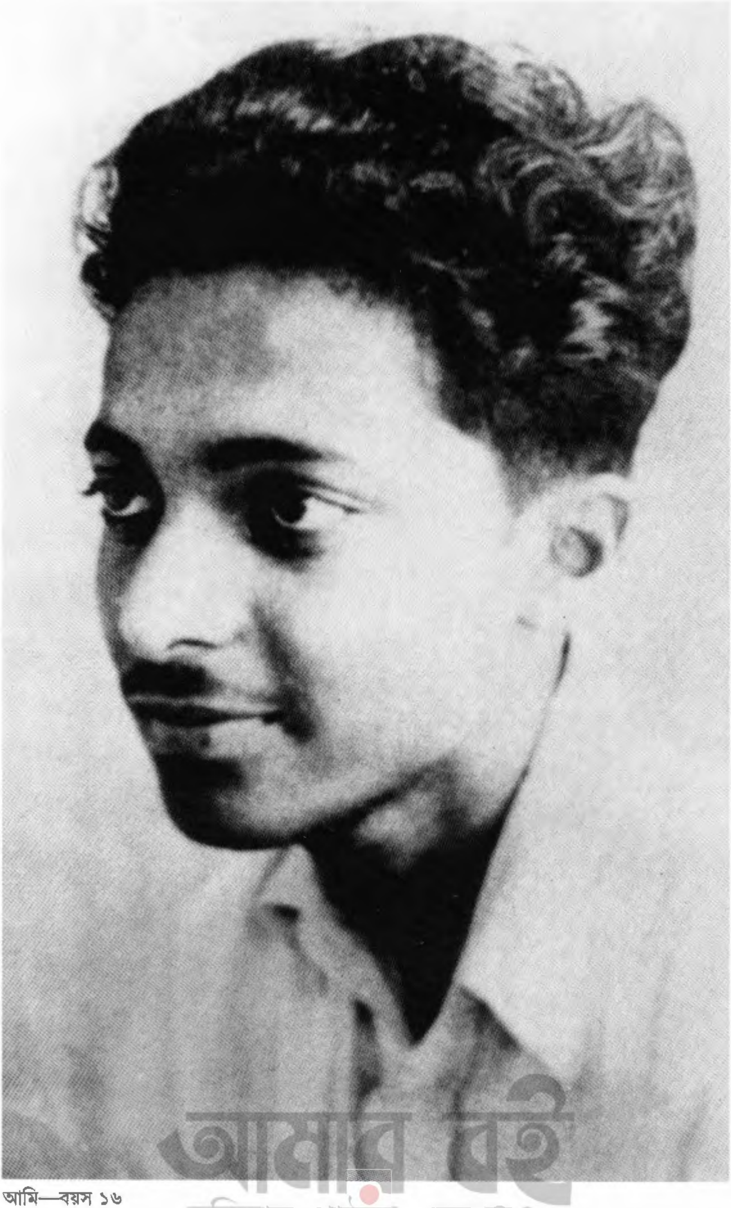

আমি—বয়স ১৬

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বাবা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বেকার বয়সে বন্ধুর বাড়তি টাইপরাইটার এনে লেখা শুরু করি, দু' আঙুলে।
আজও স্পিড চলনসই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'পু-লি-শ!!!'

'হ্যাঁ। এখানে যে খণ্ডযুদ্ধ হবে সেই খণ্ডযুদ্ধের বিরুদ্ধে যে পুলিশবাহিনী আছে তাঁরই অফিসার তিনি।'

মাল-কে নিয়ে রথীন ভট্টাচার্যর সামনে দাঁড় করালাম।

রথীন বললেন, তিনি মালের ছবি দেখেছেন। সে ছবিতে সাবটাইটেল ছিল না। তবু সেই অবস্থাতেই দেখেছেন। ছবিটা ভীষণ ভাল লেগেছে। শুধু তাই নয় ফরাসি ভাষার ওপর একটা কোর্স তিনি শেষ করেছেন। আরাগঁ-রও কবিতা অনুবাদ করেছেন।

লুই মালের চোখ দুটো বিস্ময়ে বড় হয়ে গেল। অবাক হয়ে আমাকে একটু আড়ালে নিয়ে বললেন: 'তোমার এই বন্ধুটি পুলিশ কর্তা! কিছুক্ষণ বাদেই যে ব্যক্তিটি মিছিলে ছাত্রদের লাঠি দিয়ে পিটিয়ে জেলে পুরবেন। অবাক কাণ্ড। ভাবা যায় না। তোমার এই শহরের বুকেই এসব সম্ভব।'

একটু সন্ধের দিকে মানে একটু রাতের দিকে মাল হোটেল থেকে আমায় ফোন করলেন। বললেন, আমি মাস চারেক আগে এ শহরে এসেছিলাম সরকারি সফরে। কিন্তু আজকের ঘটনা আমি ভুলব না। অবাক হওয়ার মতো ঘটনা। তোমার এই শহরের দুরন্তপনা আর মানুষগুলোর পাগলামি আমাকে মুগ্ধ করেছে। ভাবা যায় না।

এই শহরের এরকমই চেহারা ছিল ষাটের দশকের শেষের দিকে। আগেও, পরেও। এই শহরের ছোটখাটো চায়ের দোকানে গেলে সেখানে বহু মানুষের ভিড় থাকে। হঠাৎই পাওয়া যাবে একরাশ খোঁচাখোঁচা দাড়ি নিয়ে কোনও যুবক কবিকে, যে কবিতার লাইন নিয়ে ভাবছে। এই শহর কলকাতা ব্যস্ত, সৃষ্টিশীল, একবগ্গা। এখানে নৈরাজ্য দানা বেঁধেছে। কখনও কখনও এখানে জীবনযাত্রা পঙ্গু হয়ে যায় পুরোপুরি। কিছুটা অবিরাম ক্লান্তিহীন বৃষ্টিতে, কিছুটা রাজনৈতিক উত্তেজনায়, কিছুটা আবার নীরবতায়।

তবু আমি এখনও কলকাতাকে এলডোরাডো বলে মনে করি। যেন আমি এই অ্যানাটমির একটি অংশবিশেষ।

মনে পড়ে যায় বব ডিলান-এর গান। 'Love is just a four-lettered word.' আমার বন্ধু অঞ্জন দত্ত শুনিয়েছিল। অভিনেতা, গাইয়ে, ছবিও করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

আমি ভালবাসার কাঙাল। আমি ভালবাসার সঙ্গে ভীষণভাবে জড়িয়ে আছি। কলকাতার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঠিক যেন আমার প্রেমিকার সঙ্গে ভালবাসা ও ঘৃণার সম্পর্ক। পালাতে পারি না। ভালবাসা পাই আবার গালাগালও দিই। দুটি একইভাবে।

প্রথম সতেরো বছর আমি অবশ্য ফরিদপুর শহরে বাস করি। সেই শহরে মফস্‌সলের গন্ধও ছিল। সে জায়গাটা এখন কেমন! এক ফোঁটা চোখের জল পড়েনি আমার। এতকাল, এতবছর। এখন বাংলাদেশের ফরিদপুর।

আমার বন্ধু দীপঙ্কর মুখোপাধ্যায় একটি বই বের করল। সে বইটি আমার জীবনের কাজের উপর। বইটির নাম 'দ্য মাভেরিক মায়েস্ত্রো'। আমার কথা অদ্ভুতভাবে শুরু করল দীপঙ্কর:

> আশ্চর্য কিছু একটা আকাশ দিয়ে উড়ে যেতে দেখে বালকটি মুখ তুলে উপরে তাকাল। উজ্জ্বল নীল আকাশ। সেখানে একটি পাখি। বিচিত্র পাখি। পাখিটিকে সে বালক জীবনে এই প্রথম দেখছে। পাখিটির দুটো ডানা আছে। ঝকঝকে সে পাখিটির ব্যাপারে বালকটি দ্বিধাগ্রস্ত ছিল।
>
> সে বালকটি ছুটে গেল ভাই-বোনেদের ডাকতে। ছুটে গেল বাড়ির ভেতরে। যে বাড়িটিতে ছোট পরিবারটিতে ভাইয়েরা বোনেরা একসঙ্গে বাস করত। ভাই-বোনেরাও পাখিটিকে দেখে খুব উত্তেজিত হয়ে ওঠে। সবাই উঠোনে এসে আকাশের দিকে তাকায়। এমনকী ছেলেটির বাবা একটি মানচিত্র নিয়ে বাইরে আসেন যে সেই পাখিটি কোন দিকে যায়। সেই সময় সেই বিশের দশকে উড়োজাহাজ বা এরোপ্লেন ছিল একটি বিশাল ব্যাপার। আরও বেশি করে সেই বাংলাদেশের ছোট্ট ঘুমন্ত শহরে।
>
> সে বালকটি পরবর্তীকালে জানতে পারল এটি পাখি নয়। এটি যন্ত্রচালিত, মানুষের দ্বারা গঠিত বিমান। এ অভিজ্ঞতা সেই বালকটি জীবনে ভোলেনি। ভুলতে পারেনি।

সেই বালকটি আমি। এসব আমার মুখেই দীপঙ্কর শুনেছিল।

অবশ্যই এটা কাহিনি নয়। যেদিন এই এরোপ্লেনটা দেখি সেদিন রাতে আমি স্বপ্ন দেখি। গরুড়ের স্বপ্ন। আমার বিছানার কাছে এসে আমাকে পিঠে বসিয়ে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নিতে চাইছে পাখিটি। আমি স্বপ্নের মধ্যে সেই পাখির পিঠে বসে ঘুরলাম। যখন ঘুম ভাঙল তখন আমি বিছানায়। সেই গরুড়ের পিঠে বসার স্বপ্নটা আমি আরও একবার দেখেছি। দ্বিতীয়বার স্বপ্নের সময় আমার প্রকাশক আমাকে খোঁচা মারেন যাতে আমি আমার স্মৃতিকথনটা লিখে ফেলি। তখনই আমি প্রকাশককে বলি, সেই শৈশবে দেখা উড়োজাহাজ আর গরুড় পাখির পিঠে চড়ার ব্যাপারটা আমি লিখব।

ষাটের দশকে ওড়িয়া ছবি করবার সময় এ স্বপ্ন আমি আমার কল্পনা থেকে তুলে আনি ছবিতে। এই ভাবেই অভিজ্ঞতা শিল্পের মুহূর্ত তৈরি করে। সেই ষাটের দশক থেকে চিত্রনাট্যে আমি তিরিশের দশকে চলে গিয়েছি। যেসব দৃশ্য আমি তৈরি করি সেসব দৃশ্য বা বর্ণনা বইটিতে ছিল না। বইটি লিখেছিলেন ওড়িয়া সাহিত্যিক কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী।

আমি যদি সেই সুদূর অতীতে চলে যাই তা হলে সেই পুরনো ফরিদপুর শহর, যেখানে সতেরো বছর ছিলাম, সে শহরটা ছিল রাজনৈতিক শহর। ছ' ঘণ্টার পথ কলকাতা থেকে। এখন আবার ভিসাও লাগে।

সেই শহরে ছিল লাল বাল পাল-এর প্রভূত প্রভাব। জাতীয় কংগ্রেসের একটা বিশেষ জায়গা। লালা লাজপত রায়, বাল গঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল। এঁদের মধ্যে বিপিনচন্দ্র পালের অবাধ যাতায়াত ছিল ওই শহরে। আমার বাবা দীনেশচন্দ্র সেন ছিলেন পেশায় আইনজীবী। তিনি জেলা কোর্টের বার কাউন্সিলের নেতা ছিলেন। তিনি ওই আন্দোলনের খুব কাছের লোক ছিলেন। শুধু তাই নয় সে সময়ের বিপ্লবীরা যাঁদের অনেকের ফাঁসি হয়েছে এবং যাঁরা তখনকার স্বাধীনতা সংগ্রামী তাঁরা সব বাবার বন্ধু ছিলেন। একটা সময় বাবাকে শাস্তি পেতে হয়েছিল, কোর্টে গিয়ে সওয়াল না করতে বাধ্য করেছিলেন বাবাকে ইংরেজ সরকার।

তিরিশ দশকের শুরুতে, মহাত্মা গাঁধী গোলটেবিল বৈঠক সেরে ভারতে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে আবার তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়। মহাত্মা গাঁধীকে কারাগারে বন্দি করবার জন্য সারা দেশ জুড়ে বিশাল হরতাল ডাকা হয়। সে হরতাল সাফল্যমণ্ডিত হয়।

আমার জন্মস্থান সেই ফরিদপুর শহরে সমস্ত স্কুল, কলেজ, অফিস বন্ধ থাকে। আমার বাবা ও কিছু বন্ধুবান্ধব কোর্টে যান না, মামলা লড়েন না। ঠিক তার পরের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

দিন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আমার বাবাকে দোষী সাব্যস্ত করেন। যে জন্য বাবা তিন মাস কোর্টে যেতে পারেন না। নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। প্রতিবাদে আমার মা, ঘরের বউ, ও আরও কিছু মায়ের মতো মহিলা একটি সভা করেন। যে সভায় মায়েরা স্বদেশি গান করেন। বিপিনচন্দ্র পাল সেই সভায় পৌরোহিত্য করেন। আমার মায়ের নাম ছিল সরযূবালা সেন। কয়েক বছর বাদে আমি ও আমার কিছু বন্ধু পুলিশের সামনে 'বন্দেমাতরম' গাই। সেই সময় তখন আমরা প্রাইমারি স্কুলে পড়ি। আমাদের সবাইকে থানায় ধরে নিয়ে যাওয়া হয়।

কিছুক্ষণ বাদে একটা নোংরা কুৎসিত দেখতে পুলিশ আমাদের নিয়ে একটা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। ভীষণ ভয় পেয়ে আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম। ইতিমধ্যে একটি পুলিশ ব্যাটন ওপরে তুলে জোরে চেঁচাতে থাকল। আমরা ভয়ে শুকিয়ে গেলাম। আমি জোরে কাঁদতে লাগলাম। হঠাৎই আমার বাবা এসে হাজির হলেন। বাবাকে দেখে পুলিশটা সেলাম ঠুকল। অন্য বন্ধুদের কথা ভুলে গিয়ে আমি বাবার সঙ্গে ঘরের বাইরে চলে এলাম। বাবার জন্য আমার গর্ব হচ্ছিল। এরপর হঠাৎই বাবা আমার গালে একটা ঠাস করে চড় মারলেন। আমি কিন্তু তখন কাঁদলাম না। আমার মনে হল বাবা ঠিকই করেছেন।

যখন বয়স পনেরো, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছি। তখন আমার এই ফরিদপুর শহরে বিখ্যাত নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য বিশাল সভার আয়োজন করা হল। শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন হিন্দু মহাসভার প্রতিষ্ঠাতা।

জুবিলি পার্কের বিশাল জনসভায় আমার যাওয়ার ইচ্ছে হল জনসমাগম দেখবার জন্য। কিন্তু মা আপত্তি জানাল। সেখানে অনেক যুবকের ভিড়। আবার সুভাষচন্দ্র বসুর বিরুদ্ধে একটি মন্তব্য থেকে তখন জনতার মধ্যে একটি ভীষণ শোরগোল উঠল। আমার বড় ভাইও এ ব্যাপারে সমস্যা তৈরি করতে পারে। সে-ও সেই সব যুবকদের একজন। শুধু এসব দেখার জন্য আমি উৎসাহী ছিলাম সেখানে যেতে।

মা বলল একটি ছাতা নিয়ে যেতে। ভীষণ রোদ থাকবে। কে জানে সেখানে কী হবে বা কী হতে পারে।

জুবিলি পার্কে জনঅরণ্য। আমি আগে মেজদাকে খুঁজছি। আমাদের সাত ভাইবোনের মধ্যে মেজদা খুব জনপ্রিয় ছিল কারণ তখন ওই শহরে একটি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নাটকে মেজদা খুব ভাল অভিনয় করেছিল। সেই নাটকে আফজল খানের পার্টটা করেছিল। আফজল খান ছত্রপতি শিবাজির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। বন্ধু হিসেবে। উদ্দেশ্য ছিল শিবাজিকে হত্যা করবার। কিন্তু শিবাজি সেই আফজল খানকে মঞ্চের ওপর খুন করেন। অর্থাৎ হত্যা করেন।

যে ভদ্রলোক শিবাজির পার্টটা করেছিলেন তাঁর ওপর আমার রাগ হয়েছিল কারণ তিনি আমার মেজদাকে মঞ্চে হত্যা করেছিলেন।

জনতা শ্যামাপ্রসাদের বক্তৃতা শুনল। উনি ভাল বক্তা ছিলেন। কিন্তু যখনই উনি বললেন সুভাষচন্দ্র বসু মুসলিম লিগের সঙ্গে এবং তা হিন্দুদের পক্ষে ও দেশের পক্ষে ক্ষতিকর, তখনই জনতা হইহই করে উঠল। এদের মধ্যে বিরোধীপক্ষের নেতার মতো আমার মেজদা। একজন সাহসী মানুষ, ঠান্ডা মাথায় চিৎকার চেঁচামেচি শুনে পরিস্থিতি বুঝবার চেষ্টা করছিল। যাঁরা এসব অব্যবস্থা সামলাতে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তাঁদের মধ্যে এক নেতা ছিলেন আমাদের স্কুলের ইতিহাসের মাস্টারমশাই।

আমার মনে পড়ে ছত্রপতি শিবাজির ওপর তাঁর সুন্দর নোটগুলোর কথা। ভালবেসে উনি শিবাজিকে 'শিবজি' বলতেন। স্কুলের ক্লাসরুমের বাইরে তিনি অন্য মানুষ। এ যুদ্ধক্ষেত্রে, এ রণক্ষেত্রে তিনি অন্য ব্যক্তিত্ব। হঠাৎই তিনি আমার মেজদা অর্থাৎ আফজল খানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ইতিহাসের মাস্টারমশাইয়ের বড় টাকটা তখন আমার মুখের সামনে। রাগের মাথায় আমি যেটা করলাম সেটা হল ছাতার বাঁট দিয়ে ইতিহাসের মাস্টারমশাইয়ের মাথায় মারলাম। সজোরে। এ ঘটনার পর আমি ভয় পেয়ে গেলাম। কিন্তু ইতিহাসের মাস্টারমশাই জানলেন না যে অপকর্মটি কে করেছিল। সেটা ছিল ১৯৩৮ সাল।

আমি স্বীকার করি আমার এই কাজ অন্যায়, কিন্তু আমার মেজদা ওরফে আফজল খানের প্রতি ভালবাসার দরুন এ ঘটনা। এ ছাড়া আমার জীবনে এরকম ঘটনা আর ঘটেনি।

দু' বছর বাদে ১৯৪০ সালে আমার বাবা ও মা আমাকে এই শহরে পাঠিয়ে দিল। মানে এই কলকাতায়। বি এসসি পড়বার জন্য। বিখ্যাত স্কটিশ চার্চ কলেজ। কলকাতা আসার আগে আমার বাবা ও মাকে মজা করে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমার মধ্যে কী কোনও প্রতিভা আছে? আন্দাজ পেয়েছ কিছু? বাবা-মা কথাটা শুনে অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছিল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

অমলদা আমার চেয়ে বছর খানেকের সিনিয়র ছিল। হয়তো বা দু'বছরের। আমি জানতাম অমলদা কত পড়াশুনো করেছে। আমি অমলদার একটা কথা মনে রেখে বাবাকে সেই কথাটিই বললাম। সবাই দশ বছর বয়স পর্যন্ত প্রতিভাবান। বারট্রান্ড রাসেলের উক্তি। বাবা মাকে এই বলে আশ্বস্ত করলাম। তাঁদের আর কিছু করার নেই। তাই দু'জন শুধু বেনিফিট অব ডাউট-এই আমাকে কলকাতা শহরটায় পাঠিয়ে দিল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় অধ্যায়

বেনিফিট অব ডাউট-এ ছেড়ে দেওয়া হল আমাকে। আমি নতুন পৃথিবীতে এলাম। সে পথ দীর্ঘ, কঠিন।

এই শহর কলকাতায় আসার পর আমার কেন যেন ভয় ভয় করতে লাগল। এক বিশাল জনসমুদ্র! আমার মনে হতে লাগল আমি এই জনসমুদ্রে হারিয়ে গিয়েছি। এ জনসমুদ্রে আমি একাকী নিঃসঙ্গ। এই জনসমুদ্রের সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। কেউ কারও সম্পর্কে কোনও খবরই রাখে না। উদাসীন নির্লিপ্ত জনজোয়ার। আমার জন্মস্থানে আমার বাবা ও মায়ের ভালবাসা স্নেহ আদর আমাকে মুগ্ধ করে রেখেছিল। যে কোনও কারণেই হোক আমার স্কুলের শিক্ষকেরা, এমনকী ইতিহাসের মাস্টারমশাই, বিশেষত পদার্থবিজ্ঞানের মাস্টারমশাই সবাই আমাকে কাছে টেনে নিতেন। স্নেহ করতেন। ভালবাসতেন। কিন্তু এখন কেমন লাগছে যেন। একটা নৈরাশ্য, একটা শূন্যতা চেপে ধরেছে আমাকে। আমি একজন বহিরাগত। ভয়ে ভয়ে জীবনযাপন করছি।

যদিও ধীরে ধীরে পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করল তবুও আমি বহিরাগত হয়েই রইলাম। সব কিছুই চলছিল। মোটামুটি, টেনেটেনে।

গমগম করছে ভিড়ঠাসা বাজার, আশপাশে ছোট ছোট গলি, পুরনো সেই মান্ধাতার আমলের বাড়ি, আবার পাশে কিছু নতুন বাড়ি। ঘরের সঙ্গে সুন্দর লাগোয়া প্রাসাদোপম অট্টালিকা। সেই উত্তর কলকাতার একটি তিনতলা বাড়িতে ঠাঁই পেলাম, কৈলাস বসু স্ট্রিটে। যেখানে পুরনো সেই বাড়ি কালের গতিতে জীর্ণ হয়ে গিয়েছে।

একদিন বিকেলবেলা আমার কলকাতার অভিভাবক পূর্ণ দাস এই তিনতলা বাড়িটিতে আমাকে রেখে দিয়ে চলে গেলেন।

১৯২০ আর ১৯৩০ সালে স্বাধীনতার আন্দোলন চলছে। রাজনৈতিক ঝড়

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

চলছে সেই সময় পূর্ণ দাস আমার ফরিদপুর জেলাতে একটি বৃহৎ দল গড়লেন। তরতাজা ছেলেপুলেদের নিয়ে। যাঁরা দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে চায় এমন সব ছেলেপুলেদের নিয়ে। দলটির নাম ছিল শান্তিসেনা। এই পূর্ণ দাস ও ওই দলের ছেলেপুলেরা আমার বাবা মায়ের এবং আমাদের বাড়ির লোকেদের খুব কাছের মানুষ ছিল। এখন তিনি পূর্ণ দাস নামেই কলকাতা শহরে অবসর জীবন কাটাচ্ছেন। এখন তিনি এই শহরেরই স্থায়ী বাসিন্দা। আমার বাবা তাঁকেই দায়িত্ব দিয়েছিল আমার দেখভাল করবার জন্য।

পূর্ণ দাস আমাকে এমন জায়গায় এনে তুললেন যে সেটি কোনও ছাত্রাবাস নয়। সেটি একটি বোর্ডিং হাউস। বেশিরভাগ লোকই এখানে চাকুরিজীবী। প্রায় জনা তিরিশেক বোর্ডার-এর বাস এখানে। কেউ কেরানি, কেউ শিক্ষক, কেউ অন্য কোনও কাজ করেন। সবাই মোটামুটি অল্প মাইনের চাকুরে।

আমি যে ঘরটায় থাকতাম সে ঘরে আর একটি ছাত্র ছিল। সে ছেলেটিও ফরিদপুরের ছেলে। ছেলেটি অর্থনীতির ছাত্র ছিল আর আমি ছিলাম পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র। আমরা দু'জনে এই বোর্ডিংটায় বয়সে সবচাইতে ছোট ছিলাম। যিনি সবচাইতে বয়স্ক ছিলেন তাঁর বয়স ছিল প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। তিনি অবশ্য কাজকর্ম চাকরি-বাকরি করতেন না। একটি ঘরে একা থাকতেন। একটু গোপনে একটু আড়ালে। ওই বাড়িটায় ওই একটি ছাদের তলায় আমরা দু'জনে যেন একটা দ্বীপের মধ্যে বাস করতাম। সবার থেকে বিচ্ছিন্ন আমরা। কিন্তু পূর্ণ দাস এ জায়গাটা ভাল চিনতেন ও জানতেন এবং আমাকে বলেছিলেন, কোনও অসুবিধে হলে আমি আছি। বোধহয় পূর্ণ দাসের রাজনৈতিক চেনাজানা অর্থাৎ বড় বড় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এ-শহরে ওঠাবসা ছিল। এ সবের জন্য উনি একটু সব কিছুর আড়ালেই থাকতেন। ওই বোর্ডিং হাউসে আমাদের জীবনযাত্রা ছিল অন্য রকম। পূর্ণ দাসকে রাজনৈতিক ব্যাপারে জড়িত আছেন বলে সন্দেহ করা হত। অনেকেই সেটা ভাবত।

একদিন সবাই একসঙ্গে রাত্রিবেলা খেতে বসব। এমন সময়ে বোর্ডিং হাউসের ম্যানেজার ঘরে এসে স্নেহের সুরে বললেন: ধরে নাও এটা তোমার বাড়ি। সব সুযোগ সুবিধা পাবে তুমি। এখানকার বোর্ডাররা সত্যিকারের ভদ্রলোক এবং কেউ কারও সঙ্গে ঝগড়া বিবাদে যায় না। আমার মালিক কোনও বেকার যুবককে এখানে থাকতে দেন না। যে ভদ্রলোক তোমাকে এখানে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

এনেছেন, উনি আমার মালিকের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। চলে এসো ঠিক সময়ে রোজ রাত্রিবেলা। খেয়ে নেবে ঠিক সময়ে। কিন্তু এ-বোর্ডিংয়ের সবচাইতে বয়স্ক মানুষ দাদু কিন্তু তোমাদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে খাবেন না। দুপুরেও তাই। এটা ওঁর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা। নিশ্চয়ই তুমি জান কেন সেটা! কেন তাঁর জন্য আলাদা ব্যবস্থা।

সেই খাবার ঘরে কোনও খাবার টেবিল বা কোনও চেয়ার বা কোনও ডেস্ক ছিল না, যদিও খাবার ঘরটি বৃহৎ। সমস্ত বোর্ডাররা লাইন দিয়ে মাটিতে বসে দেওয়ালের দিকে পিঠ রেখে খেতে বসত। খাওয়ার সময় একটা সুন্দর চতুর্ভুজ তৈরি হত। চারদিকে বোর্ডাররা বসে খেত। একজন লোক খেতে দিত আর মাঝখানে একটি ব্রাহ্মণ পাচক দাঁড়িয়ে পরিবেশন দেখত। আর একজন গেলাসে জল পরিবেশন করত।

আমি আর আমার ঘরের সেই বন্ধুটি সেই বড় খাওয়ার ঘরে গিয়ে বসলাম। যাঁরা খেতে বসে গেছে তাঁরা আমাদের দু'জনকে দেখতে লাগল। আমি চেষ্টা করলাম এমনভাবে তাকাতে যাতে কোনও অসুবিধে না হয়। এক পাতে দেওয়া হল ভাত ডাল লেবু জল। এমনকী নুনও। ভাতের পর মাছের ঝোল এবং এক পিস ভাজা মাছ দেওয়া হল পাতে। খাওয়ার পাতে বসে সবাই লেবু চটকাচ্ছিল এবং আমিও একটা লেবু নিয়ে চটকাতে লাগলাম। আমি লেবুটা চটকাতে গিয়ে এত জোরে চাপ দিলাম যে আমার লেবুটা হাত ফসকে ছিটকে চলে গেল এক বোর্ডারের পাতে, যিনি আমার তিনটে আসন পরে বসে খাচ্ছিলেন। কেউ কিছু বলল না। একটি কথাও না। আবার নতুন প্লেটে নতুন ভাবে ভাত, মাছের ঝোল, মাছভাজা, নুন দেওয়া হল। অবশ্যই আর লেবু নয়। পরিবেশনের ছেলেটি অর্থাৎ যে ছেলেটি জল দিচ্ছিল, সে ছেলেটি আগের প্লেটটা সরিয়ে নিল। সবাই নীরবে খেতে লাগল এবং কেউ সেই হাত-ফসকে পাতে পড়ে যাওয়া লেবুর কথা কিছু বলল না। আমার খারাপ লাগছিল। আমি দুঃখ প্রকাশ করতে পারলাম না। আমার ভদ্রতা জ্ঞান দেখানো গেল না। জানি না কেন! আমার মনে হল যে আমি সেই ধরনের ছেলে যে এ-দেশেরই সন্তান, অথচ বিদেশে এসে পড়েছি। আমি সাধারণ ছেলে, সাধারণ বুদ্ধি ও মেধা আমার। অতীব সাধারণ আমি, যার জন্য এ-ঘটনাটা আমাকে খুব সহজেই নাড়া দেয়। নাড়া দেয় আমার মনকে।

একদিন বিকেলবেলা কলেজ থেকে ফিরেই আমি অবাক হয়ে গেলাম,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দেখলাম পূর্ণ দাস বোর্ডিংয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। ওঁকে দেখে আমি খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠলাম, আমার চোখেমুখে খুশির ভাব ফুটে উঠল। উনি আমায় জিজ্ঞেস করলেন, সব ঠিক আছে তো? কোনও অসুবিধে নেই তো! কথাটা বলেই ওঁর ব্যাগ থেকে একটা পুস্তিকা বের করে আমাকে দিলেন এবং বললেন, এটা হারাবি না।

সতর্ক করলেন এ পুস্তিকাটির ব্যাপারে। এটা একটা প্রয়োজনীয় কাগজ যেটি আমার কাছে একটি মাত্র কপিই ছিল। এটি আমি সযত্নে বহুকাল রেখেছি আমার কাছে। এটা ১৯২৩ সালে অল বেঙ্গল রায়ত কনফারেন্স-এর রিপোর্টে কৃষকরা যে সভা ডেকেছিল সেই সভাতে রিসেপশন কমিটির চেয়ারম্যানের বক্তৃতা। কথাটা আমি শুনেছিলাম ফরিদপুরে থাকাকালীন এবং এ সভার এই বিশেষ পুস্তিকাটি আমার বাবার কাছেও ছিল না। আমার বাবাই সেই সভার সভাপতি ছিলেন। আরও মজার ব্যাপার হল এই সভাটিতে যিনি প্রধান সভাপতি, তিনি হলেন— দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, সি আর দাশ। ঘটনাচক্রে সি আর দাশের এটাই শেষ বক্তৃতা। কিছুদিন বাদে দার্জিলিং-এ বিশ্রাম নিতে গিয়ে উনি মারা যান।

রাত্রিবেলা আমার ঘরের ছেলেটির অবর্তমানে আমি বাবার বক্তৃতাটা পড়লাম। সুন্দর বক্তৃতা। একটু ভাবাবেগে ভরা অথচ তথ্যমূলক। বক্তৃতার শেষ অংশে ১৯১৭ সালের বলশেভিক বিপ্লবের কথা বলা হয়েছে যে বিপ্লব রাশিয়াতে নতুন সভ্যতা এনেছিল। বক্তৃতাটা পড়বার পর আমার চোখে জল এসে গেল। কেঁদে ফেললাম। আমার গর্ব যে আমি সেই পিতারই সন্তান। পুস্তিকাটি হারিয়ে গেল। আমি জানি না কী করে হারিয়ে গেল। খুব খারাপ।

যাই হোক, খুব তাড়াতাড়ি বুঝতে পারলাম যে আমার ভেতরে ভেতরে কিছু একটা ধীরে ধীরে তৈরি হচ্ছে। আমি বদলাতে আরম্ভ করেছি। যখন ফরিদপুরে ছিলাম তখনই আমি সেখানে বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের দিকে ঝুঁকেছি। সেই তখনই আমি একবার ফ্রাঙ্কো বিরোধী মিছিলে শ্লোগান দিয়েছি। বুঝলাম আমি পালটে যাচ্ছি। এই বড় শহরে আমি আমার খোলস থেকে বেরিয়ে এলাম, বাইরের জগতের বাতাস প্রাণ ভরে নিলাম। এটা সেই জগৎ যে জগৎ আমাকে ব্যস্ত রেখেছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে। কিন্তু তবুও বড় পরিবর্তন তখনও আসেনি, সে পরিবর্তন এসেছিল ধীরে ধীরে শক্তপোক্ত ভাবে। সেটা আমার ভেতরকার পরিবর্তন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমার আশপাশে বন্ধুবান্ধব ও পরিচিত সবার সঙ্গে তখন কথাবার্তা বলছি, আলোচনা করছি। সেসব আলোচনায় বিতর্কের শেষ নেই। আমি যে বৃত্ত বা আবর্তের মধ্যে ঘোরাফেরা করছি, সেখানে চলছে পৃথিবীর তাবড় তাবড় ঘটনা নিয়ে আলোচনা। শুধু তাই নয়, দেশের মধ্যে চলছে দুর্ভিক্ষ, চলছে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা। অন্য দিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রেশ। আমি যেন ছুটে চলেছি একটা মেটামরফসিস-এর ভেতর দিয়ে। ১৯৪১ সালে যখন পৃথিবীতে এই ভয়ংকর ঘটনা ঘটছে ঠিক তখনই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চলে গেলেন। সেই সময়ে আমি মহা কবির 'সভ্যতার সংকট' পড়ে ফেললাম। অসামান্য রচনা।

১৯৪৩ সালে সেই কুখ্যাত অথবা বিখ্যাত বাংলার দুর্ভিক্ষ। লক্ষ লক্ষ মানুষ না খেতে পেয়ে মরে গেল। এর পরেই যুদ্ধ শেষ আর ফ্যাসিজ়ম-এর মৃত্যু। সেটা ১৯৪৫ সাল। ঠিক তখনই হিরোশিমা ও নাগাসাকি জ্বলে উঠল এবং আবার এই কলকাতা শহরে শুরু হয়ে গেল নোংরামি, হিংসার ভয়ংকর খেলা, খুনোখুনি, রক্তস্নান। ১৯৪৬ সাল। যেন একটা নিষ্ঠুর বর্বর সময় সমগ্র পৃথিবী জুড়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, একটা অত্যন্ত অশুভ সময়, আবার আমার বোঝার পক্ষে, উপলব্ধি করার পক্ষে সবচেয়ে ভাল সময়।

বোর্ডিং হাউসের কথায় আবার ফিরে আসি। ১৯৪১ সাল। তখন সবে ভোর হব হব ভাব, এমন সময়ে আমার ঘরে মৃদু করাঘাত। আস্তে আস্তে করাঘাত। দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। আমার বিছানার মাথার কাছে টেবিলের ওপর টাইম-পিসটায় ভোর চারটে তখন। ঘুম ভেঙে গেল আমার। আমার ঘরের ছেলেটি ঘুম থেকে জেগে উঠল। দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ, এবারে বেশ একটু জোরে। ম্যানেজারের চিৎকার 'দরজা খোল।' দরজা খুলে দেখি ঘরের দরজার বাইরে দু'টি পুলিশ কনস্টেবল, দু'জন পুলিশ অফিসার, হোটেলের ম্যানেজার এবং এ-পাড়ারই দু' চারজন বিশিষ্ট বাসিন্দা যাঁদের সঙ্গে করে আনা হয়েছে। আমার ফরিদপুর শহরের পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারলাম, কেন এঁরা সবাই এসেছে। যে কোনও বাড়িতে তল্লাশি চালাতে গেলে পুলিশকে পাড়া প্রতিবেশীকে সঙ্গে নিয়ে আসতে হয়। যেসব প্রতিবেশীকে পুলিশ নিয়ে আসে এই অসময়ে সেসব প্রতিবেশীর কিছু করার থাকে না। তারা নেহাতই সাক্ষী। বুঝতে পারলাম ওইসব অফিসাররা আমার ঘরের ছেলেটির খোঁজে আসেনি। এসেছে আমার খোঁজে। কিন্তু কেন? আমি আকাশ থেকে পড়লাম।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমার ঘরটার তল্লাশি নিল। এটা কিছুই নয়, এটা করতে হয়। এটা এক ধরনের কর্তব্য। আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম, কেন এসব তল্লাশি, কী আমার অপরাধ সেসব কথার উত্তর তারা দিল না। মিনিট পনেরোর মধ্যে তল্লাশি শেষ হয়ে যাওয়ার পর ওরা আমাকে বলল ওদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে নিতে। আমি কি জামা, কাপড়, ধুতি গামছা সঙ্গে নেব? টুথপেস্ট ব্রাশ? ওগুলো কি নেব, বললাম আমি।

না। ওসব কিছু নিতে হবে না। আমি যেন স্বস্তি পেলাম।

পরে দেখলাম, মোট সাতজন মানে আরও ছ'জন ছাত্রকে কলকাতার বিভিন্ন জায়গা থেকে তুলে এনে লালবাজারের পুলিশ হেড কোয়ার্টার্সের গারদে সাত দিন পুরে রাখা হল। বাকি ছ'জন ছাত্র আমার চাইতে বয়সে বড়। ওই সাত দিন আমাদের স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসে নানারকম জিজ্ঞাসাবাদ করা হল, লোভ দেখানো হল, ভয় দেখানো হল। প্রত্যেকে আমরা আলাদা আলাদা ঘরে আলাদা ভাবে প্রশ্নবাণে জর্জরিত হলাম। ওই সাত দিন আমরা কেউই স্নান করিনি, জামাকাপড় বদলাইনি, চুল আঁচড়াইনি। আট দিনের মাথায় আমাদের কোর্টে চালান করা হল এবং, আশ্চর্য, সেখানে আমাদের হয়ে সওয়াল করবার জন্য উকিলরা উপস্থিত ছিলেন। সেসব উকিলরা আমাদের জামিনে মুক্তি দেওয়ার জন্য যুক্তি খাড়া করলেন, লড়লেন এবং আমাদের জামিন হল। এর পর ভিন্ন ভিন্ন দিনে কোর্টে হাজিরা দিতে হত আমাদের এবং এটাই সাত দিনের সেই বিচার।

আমি যখন জামিনে মুক্তি পেয়ে কোর্টের বাইরে এলাম দেখলাম আমার বাবা ও সেই বোর্ডিংয়ের বন্ধুটি আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমার বাবা ফরিদপুর থেকে ছুটে এসেছেন আমাকে থানা পুলিশ কোর্টের ঝামেলা থেকে মুক্তি দিতে। তিনিই উকিল লাগিয়েছেন। আমি ওঁদের দু'জনের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম এবং জোর করে হাসলাম। বাবা কিন্তু আমায় চড় মারলেন না, থাপ্পড় মারলেন না, বকলেনও না, কিছুই বললেন না। শুধু পিঠটা একবার চাপড়ে দিলেন। আমি বুঝলাম আমি বড় হয়েছি। আর সেই ছোট আমি নেই। তেমন কোনও জরুরি বা ভয়ংকর অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে ছিল না। কিন্তু ওদের কাছে নির্দিষ্ট খবর ছিল যে আমি গোপন মিটিং সংগঠিত করি, ছাত্র-নেতা বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে, যিনি গোপনে লুকিয়ে আছেন এবং সে মিটিং হয় যেখানে-যেখানে, কিছু

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সক্রিয় কর্মীও থাকে। দু'-দু'বার কোর্টে হাজিরা দিতে হল এবং পরে বেকসুর খালাস হলাম কোনও শর্ত ছাড়াই। ব্যাপারটা এখানেই শেষ হয়ে গেল। কিন্তু তখনও ঠিকমতো জানতাম না যে ব্যাপারটা একদম মিটে গেল কি না! আমার মাঝে মাঝে মনে হত যে আমাকে হয়তো আবার কোনও সমস্যায় পড়তে হবে। না, হয়নি তেমন কিছু।

এই সমস্ত ঘটনা ঘটবার মাস তিনেক আগে ১৯৪১-এর ১৭ জানুয়ারি। তখনও ভোর হয়নি। বিশিষ্ট একজন, প্যারোলে গৃহবন্দি, বাইরে পুলিশ। বিশিষ্ট মানুষটি পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গেলেন। গাড়িতে পা রাখলেন, আর বাড়ি ফিরলেন না। সুভাষচন্দ্র বসু। অন্তর্ধানের খবর ও গুজব ছড়িয়ে পড়ল মানুষের মুখে মুখে। আমারও মনে পড়ল পুরনো দিনের একটা কথা। পরিষ্কার স্বচ্ছ অতীত সেই ছবির ফ্ল্যাশব্যাকের মতো। সমগ্র বাংলার একটি সম্মেলন হবে ফরিদপুরে। খুব শীঘ্রই। আমার বাবা ও ফরিদপুর শহরের কিছু কংগ্রেস কর্মী ঠিকঠাক করলেন, এ-শহরের ছোট ছোট সমস্যা কী করে মেটাবেন। সুভাষ বসু আসবেন, থাকবেন। কিন্তু আমার বাবা খুব স্বাধীনচেতা মানুষ ছিলেন, তাই সুভাষবাবু বাবার ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। সুভাষবাবু বোধহয় বাবার কাছে বেশি সহজ ও স্বাভাবিক হতে পারতেন। তিনি ফরিদপুর এসে আমাদের বাড়িতেই ছিলেন। আমার বাবা ও সুভাষবাবুর মধ্যে কোনও আড়াল ভেদাভেদ ছিল না। যেদিন উনি আমাদের বাড়িতে উপস্থিত হলেন সেদিন আমার ভীষণ দাঁতের ব্যথা হয়েছিল। ব্যথায় খুব কষ্ট হচ্ছিল। অসহ্য ব্যথা। আমার মা এক প্রতিবেশীর কথায় একটা দাঁতের পেইন্ট নিয়ে এলেন। এই পেইন্টটা লাগাতেই আমার মুখের ভেতরটা জ্বলতে লাগল। আমি কেঁদে ফেললাম। আমার বাবা ছুটে এলেন। সুভাষচন্দ্র ভাবলেন কোনও একটা ভয়ংকর কাণ্ড হয়তো ঘটেছে। উনি ঘরের দরজার সামনে এলেন এবং দেখলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। উনি একটা ব্যথার ওষুধের নাম একটা কাগজে খসখস করে লিখে দিলেন। এটা একটা ট্যাবলেট যেটা দোকান থেকে কিনে আনা হল। সেটা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যথা চলে গেল।

সুভাষবাবু বললেন, এটায় সাময়িকভাবে ব্যথা কমবে, কিন্তু দাঁতটাকে তুলতে হবে। না হলে আবার ব্যথা হবে। এ ছাড়াও তিনি বললেন, ক'দিন বাদে যখন আবার আসবেন, সেদিন ব্যথার ওষুধ নিয়ে আসবেন। সে ওষুধটার কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সুভাষবাবু রাতের ট্রেনে চলে গেলেন আবার দু'দিন বাদে ফরিদপুরে এলেন। অতি ব্যস্ততার মধ্যে ফরিদপুরে এসে ছ' ঘণ্টার মতো ট্রেনে রাত জেগেও আমার ওষুধটা আনতে ভোলেননি। আমার মা পরে সুভাষবাবুকে বললেন এ ওষুধটা তো ম্যাজিক। মিরাকল। আমার খুব গর্ব হয়েছিল এই ভেবে যে সুভাষচন্দ্র বসু আমার প্রথম দাঁতের ডাক্তার। অনেক পরে বুঝতে পারি যে এটা অতি সাধারণ ছোট্ট ব্যাপার। রোজকার জীবনে এটা কোনও ব্যাপারই নয়।

৭ আগস্ট, ১৯৪১ সাল। সবে ক্লাস শুরু হয়েছে। ক্লাসের অধ্যাপক থারমোডাইনামিক্স বইটা বের করলেন। হঠাৎ-ই পাশের বিল্ডিং থেকে প্রিন্সিপাল ছুটে এলেন হন্তদন্ত হয়ে। তিনি রেভারেন্ড অ্যালেন ক্যামেরন। এলেন খালি পায়ে।

তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল বিধ্বস্ত। একটু চুপ করে থেকে বললেন, বিশ্বকবি আর বেঁচে নেই। প্রিন্সিপালের গলার স্বর আটকে গিয়েছে। কোনও কথা না বলে ক্লাস-টিচারের অনুমতি না নিয়ে আমরা সবাই একসঙ্গে ক্লাশের বাইরে চলে এলাম। মিনিট পনেরোর মধ্যে কলেজের সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা এবং শিক্ষক ও অধ্যাপকেরা সবাই, তা তিনি ভারতীয় হোন বা স্কটল্যান্ডের মানুষই হোন, সবাই মিলে খালি পায়ে জোড়াসাঁকোর দিকে যাত্রা শুরু করলেন। উত্তর কলকাতার সেই বাড়িতে, যে বাড়িতে তিনি জন্মেছিলেন ১৮৬১ সালে। চলে গেলেন ৭ আগস্ট ১৯৪১ সালের ভোরবেলায়। আমরা জোড়াসাঁকোতে তাঁর বাড়িতে পৌঁছোলাম, সেই বিশাল বাড়ির সামনের দেড়শো বছরের প্রাচীন প্রশস্ত উঠোন, লোকে লোকারণ্য। সবাই তখন বৃথা চেষ্টা করছে, কেমন করে সেই বাড়ির দোতলার ঘরে প্রবেশ করবে, যে-ঘরে কবির মৃতদেহ শায়িত। ওই অসংখ্য মানুষের ভিড়ের মধ্যে ঠাওর করতে পারলাম না যে আমি রবীন্দ্রনাথের মৃতদেহ থেকে কত দূরে বা কাছে। অবশেষে যখন আকাশের দিকে তাকালাম তখন দেখলাম অল্প অল্প হাওয়া বইছে, গাছগুলো নড়ছে বাতাসে। আবিষ্কার করলাম আমি দাঁড়িয়ে ছাদে। কীভাবে কী করে ওখানে উঠে এলাম বুঝতেই পারলাম না। সিঁড়ির একটা ধাপও কীভাবে উঠেছি সেটাও বুঝতে পারলাম না। নীচে জনতার স্রোত। অগুনতি মানুষ। ওই ছাদে অত মানুষের মাঝখানে, যখন তখন যে-কেউ অসুস্থ হতে পারে ভিড়ের চাপে এই ভেবে একটু দূরে জায়গা করে নিলাম, যেখানে হাওয়া আসছে। ঠিক এমনই দৃশ্য জোড়াসাঁকোর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ঠাকুরবাড়িতে যেখানে বুড়োবুড়ি, যুবকযুবতি, আবালবৃদ্ধবনিতার ভিড়। এই অসম্ভব ভিড় যেখানে কোনও নিয়ন্ত্রণই নেই, যেখানে হইহই রইরই আর কেবলই মানুষের স্রোত, সেখানে হঠাৎ-ই নাটকীয় নীরবতা নেমে এলো। কোনও শব্দ নেই। কোনও আওয়াজ নেই। অখণ্ড নীরবতা। একটা মানুষও এক ইঞ্চি নড়ল না নিজের জায়গা থেকে। কবির শায়িত মরদেহ ধীরে ধীরে সেই জোড়াসাঁকোর পুরনো বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এল। সেই মরদেহকে বহন করে নিয়ে এল মৃতদেহবাহকেরা! এই শহরের বড় বড় চিন্তাবিদরা হলেন মরদেহবাহক। কবি যেন ভেসে ভেসে চললেন অগণিত মানুষের মাথার ওপর দিয়ে। মৃতদেহ ফুল দিয়ে ঢাকা।

আমার মনে পড়ল তাঁর গান: 'আমারে তুমি অশেষ করেছ, এমনি লীলা তব—'।

পুরো কলকাতা শহরটা যেন পাগল হয়ে গেছে। মানুষজন কাঁদছে, হাহাকার করছে। শূন্যতা। আবার পূর্ণতা। একটা সময় যখন এই শোকমিছিলে আমি হাঁটছি তখন আমি এই শোকমিছিলটাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেলাম, যাতে নিমতলা শ্মশানের কাছে মিছিলটা পৌঁছনোর আগেই আমি পৌঁছে যেতে পারি। গঙ্গার ধারে এই নিমতলা ঘাটটি ক'দিন ধরেই সরকারি নিরাপত্তার মধ্যে রয়েছে যাতে কবির দেহের সৎকার সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। পুলিশের কর্ডন ঘাটের গেটের সামনে। বাধ্য হয়ে আমি দূরে দাঁড়ালাম। আমার মতো আরও অনেকে কোনও উপায় না-দেখে দাঁড়িয়ে রইল একটু দূরে। একটু তফাতে।কিন্তু সেই পুলিশ কর্ডনের ভেতর একটি লম্বা সুদর্শন যুবককে দেখে আমি একটু অবাকই হলাম। কতই বা বয়স হবে পঁচিশ-ছাব্বিশ। সাদা একটা ধুতি তাঁর পরনে আর গায়ে একটা কুর্তা। বিধ্বস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কর্ডনের ভেতরে। সেই যুবকের দু'টি হাতের ওপর সাদা কাপড়ে মোড়া একটি মৃত শিশু, যাকে শ্মশানে দাহ করতে এনেছে ওই যুবকটি, নিশ্চয়ই সেই শিশুটির বাবা। কিন্তু এখানে এসে এই নিষ্ঠুর পারিপার্শ্বিক অবস্থায় সে যুবকটি দ্বিধাগ্রস্ত। ও অন্য কোনও শ্মশানে গেল না কেন! ভাবলাম আমি। যুবকটি একাই এসেছে মনে হল। হয়তো কোনও ব্যাপার আছে যে, এই নিমতলা ঘাটেই তার শিশুটিকে দাহ করতে হবে। হয়তো মনের ভেতরে তেমন কোনও ইচ্ছে, যুবকটির কোনও বিশেষ অভিমান কাজ করছে। হঠাৎই ভিড়ের ঢেউ। সব দিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও

দিয়ে। কাতারে কাতারে মানুষ শ্মশানঘাট অতিক্রম করতে চলেছে। অসংখ্য মানুষ ছুটে আসছে শ্মশানের দিকে।

পুলিশের সবরকম রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা ভেঙেচুরে চুরমার হয়ে গেল জনতার মিছিলে। চারিদিকে বিশৃঙ্খলা। ভিড়ের চাপে মানুষের মৃত্যু! কোনওরকম বড় দুর্ঘটনা ঘটছে! কিন্তু ওই মৃত শিশুটি! শিশুটি হারিয়ে গিয়েছে, ভিড়ের চাপে মৃত শিশুটি পদপিষ্ট হয়েছে! ওই যুবকটি কি একমাত্র সন্তানের পিতা! হয়তো 'হ্যাঁ' হয়তো বা 'না'।

এ-অভিজ্ঞতা ভোলা যায় না। ৭ আগস্ট, বাংলা ক্যালেন্ডারে বাইশে শ্রাবণ। সেদিনই রবি ঠাকুর চলে গেলেন।

উনিশ বছর বাদে ১৯৬০ সালে যেদিন এক প্রযোজক একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি সম্পর্কে আমাকে পরিচালক হিসেবে স্বীকৃতি দিলেন, সেদিন আমি আমার তৃতীয় ছবিটি তৈরি করলাম এবং এই প্রথম আমার মনে হল আমি একটা মহৎ কিছু করেছি। যে কথা আগে আমার কোনওদিন মনে উদয় হয়নি।

ছবিটির নাম দিলাম 'বাইশে শ্রাবণ'। যেদিন রবি ঠাকুর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সেদিনই একটি মৃত শিশু সৎকার হওয়ার আগেই আবার শেষ হয়ে যায় ভিড়ের পদপিষ্টে। আমার ছবি 'বাইশে শ্রাবণ'-এ সেই একই দিনে একটি মাঝবয়সী মানুষ লোকাল ট্রেনে কিছু পসরা সাজিয়ে বিক্রি করছিল। ট্রেনটির একটি কামরায় বর ও কনে যাচ্ছিল। বরটি দেখতে সুন্দর নয় অথচ কনেটি দেখতে ভারী মিষ্টি। সে কনেটি বরটির চাইতে বয়সে অনেক ছোট। দু'জনের বয়সের ফারাকটা বেশি। বরটি দেখতে খারাপ বলে মানুষটি খারাপ নয়। মেয়েটি অর্থাৎ কনেটিও ভাল। এরা দু'জন স্বামী-স্ত্রী ভাল সময়, খারাপ সময়, নিষ্ঠুর সময় সবরকম সময়কে দেখেছে, মোকাবিলা করেছে, লড়াই করেছে।

কিন্তু ছবিটির নাম যেহেতু 'বাইশে শ্রাবণ', রবীন্দ্রনাথের তিরোধান দিবস, সেই কারণে তৎকালীন এক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক অপূর্বকুমার চন্দ ছবিটির নাম নিয়ে আপত্তি জানালেন। শুধু তাই নয়, তিনি মনে করলেন, এ-নামটি অর্থহীন। আমি কবির প্রতি অশ্রদ্ধা জানিয়ে নামটি রেখেছি। তিনি তখন ভারতীয় চলচ্চিত্রের সেন্সর বোর্ডের একজন কর্তাব্যক্তি এবং ওঁকে সমর্থন করেন আর এক সদস্যা, যিনি সমাজসংস্কারক ছিলেন, শ্রীমতী অশোকা গুপ্ত। বাকি সদস্যরা অবশ্য তেমন কিছু বলেননি। আমাকে একটি মিটিংয়ে ডাকা হল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

এ দু'জন সদস্যের সঙ্গে তুমুল বাদানুবাদ হল। আমার যুক্তি ছিল যে কবির মৃত্যুদিন বাইশে শ্রাবণের সঙ্গে এ-ছবির কোনও রকম যোগসূত্র নেই।

আমি তাঁদের বোঝালাম যে কবির মৃত্যুদিনে একটি পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সের যুবকের কোলে একটি মৃত শিশু নিমতলা শ্মশানে ভিড়ের চাপে হারিয়ে গেল, যার কোনও হদিশ পাওয়া গেল না, এ-ব্যাপারটা আমার মাথায় ছিল। এটা সত্যি যে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর দিনটির তাৎপর্য আছে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কাছে, কিন্তু আমি যেটা চোখে দেখেছি তা আমি কোনওদিন ভুলতে পারিনি। সে-দিনটি সে-দৃশ্যটিকে মনে রেখে আমার অধিকার আছে এ-কাহিনির ভেতর দিয়ে মানুষের চোখের জলকে ধরে রাখার।

'আপনি ছেলেমানুষ। আপনি যুবক কিন্তু বড্ড একগুঁয়ে। আপনি কি অন্য কোনও তারিখ নিয়ে নামটা ঠিক করতে পারেন না? রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর আগের দিন বা পরের যে কোনও একটি দিন।' বললেন অপূর্ব চন্দ।

'যে কোনও একটি দিন? 'না' বললাম।

'কেন?' বললেন উনি।

'কারণ, ওরা দু'জনে বাইশে শ্রাবণেই বিয়ে করে। ওটা ওদের বিয়ের তারিখ।'

ওঁরা দু'জনে, শ্রীঅপূর্ব চন্দ ও অশোকা গুপ্তও ছাড়বেন না, আমিও ছাড়ব না। ওঁরা বললেন, নাম বদলাতে হবে। আমি বললাম, বদলাব না।

শ্রীমতী গুপ্ত অধৈর্য হয়ে বললেন, 'তেইশে শ্রাবণ করতে পারেন না। এতই অসুবিধে! বাইশের জায়গায় তেইশে শ্রাবণ।'

'না। সম্ভব নয়। ওটা ছবির নায়ক ও নায়িকার বিয়ের তারিখ।'

স্বাভাবিকভাবে ব্যাপারটা দিল্লির অফিসে জানানো হল। তখন দিল্লিতেই এসব হত। এখন মুম্বইতে এসব হয়।

দিল্লির মন্ত্রিসভা আমার প্রতি দয়াবান হলেন এবং আমার ছবি 'বাইশে শ্রাবণ' নামেই ছাড়পত্র পেল। কিন্তু যেমন হয় আর কি, এ ছবির ক্ষেত্রে ঠিক তাই হল। ছবিটি ব্যবসা করতে পারল না। পয়সা পেল না।

পরবর্তীকালে অপূর্ব চন্দ আমার কাছে অপূর্বদা হয়ে গেলেন। আমরা দু'জনে ঘনিষ্ঠ হয়ে গেলাম। বন্ধুর মতো। একদিন কথায় কথায় ওঁকে বললাম অলডাস হাক্সলির উপন্যাসের কথা। যে উপন্যাসের শুরু গুরুগম্ভীর বাক্য দিয়ে, গাঁধীজির

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মৃত্যুদিন দিয়ে—It was the day of Gandhi's assassination. অথচ উপন্যাসটিতে গাঁধীজির মৃত্যু, গাঁধীজির জীবন, অহিংসা, দর্শন কোনও কিছুই নেই।

হাক্সলির 'এপ্ অ্যান্ড এসেন্স' উপন্যাসের কথা উঠলে অপূর্বদা বলতেন, 'আরে ওসব ভুলে যাও। ওসব পুরনো কথা।' কথাটা বলে আমার পিঠ চাপড়ে দিতেন। পরবর্তীকালে এ-সব নিয়ে একটি কথাও আর বলেননি তিনি। কিন্তু 'বাইশে শ্রাবণ' ছবিটিকে তিনি কোনওদিন ভোলেননি। কারণ ছবিটি তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। ছবিটির ভেতরকার শক্তি তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি বললেন, এ-ছবিটির দুর্ভিক্ষের দৃশ্যটি ইলিপটিক্যাল। 'বুঝতেই পারছ কী বলতে চাইছি।' ঠিক মাস্টারমশাইয়ের মতো করে বললেন। আমিও কিছু না বুঝে বাধ্য ছাত্রের মতো মাথা নাড়লাম। বাড়ি এসে অক্সফোর্ড ডিকশনারি দেখলাম উৎফুল্ল শিশুর মতো এবং ইলিপসিস মানেটা দেখলাম। ইলিপসিস মানে হল: কোনও বাক্য থেকে কোনও শব্দ যখন বাদ দেওয়া হয় যাতে পুরো বাক্যটার মানে অন্যভাবে বোঝা যায়। সেটা আরও সুন্দর ও শৈল্পিক।

হ্যাঁ ঠিকই। 'বাইশে শ্রাবণ' ছবিতে আমি একটি লম্বা শটে যে-দুর্ভিক্ষকে ধরেছি সেটা হল গ্রামের মানুষেরা শহরের দিকে ছুটছে খিদের জ্বালায়। সুতরাং দুর্ভিক্ষের চরম অবস্থাটা কেন কী এ-বৃত্তান্তে না-গিয়ে আমি দুর্ভিক্ষের একটি দৃশ্য এনেছি মাত্র। এর বেশি কিছু নয়।

'বাইশে শ্রাবণ' তৈরির সময়েই আমি মনে মনে ঠিক করে নিয়েছিলাম যে, ছবিটি কোনও রিপোর্টাজ হবে না, কত মানুষ বাঁচল কত মানুষ না-খেয়ে মরল সেটাও নয়। শকুন আর শেয়াল লড়াই করছে শবদেহ নিয়ে, সেসবও নয়। দুর্ভিক্ষের সময়ে ক্ষুধার্ত শিশু মৃত মায়ের স্তন পান করছে সে দৃশ্যও নয়। এসব আমি অনেক দেখেছি এই শহরে, আমার এই শহরের আশপাশে যখন সেই দুর্ভিক্ষ চলছিল। মৃত্যু দেখে দেখে মানুষের যে স্বাভাবিকভাবে মরবার অধিকার আছে সেটা আমি ভাবতে পারছিলাম না। মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম এসব কথা ভেবে ভেবে।

এই ছবিতে ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ এসেছে। ধীরে ধীরে ছবির দ্বিতীয় পর্বে দুর্ভিক্ষ আরও কুৎসিত হয়েছে। এ-ছবির শেষ দৃশ্য পর্যন্ত সেই ক্ষুব্ধ তিক্ত স্বামী আর তাঁর শিশু, স্ত্রী যাঁরা দুর্ভিক্ষের নির্মম যন্ত্রণাকে সহ্য করতে না-পেরে একে অপরকে গালমন্দ করছে। এটা আর কিছুই নয়, এটা শুধু মানুষের সৌন্দর্য

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কীভাবে ধ্বংস হয়ে যায় সেটাই। ক্যামেরা একটি ঘরের মধ্যে চলাফেরা করেছে। একবারও ক্যামেরা ওদের দু'জনের মুখের অভিব্যক্তির ভাষার বাইরে যায়নি। ঘরের মধ্যে ওদের মুখের ওপর ঘুরেছে। স্বামীটি কোনও শয়তান ছিল না, স্ত্রীটি ছিল সুন্দরী। শুধু তাঁরা দু'জন লড়াই করছে।

ছবি শেষ হওয়ার পর আমি প্রযোজককে বললাম যে সাবটাইটেল করা যেতে পারে। 'ওয়েডিং ডে' হবে ছবিটির নাম এবং ভেনিসে পাঠানো যেতে পারে এই আগস্টের চলচ্চিত্র উৎসবে। প্রযোজক ঝুঁকি নিতে রাজি হলেন না কারণ ব্যাপারটা ব্যবসা দেবে না। শুধু তাই নয়, ফেস্টিভালে ছবিটি গ্রহণ হবে কি হবে না, ওরা ছবিটিকে উৎসবে দেখাবে কি দেখাবে না, কে জানে! যদি সেই উৎসবে ছবিটি দেখানোর জন্য মনোনীতও হয় তা হলেও প্রযোজক খুব একটা উৎসাহী ছিলেন না কারণ ছবির নতুন প্রিন্ট করাতে আবার খরচ। এ ছাড়া সাবটাইটেল, ছবির বিজ্ঞাপনের খরচ, ছবির প্রচুর স্টিল, ছবির সমালোচকদের বিলি করার জন্য এবং আরও কিছু আনুষ্ঠানিক খরচ সব মিলিয়ে মিশিয়ে ভালই খরচ। প্রযোজক বললেন শুধু ছবিটার নতুন প্রিন্টের খরচ দেওয়া যেতে পারে, বাকি আর কিছু নয়। আমি আশাহত হলাম।

আমি বেপরোয়া হয়ে ঘুরতে লাগলাম। যাই হোক এমতাবস্থায় প্রায় আধ ডজন স্টিল, ছবির একটা সিনপসিস, সঙ্গে আমার ছবির সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত একটা বিবরণী ভেনিসের চলচ্চিত্র উৎসব কমিটির কাছে পাঠালাম। সঙ্গে সঙ্গে সেই উৎসবের ডিরেক্টর একটি টেলিগ্রাম পাঠালেন এই জানিয়ে যে, সাবটাইটেল ফরাসি ভাষায় হলেও চলবে যদি ইতালীয় ভাষাতে সম্ভব নাও হয়।

প্রযোজক ভদ্রলোক তাঁর কথামতো ছবির নতুন প্রিন্ট করার খরচ দিলেন আর আমি নিজের পয়সায় অর্থাৎ ছবির প্রতিটি রিলের জন্য নিজের পকেট থেকে খরচ করলাম যাতে অন্তত সংলাপগুলো ছবির ফ্রেম অনুযায়ী ইংরেজি ভাষাতে বোঝা যায়। শুধু ইংরেজিতে সংলাপগুলো সাজানো হল। কয়েকদিনের মধ্যে ছবির রিল অর্থাৎ নতুন প্রিন্ট উড়ে চলে গেল ভেনিসে। আমি জানতাম যে সাবটাইটেল যখন নেই, শুধু ইংরেজিতে সংলাপ যার জন্য ছবিটির প্রদর্শন সম্ভব নয় এবং ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে সুযোগ পাবে না। উৎসবের কর্মকর্তারা ছবিটি বাতিল করে দেবেন। ক'দিন বাদেই উৎসবের কর্তারা টেলিগ্রাম করে জানালেন যে সাবটাইটেল ব্যতীত ছবিটিকে মূল

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রতিযোগিতায় আনা যাবে না। তবে ছবিটি একটি বিশেষ ছবি হিসেবে প্রদর্শিত হবে। কিন্তু সেটা প্রতিযোগিতার বাইরে। সেটা হবে সৌজন্যমূলক প্রদর্শন।

আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম এই ভেবে যে অন্তত আমার পরিচিতিটা হল বা হবে। উপরি পাওনা হল ভেনিসে তিনদিনের জন্য আমন্ত্রিত হওয়া। আমি ওই উৎসবের একজন অতিথি হওয়া সত্ত্বেও যেতে পারিনি শেষপর্যন্ত অর্থাভাবে। এরই মধ্যে ছবিটির বিভিন্ন দৃশ্য অনুযায়ী একটি দশ-পনেরো পাতার সিনপসিস তৈরি করে ছাপিয়ে নিলাম বিশেষ বিশেষ বিচারক জার্নালিস্টদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। অন্তত ওঁরা সবাই ছবিটির মর্মার্থ যাতে বুঝতে পারেন।

আমার যাওয়া হল না। কিন্তু অভিভাবক ছাড়াই ছবিটি সাত সমুদ্র ডিঙিয়ে একা পৌঁছে গেল ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবের আসরে। কয়েক দিনের মধ্যেই অজানা কিছু জায়গা থেকে কিছু রিভিউ পেয়ে গেলাম। এর মধ্যে স্মরণীয় হল জর্জ শাদুলের ফরাসি ভাষায় একটি রিভিউ যেটি প্রকাশ হয় *Les Lettres Francaise* পত্রিকায় এবং অপরটি হল জিন মাসকোভিচের, যিনি 'ভ্যারাইটি' নামে একটি ব্যবসায়িক জার্নালে লেখেন। সেসব রিভিউ পড়ে আমি যারপরনাই খুশি হই। নিজের আত্মবিশ্বাস বাড়ে। এটাই আমাকে ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র দুনিয়ায় প্রবেশ করিয়ে দেয়। সেটা ছিল ১৯৬০ সাল। ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসব কমিটি আমাকে অনুরোধ করল ছবিটির প্রিন্ট ওদের আর্কাইভে রাখার জন্য। উপহার দিলাম সেই প্রিন্টটা। ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসব শেষ হওয়ার পর আমি তথ্য ও প্রচারমন্ত্রক থেকে খবর পেলাম যে লন্ডনের ন্যাশনাল ফিল্ম থিয়েটার লন্ডন চলচ্চিত্র উৎসবে আমার 'বাইশে শ্রাবণ' দেখাতে উৎসাহী। নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হবে। কোনও একজন উৎসবের কর্মকর্তা 'বাইশে শ্রাবণ' ভেনিসে দেখে নির্বাচিত করেছে। সে জন্য ওরা আমার অনুমতি চায় এবং একটি ছবির প্রিন্ট ইংরেজি সাবটাইটেলসহ পাঠাতে হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

প্রযোজকের অনুমতি শীঘ্রই পেয়ে গেলাম, কিন্তু সাবটাইটেলের পরিবর্তে আমি সাউন্ডট্রাকে ইংরেজিতে সংলাপ ব্যবহার করলাম। কারণ, সাবটাইটেল খরচসাপেক্ষ। ঠিক যেমন রেডিয়োতে ধারাবিবরণী হয় ঠিক সেরকম। সবকিছুই হল আমার মধ্যে এক ধরনের নৈরাশ্য থেকে। যাই হোক দিল্লির মন্ত্রক থেকে এক উপদেশ এল। ছবির একটি অংশ বাদ দিতে হবে। সেটি কী? সেটি হল একটি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ক্ষুধার্ত মানুষ তার শীর্ণকায় আঙুলগুলোর ভেতর দিয়ে চটকে চটকে খাচ্ছে। আমি সেই মন্ত্রকের এক অফিসারকে টেলিফোনে জিজ্ঞেস করলাম ব্যাপারটা কী? সে অফিসারটি বললেন তথ্য ও বেতারমন্ত্রকের এক কর্তাব্যক্তি ছবিটি কলকাতায় দেখেছেন তাঁর এক লন্ডনবাসী বন্ধুর সঙ্গে। সেই লন্ডনের বন্ধুটির ওই হাতের আঙুল দিয়ে ভাত গলে যাওয়ার ব্যাপারটা মনে হয়েছে এক ধরনের অসুস্থতা। আমি টেলিফোনে কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে কথা না-বাড়িয়ে রিসিভার রেখে দিলাম। সেই অফিসারকে ন্যাশনাল ফিল্ম থিয়েটার-এ ডেকে পাঠালাম এবং জানতে পারলাম সাবটাইটেলসহ ছবিটি পাঠালে অনেক বেশি দর্শক আসবে।

আমি বললাম আমি চেষ্টা করব। উনি বললেন, চিন্তা করবেন না, একটা ব্যবস্থা হবে। এ কথাটা শুনে আমি আশ্বস্ত হলাম।

লন্ডন চলচ্চিত্র উৎসবে 'বাইশে শ্রাবণ' সাবটাইটেল ছাড়া শুধু ইংরেজি সংলাপে দেখানো হয় এবং অবশ্যই সেই ক্ষুধার্ত মানুষটির ভাত খাওয়ার দৃশ্যটিও বাদ যায় না। কিন্তু ছবিটির হয়ে বলার মতো কোনও প্রতিনিধি সেখানে ছিল না। এমনকী ভারতীয় হাইকমিশনেরও তেমন কেউ ছিল না।

লন্ডনের পর একই প্রিন্ট স্ক্যান্ডিনেভিয়ার কতকগুলো ছোট ছোট উৎসবে দেখানো হল, একই ভাবে ইংরেজি সংলাপসহ।

'বাইশে শ্রাবণ' তৈরি হয় ১৯৬০ সালে। এ-ছবিতে ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরের চিত্র, দুর্ভিক্ষের চেহারা স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে এবং আমি আবিষ্কার করলাম সিনেমা কী! কীভাবে সিনেমা তৈরি হতে পারে।

নির্লজ্জের মতো সত্যি কথা বলতে হয় যে আমার সিনেমার প্রতি কোনও আকর্ষণ ছিল না অন্তত প্রাথমিক অবস্থায়। আগেও বলেছি। এক-দু'বার সিনেমা দেখার পর আমার দু'চোখ ভরে যে ভাবনা খেলা করে সে তাড়নাতে আমি মুখ খুলি। ছবি আর কথা বলা আমাকে বিস্ময়ের জগতে নিয়ে আসে। পরবর্তীকালে আমি, আমার বন্ধুরা, আমার আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে বেশ কয়েকটি ছবি দেখি। হিসেব করিনি যে কতগুলো ছবি দেখলাম।

কিন্তু আমি পড়তাম। বিভিন্ন রকম বই পড়তে ভালবাসতাম। সবরকম বই পড়তাম। কোনও বিশেষ বই বা বিশেষ লেখার প্রতি ঝোঁক ছিল না আমার। দর্শন, রাজনীতি, ইতিহাস, ধর্ম, সাহিত্য, নাটক, সমাজবিজ্ঞান, কবিতা যা হাতের সামনে পেতাম। কার্ল মার্কসের কোনও লেখা হয়তো এ-সপ্তাহে, পরের সপ্তাহে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হয়তো ফ্রেডরিক নিৎসে-র *Thus Spake Zarathustra*। হয়তো সেটা এই কারণেই যে আমি কী পড়ব, কী নিয়ে পড়ব, তেমন কোনও বিশেষ লক্ষ্য আমার ছিল না। ন্যাশনাল লাইব্রেরির তখন নাম ছিল ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি, সেখানে একদিন হঠাৎ একটি বই পেলাম। বইটি ছিল সিনেমার ওপর লেখা। বইটির মধ্যে ছবির শিল্পের দিকটাই বেশি আলোচিত। বইটির নাম 'ফিল্ম'। লেখক রুডলফ আর্নহেইম। অসাধারণ লেখা। কিছুটা অনুধাবন করলাম কিছুটা আবার বুঝতেই পারলাম না। তিন-চার মাস ধরে ওই লাইব্রেরিতে ছবির ওপর যতরকম বই ছিল, শেষ করলাম। বইগুলো পড়ে বুঝলাম যে ছবি বা সিনেমার ওপর আমি কিছু শিখতে পেরেছি। সেই সময়ে বিভিন্ন সিনেমা হলে সিনেমা দেখতে লাগলাম, বিভিন্ন থিয়েটার হলে নাটক দেখতে লাগলাম। ধীরে ধীরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ছবি দেখলাম। বিভিন্ন দেশের কনসুলেটগুলোতে বিভিন্নরকম ছবি এবং ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির দৌলতে আমি চলতি ছবির আন্দোলনের এক সক্রিয় কর্মী হয়ে দাঁড়ালাম। ফলস্বরূপ লিখতে শুরু করলাম কিছু প্রবন্ধ। সেগুলো সিনেমার আঙ্গিক, শৈল্পিক দিক নিয়ে। শুধু তাই নয়, সিনেমার সামাজিক প্রেক্ষাপটে যে দর্শন আছে সে দর্শনের কথাও। এ-সবের পরিপ্রেক্ষিতে আমি একটি শব্দ ব্যবহার করলাম সেটি হল নিউ সিনেমা।

আমার প্রথম ছবি হল 'রাতভোর'। 'রাতভোর'-এর গল্প অতি সাধারণ। একটি গ্রামের ছেলে, সে গরিব। ছেলেটিকে সবাই হেয় চোখে দেখে। ছেলেটি এই শহরে আসতে বাধ্য হয়েছিল ভাগ্যের অন্বেষণে। ছেলেটিকে এ শহরে নিয়ে এসেছিল একটি ধনী উচ্চবিত্ত পরিবার। এ-ছবিটি একেবারেই চলেনি। দর্শক সম্পূর্ণভাবে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল। ছবিটি তৈরি করা এবং তৈরি হওয়া একটি ঝড়ে ভেঙে পড়া, মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে যাওয়ার ইতিহাস। আমি বুঝলাম আমি ঠিকমতো ছবি করতে শিখিনি। আমি ঠিকমতো বলতে শিখিনি। কীভাবে বলতে হয় ছবিতে এ-ব্যাপারটা আমি আদৌ শিখিনি। আমি আবিষ্কার করলাম যে আমি নিজেকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছি।

ঠিক সেই সময়ে ১৯৫৫ সালে সেই বিখ্যাত 'পথের পাঁচালী'-র আবির্ভাব। যে-ছবিটি সারা বিশ্বের বিস্ময় হয়ে উঠল। বিশ্বের দরবারে সত্যজিৎ রায়ের তৈরি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ছবি। কিন্তু আমার মনে হয় যে ছবিটি সব চাইতে জীবন্ত, সব চাইতে জটিল, সব চাইতে সমকালীন সত্যজিৎ রায়ের অন্যান্য ছবির

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তুলনায়, তা স্বাভাবিক কারণেই 'অপরাজিত'। ছবিটি তৈরি হয় ১৯৫৬ সালে— সমকালীনতায় সমৃদ্ধ। একই কারণে ১৯২৮ সালে কার্ল ড্রায়ারের 'প্যাশন অব জোয়ান অব আর্ক' আমি মনে করি রীতিমতো প্রাসঙ্গিক।

আমি নিজেকে সরিয়ে রেখেছিলাম, বলতে গেলে লুকিয়ে রেখেছিলাম 'রাতভোর' ছবিটি তৈরি করার পর। যতদিন 'নীল আকাশের নীচে' ছবিটি তৈরি করিনি ততদিন অন্তরালেই ছিলাম। যদিও এ-ছবিটি সম্পর্কে আমার নিজের কিছু স্ববিরোধী বক্তব্য আছে, তবুও ছবিটি দর্শকরা সানন্দে গ্রহণ করেছিল। পণ্ডিত নেহরু এ-ছবিটি পছন্দ করেছিলেন এবং বহুকাল মনে রেখে ছিলেন। ওঁর ছবিটি ভাল লাগার কারণটি বোধ হয় ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের চেহারার কিছুটা এ-ছবিতে ছিল। গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সঙ্গে ফ্যাসিজ়মের বিরোধের কথাও এ-ছবিতে ছিল। উপরন্তু জাপানের মিলিটারি শাসক যখন চিন আক্রমণ করেছিল সেই ১৯৩০-এর মাঝ দশক, ঠিক সেই সময়ের কথাও এ-ছবিতে ছিল। এ-ছবির প্রযোজক সংগীতশিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় খুব খুশি হয়েছিলেন কারণ দর্শকরা এ-ছবির প্রশংসা করেছিল। বলা বাহুল্য ছবিটি ব্যবসা করেছিল। মজার ব্যাপার হল সরকারি আমলারা পুরনো ফাইলপত্র ঘেঁটে কয়েকবছর বাদে ছবিটিকে বন্ধ করে দিলেন। নিষেধাজ্ঞা জারি হল। এ-ব্যাপারে তথ্য ও প্রচারমন্ত্রক ছিল মুখ্য ভূমিকায়। এতদিন ছবিটি প্রদর্শিত হবার পর এমন একটি ঘটনা রীতিমতো হাস্যকর। সেটি হল সেই সময় ভারতের পাশের দেশ চিনের সঙ্গে সীমান্ত নিয়ে একটা বাদানুবাদ চলছিল। সেই সময়ের সেই বাদানুবাদ দুটি দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দিল। ১৯৬২ সাল। কিছুদিন বাদেই সবকিছু আবার থিতু হয়ে গেল। ছবিটি প্রদর্শনের নিষেধাজ্ঞা এজন্যই হয়েছিল। সীমান্তে গোলাগুলি চলছিল, আবার দিল্লি আর বেজিং-এ চলছে নানারকম কূটকচালি। সরকারি আমলারা সেই ১৯৩০-এর মাঝামাঝি জাপান আর চিনের ঘটনাটা বুঝতেই পারল না। সেটা ছিল একটি ফ্যাসিস্ট আক্রমণ। অথচ ভারত-চিন সীমান্ত ঝগড়া বাদানুবাদ, ১৯৬৩ সাল অবধি সেটা গড়িয়েছিল, তার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্কই ছিল না।

এ-ব্যাপারটা বেশি দিন চলল না। কারণ কমিউনিস্ট এম পি হীরেন মুখোপাধ্যায় একটি অসাধারণ বক্তব্য রাখলেন লোকসভাতে পণ্ডিত নেহরু ও তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ভি কে কৃষ্ণ মেননের সামনে। নেহরু ও মেনন দুজনেই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অবাক হলেন সরকারি আমলাদের এই ধরনের কার্যকলাপের কথা জানতে পেরে। 'নীল আকাশের নীচে' ছবিটির ওপর নিষেধাজ্ঞা উঠে গেল। এ-নিষেধাজ্ঞাটি ছিল ঠিক তিন মাসের জন্য। সম্ভবত সবচাইতে স্বল্প সময়ের নিষেধাজ্ঞা। যেমন আমার বাবার ওপর তিরিশের দশকে আইনব্যবসা করার জন্য নিষেধাজ্ঞা ছিল ছ'টি মাসের জন্য। কারণ আমার বাবা, গাঁধীজিকে ব্রিটিশ সরকার কারাগারে নিক্ষেপ করবার জন্য তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। এ-প্রসঙ্গে বলতে হয় গাঁধীজির কারাবাসের কথা প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়েছে। বাবা কলকাতা হাইকোর্টে আপিল করেন। সুভাষচন্দ্র বসুর বড় ভাই শরৎচন্দ্র বসু এ-মামলায় বাবার হয়ে সওয়াল করেন । হাইকোর্টে মামলাটির সঙ্গে সঙ্গে শুনানি হয় এবং বাবার আইনব্যবসার ওপর নিষেধাজ্ঞা উঠে যায়।

ফিরে আসি চলচ্চিত্র বা ছবি নির্মাণের আলোচনায়। আমি আমার বন্ধু ঋত্বিক ঘটকের প্রথম ছবি 'নাগরিক' দেখে খুশি হতে পারিনি। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় ছবি 'অযান্ত্রিক' একটি অসাধারণ ছবি এবং ভীষণ ভাল ও মৌলিক ছবি। সম্ভবত তাঁর ছোট্ট জীবনে তুলনারহিত। এ-ছবির কাহিনি একটি ভাঙা মোটরগাড়ি এবং এ-মোটরগাড়ির সঙ্গে এক রাগী ড্রাইভারের ভালবাসা-যন্ত্রণার কাহিনি। সবকিছু বলা হয়েছে ভারী সুন্দরভাবে, নিটোলভাবে। এই গাড়িটিতে বসে কিছু যাত্রী যখন নিজের নিজের কাহিনি বলছে তখন ঋত্বিকের ক্যামেরা এদের কথা, এদের মুখ অবয়ব ছুঁয়ে ছুঁয়ে অন্য আর-একটি গল্প বলে দেয়, যে গল্পে আদিবাসীদের পালাপার্বণের কথা বলা হয়। এরা সবাই খুব শক্তিশালী কিন্তু এদের ভেতরে একটা সহজাত বেপরোয়া মনোভাব কাজ করে। হয়তো ঋত্বিক নিজের ভেতর নিজেই লড়াই করত। বেপরোয়া ভাবটা তাঁর চরিত্রের মধ্যেও ছিল, যে জন্য এ-ছবিটিতে সেটিও ফুটে উঠেছে।

যাই হোক, দর্শককুল ছবিটির অকুণ্ঠ প্রশংসা করলেন, এমনকী কেউ কেউ বললেন—ছবিটি সত্যজিতের যে কোনও ছবির চাইতেও উচ্চমানের ছবি।

আমি বাঁচলাম, আমি 'বাইশে শ্রাবণ' তৈরি করলাম। সেটা তৈরি হল ষাটের দশকে। ষাটের দশকে তৈরি হল চল্লিশ দশকের সেই যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশভাগ নিয়ে ছবি। ওদিকে সেই দূর প্রাচ্যে, সেই জাপানে হিরোশিমা নাগাসাকি জ্বলে উঠে ছিল সেই চল্লিশের দশকে।

The Cannibal Time! বীভৎস !

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় অধ্যায়

১৯৬৫ সাল থেকে যতবার বিদেশ গিয়েছি বেশিরভাগ সময়টাই পশ্চিমে কাটিয়েছি। সে সবই ছবির ব্যাপারে এবং ছবি সম্পর্কে কোনও-না-কোনও সেমিনারে। ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত যতবার বিদেশ যাত্রা হয়েছে ততবারই ওই একই ব্যাপার।

জাপান থেকে আমন্ত্রণ এল অন্তত দিন পনেরো সেখানে থাকার জন্য। আমাকে স্বাধীনতা দেওয়া হল আমার ভ্রমণসূচিকে নিজের মতো করে সাজিয়ে নেওয়ার জন্য এবং এটা এল এখানকার বৈদেশিক মন্ত্রক থেকে। আমি আনন্দে অভিভূত হয়ে বেছে নিলাম সবার আগে হিরোশিমাকে। হিরোশিমার পর মনে মনে সাজিয়ে নিলাম 'কাবুকি'—জাপানের একটি প্রাচীন নাটকীয় ধারা। সেমিনারের সময়সূচি ছেড়ে দিলাম ওঁদের ওপর। ছবির সেমিনার ছাড়াও ছিল ছবি-নির্মাতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, মতামত বিনিময়, ইন্টারভিউ ইত্যাদি। এ-ব্যাপারে একজনের নাম করতেই হয় তিনি হলেন নোরিয়াকি সুচিমোতো। তাঁর তৈরি একটিমাত্র ছবিই আমাকে পাগল করে দিয়েছে। একটি অসাধারণ ছবি। এ-ছবিটি দেখার সুযোগ পাই সুইজারল্যান্ডে। যদিও সুচিমোতো অনেকের কাছেই তেমনভাবে গ্রহণযোগ্য নয়, তবুও আমি ওঁকে চিনতাম, জানতাম। একটিমাত্র ছবি দেখেই আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহ প্রকাশ করি। আমি কখনই অবাক হইনি যখন জানলাম তিনি তাঁর দেশের সরকারের প্রিয় পাত্র হতে পারেননি। সরকার ও আমলাদের পছন্দের তালিকায় তিনি নেই।

যখন জাপানের মাটিতে পা দিলাম, এয়ারপোর্টের মাটি স্পর্শ করলাম তখন সেখানে আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করে নিতে এসেছিলেন জাপানের বৈদেশিক মন্ত্রকের পদস্থ কর্তাব্যক্তিরা এবং আমার বিশেষ বন্ধু আকিরা ইওয়াসাকি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আকিরার সঙ্গে প্রথম আলাপ হয় হেলসিঙ্কি চলচ্চিত্রের আর্কাইভে অথবা মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে অথবা বিলিসিতে। বিলিসি হল অধুনা জর্জিয়ার রাজধানী। দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হয় নারিতা এয়ারপোর্টে। এই সময়ে আকিরার সঙ্গে অনেক কথা হয়, সখ্যতা বাড়ে, বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হয়।

আকিরা জাপানি ও রুশ ছবির একজন বিশেষজ্ঞ। আকিরার সঙ্গে হৃদ্যতার বিশেষ কারণ হল যে তিনি রবীন্দ্রনাথ, গাঁধীজি ও পণ্ডিত নেহরু সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করেন। উনি এঁদের শ্রদ্ধা করেন। এসব কারণে আমরা দু'জনে দু'জনের অনেক কাছাকাছি এসে যাই।

আমি যখন এয়ারপোর্ট থেকে গাড়িতে করে হোটেলের দিকে যাচ্ছি তখন আমাকে বলা হল যে আকিরা আমাকে সঙ্গ দেবেন, আমার সঙ্গী হবেন যদি তাঁর শরীরটা বেসামাল না হয়। শরীরটা তাঁর আদৌ ভাল যাচ্ছে না। গাড়িতে পাশে বসা আকিরাকে দেখেই মনে হল কীরকম যেন বিমর্ষ তিনি। শরীর তাঁর টানছে না। আমার কাছাকাছি বয়সের একটি মানুষ আমার বন্ধু আকিরা অসুস্থ!

সেটা ছিল একটি রবিবার। ১৮ মার্চ, ১৯৭৯। আকিরা আর আমি কিয়োটো এবং নারা হয়ে হিরোশিমা পৌঁছলাম। যাত্রাপথে কিয়োটোতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর সাত তাড়াতাড়ি রওনা দিলাম সেই গন্তব্যস্থল হিরোশিমার দিকে। আকাশ ছিল সেদিন পরিষ্কার, মেঘমুক্ত। যাত্রাপথে নারা শহর ছুঁলাম। নারা প্রাচীন জাপানের একসময়ের রাজধানী।

হিরোশিমায় পৌঁছলাম এবং পৌঁছেই দেখলাম একটি সুন্দর মিউজিয়াম। সেই মিউজিয়ামটির ভেতরে সযত্নে রক্ষিত ভয়ংকর এক ধ্বংসস্তূপ।

হিরোশিমার আকাশটা তখন পরিষ্কার ঝকঝকে তকতকে। আকাশে কোনও মেঘ নেই। যখন আমরা মিউজিয়ামের গেটের কাছে এসে পৌঁছলাম আকিরা হঠাৎই আমাকে নিয়ে একটি বিশেষ জায়গায় এলেন। সেখানে এসে কয়েক মুহূর্তের জন্যে যেন একটু দাঁড়ালেন।

কী অলৌকিক দৃশ্য। কী নিঃসীম নীরবতা! এক দুঃসহ অতীত। সেই হিরোশিমা-নাগাসাকি। আমি একটি ছবির দিকে তাকিয়ে আছি। একটি বালকের ছবির দিকে। আকিরা তখন ঠিক আমার পেছনে। বালকটির চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ। মুখে কোনও কথা নেই, তাকিয়ে আছে সামনের দিকে অর্থাৎ আমার দিকে। বালকটি ভীত, সন্ত্রস্ত। বালকটির হাতে একটি রাইস বল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এই ছবিটি তোলা হয়েছিল নাগাসাকিতে ১০ আগস্ট, ১৯৪৫। ঠিক আণবিক বোমায় বিধ্বস্ত হওয়ার পরের দিন। দুপুরবেলার একটু আগে। ছবিটি তুলেছিলেন ইয়ামাহাতা ইয়াসুকে। এ ছবিটি আজ সমগ্র পৃথিবীতে সর্বকালের ছবি হয়ে আছে। শাশ্বত ছবি হয়ে আছে। আকিরা এইটুকুই জানতেন। আর কিছু জানতেন না। সেই ছবি, যে ছবিটিতে নামহীন একটি মানবশরীর, নামহীন একটি বালক, সেদিনের নীরব সাক্ষী।

হয়তো সে বালকটি কয়েকদিন বাদে আণবিক বোমার বিষাক্ত তেজস্ক্রিয় রশ্মির বিকিরণের শিকার হয়েছিল, হয়তো বা বেশ কিছুদিন বাদে বা কয়েক মাস বাদে সবকিছু শেষ হয়ে যায় বালকটির জীবনে। কে জানে। সে সব খবর কে রাখে! আকিরাও সেসব কিছু জানতেন না। যদি সে বেঁচে থাকত, যদি সে বেঁচে থাকা মানুষদের একজন হত, তাহলে তেমন কোনও হাসপাতালে বিশেষ সাবধানে তাকে রাখা হত। তাহলে হয়তো সেদিনের সেই নিষ্ঠুর ঘটনার কথা সে স্মরণে রাখতে পারত। এটাই সেই ইতিহাস যে ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে সমগ্র মানবজাতি। যে ভয়ংকর ঘটনা পৃথিবীতে একটিবারই ঘটেছিল।

আমি যখন এদিক-ওদিক দেখছি, উপলব্ধি করার চেষ্টা করছি, তখন আকিরা চুপ করে আছেন। তাঁর কিছু বলার নেই। তিনি শুধু এ বীভৎস ইতিহাসের এ বীভৎস ঘটনার একটি অডিও ক্যাসেট আমাকে উপহার দিলেন। একটি ছোট্ট টেপরেকর্ডারও দেওয়া হল যেন ওই ক্যাসেটটা শুনে রেকর্ডারটা ফেরত দিয়ে দিই। ক্যাসেটটা রেকর্ডারে বাজিয়ে সেই নিদারুণ হত্যাকাণ্ডের নির্দয় নিষ্ঠুর কাহিনি শোনা গেল। সবশেষে কিছু নির্দেশ। কোন পথে যেতে হবে, কতটা যেতে হবে, কত পদক্ষেপ এগোতে হবে, কোথায় বাঁক নিতে হবে এবং কী কী স্থান ঘুরে দেখতে হবে।

হিরোশিমাতে এই লম্বা কয়েক ঘণ্টার ইতিহাসের ভেতর দিয়ে হেঁটে বুঝলাম যে সময়টা ছিল নিধনযজ্ঞের, মারণখেলার। দ্য ক্যানিবাল টাইম!

আকিরা চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলেন। হঠাৎই তিনি বললেন, আমরা এখানে একটু বিশ্রাম নিতে পারি। আমি ওঁর দিকে তাকিয়ে বুঝলাম যে উনি ক্লান্ত। আমরা সেই ধ্বংসস্তূপের সামনে ভাঙা দেওয়ালের দিকে পেছন করে বসলাম।

যেন মনে হল এখুনি সব ভেঙে পড়বে। কিন্তু জাপান ও জাপানের মানুষদের,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ধন্যবাদ দিতেই হয় তাঁদের অপূর্ব সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে রাখার ক্ষমতার জন্য। সে দেওয়াল কোনওদিনই ভেঙে পড়বে না।

আকিরা আমাকে ওপরের দিকে চাইতে বললেন। ওপরের দিকে তাকালাম। দেখলাম একটি বিশাল ঝুলন্ত কাঠের পাটাতন, যে পাটাতনে লেখা আছে তিনটি শব্দের একটি অসাধারণ লাইন: 'NO MORE HIROSHIMAS'।

আর কোনও হিরোশিমা নয়। এই একটানা ভয়ংকর যাত্রার শেষে এর চাইতে সুন্দর সাবলীল মধুর কথা আর কী হতে পারে।

'এ কথাটি আপনার পছন্দ হয়েছে? ভাল লেগেছে?' জিজ্ঞেস্ করলেন আকিরা।

'অসাধারণ। এটা জাপানিদের মানে আপনাদেরই সাজে।' বললাম আমি।

'কী বলতে চাইছেন!' বললেন আকিরা।

'বোধহয় আমার কথার মর্মার্থ তিনি বুঝতে পারেননি। আমি জোর করে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। 'ঠিক যেমন জাপানি ছবিতে হাইকু থাকে সেরকম।' আমি ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করলাম।

'হাইকু!' আকিরা অবাক হয়ে বললেন।

'হ্যাঁ, হাইকু। আপনাদের সেই প্রাচীনকালের কবিতার আঙ্গিক।' আমি একটু দ্বিধা নিয়ে কথাটা বললাম। একটু সাহস নিয়ে হাইকুর তিনটি লাইন বলে গেলাম। কথাগুলো রবীন্দ্রনাথের 'জাপান-যাত্রী'-তে পেয়েছি।

পুরোনো পুকুর,
ব্যাঙের লাফ,
জলের শব্দ।

রবীন্দ্রনাথ হৃদয়ের মিতব্যয়িতার কথা বলেছেন। ঠিক জাপানিদের মনের কথা, মনের ভাষা। আকিরা আমার হাতটা চেপে ধরে বললেন: 'রবীন্দ্রনাথ বিশাল ব্যক্তিত্ব। আমি রবীন্দ্রনাথের চিঠি পড়েছি। সে চিঠিগুলো আমাদের জাতীয় কবি উনো নোগুচিকে লেখা। উনি নোগুচিকেও ছেড়ে কথা বলেননি। নোগুচি জাপানের মিলিটারি শাসন এবং চিন আক্রমণকে সমর্থন করেছিলেন।'

'আপনি এতসব জানেন।' আমি অবাক হয়ে বললাম।

'কেন জানব না! আমার গর্ব। রবীন্দ্রনাথ গর্বের মানুষ। সেই চিঠির শেষ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কয়েকটি লাইন আজও মনে আছে। ওটাই ওঁর নোগুচিকে লেখা শেষ চিঠি। 'I wish your countrymen whom I love so much not success but remorse.' অপূর্ব!'

আমি বললাম: 'নেহরু রবীন্দ্রনাথের সত্তর বছরের জন্মদিনে কী বলেছিলেন, জানেন?' বলেছিলেন, 'He has given to our nationalism the outlook of internationalism.'

আকিরা কথাটা শুনে মৃদু হাসলেন, একটি অসাধারণ হাসি।

যখন হিরোশিমা থেকে হোটেলে ফিরে আসছি তখন আকিরা একটি সুন্দর গল্প বললেন, যে গল্পটি তাঁরও শোনা গল্প। সে গল্পটা আমিও জানি। কিন্তু আমি আকিরার মুখ থেকে নতুন করে গল্পটা শুনতে চাইলাম। গল্পটা হল মার্শাল জুকভকে নিয়ে।

> ৩০ এপ্রিল ১৯৪৫ সাল। গভীর রাতে ক্রেমলিন প্রাসাদে একটি টেলিফোন গেল জার্মানির বার্লিনের প্রান্ত থেকে, সেই সীমান্ত থেকে। জুকভ কথা বলতে চাইছেন স্তালিনের সঙ্গে। খুব জরুরি সংবাদ। ক্রেমলিন থেকে জুকভকে জানানো হল যে স্তালিন কৃষ্ণসাগর উপকূলে বেড়াতে গেছেন। স্তালিনের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এত প্রখর ছিল যে উনি বুঝতে পেরেছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হতে চলেছে।
>
> জুকভ কিন্তু থামলেন না। তিনি স্তালিনকে কৃষ্ণসাগর উপকূলে টেলিফোনে ধরলেন। বললেন যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে। স্তালিন ওই গভীর রাতে ঘুম থেকে উঠে জুকভকে টেলিফোনেই বললেন, 'So, the little game is over!'
>
> জুকভ বললেন বাজারে গুজব যে হিটলার আত্মহত্যা করেছে।
>
> তুমি লোকটাকে জ্যান্ত ধরতে পারলে না? ওপাশ থেকে স্তালিনের নিখাদ কণ্ঠস্বর। আরও দু'-চারটে কথা বলার পর মে দিবসের প্রস্তুতি নিতে বললেন স্তালিন জুকভকে। বললেন, 'Think of tomorrow.'

চ্যাপলিনের ছবি 'শোল্ডার আর্মস'-এর শেষ দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। চ্যাপলিন বুদ্ধি খাটিয়ে কাইজারকে গ্রেপ্তার করলেন। সঙ্গে সঙ্গে পর্দায় ভেসে উঠল [illegible] পরিষ্কার সহজ কথা: 'And peace to the world.'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ছবিটি সেখানেই শেষ। এ ছবিটি চ্যাপলিন ১৯১৮ সালে তৈরি করেন। এর সঙ্গে বলতে হয় চ্যাপলিনের আর একটি ছবির কথা সেটি হল 'গ্রেট ডিক্টেটর'। প্রিমিয়ার হয় ১৯৪০ সালে। আর একটি ছবি যেটি ১৯২০ সালের মাঝামাঝি তৈরি, যে ছবিতে চ্যাপলিন মাঝরাতে এক কোটিপতিকে উপদেশ দিচ্ছেন। সে কোটিপতি তখন বিধ্বস্ত, তাঁর তখন মনের অবস্থা উথালপাতাল, হৃদয় ভগ্ন। ঠিক তখনই চ্যাপলিন বলছেন, 'Think of tomorrow. The birds will sing tomorrow.'

বেশ কয়েক বছর বাদে মাঝরাতে এপ্রিল মাসের ৩০ তারিখে ১৯৪৫ সালে জুকভ প্রায় একই কথা শুনলেন। কথাটি বললেন স্তালিন: 'Think of tomorrow—1st of May ...May Day... Red Square!'

রাতে হোটেলে তাড়াতাড়ি খাওয়াদাওয়ার পর্ব শেষ করে হোটেলের রিসেপশন কাউন্টার থেকে একটি টেপ রেকর্ডার জোগাড় করে বারবার ক্যাসেটটা শুনতে লাগলাম। তখন আকিরা হোটেলের অন্য ঘরে। আমি তখন আমার ঘরে একা। শুনতে লাগলাম সেই ইতিহাসের কথা, হিরোশিমার কথা। আকিরা আমাকে আমার ভেতরে ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন। আমি তখন টেপরেকর্ডারে কান পেতে... শুনছি...

কাউকে জানানো হল না। কেউ জানতেই পারল না যে একটি ভয়ংকর ঘটনার প্রস্তুতি চলছে। যে ঘটনা ঘটবে কয়েকদিনের মধ্যে। ব্যাপারটা যাতে কেউ না জানতে পারে, কেউ না-বুঝতে পারে এমন একটি মিথ্যের জাল সৃষ্টি করে আমেরিকার এক উড়োজাহাজ থেকে যুদ্ধবিরোধী প্রচারপত্র আকাশ থেকে ছুড়ে ফেলা হল হিরোশিমার মাটিতে। শুধু হিরোশিমাতেই নয়, আশপাশের শহরগুলোতেও সেই যুদ্ধবিরোধী প্রচারপত্র আকাশ থেকে পড়তে লাগল। গাদা গাদা অসংখ্য প্রচারপত্র একই নাগাড়ে আকাশ থেকে বিলিয়ে দেওয়া হল।

তারপর এল সেই ৬ আগস্ট, ১৯৪৫। সকাল ৮-৩০ মিনিটে মুক্ত রৌদ্রোজ্জ্বল হিরোশিমার আকাশে তিনটে বোমারু উড়োজাহাজ। মুহূর্তের মধ্যে সেই উড়োজাহাজগুলো মিলিয়ে গেল পশ্চিম আকাশে। হারিয়ে গেল, কোনও কিছু আর দেখা গেল না।

হঠাৎই আকাশে তীব্র ধোঁয়া এবং বিকট শব্দ। আকাশটা যেন ভেঙে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পড়ল ঠিক দশ মিনিটের মধ্যে। অগ্নিগোলাতে সমগ্র হিরোশিমা শহরটা লন্ডভন্ড হয়ে গেল। বেড়ে গেল তাপমাত্রা ২০০০ থেকে ৭০০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে। মানুষগুলো জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে গেল। তীব্র উত্তপ্ত হাওয়ায় জ্বলতে লাগল শহরটা। পৃথিবীটা যেন ভেঙেচুরে পড়ল। তারপরেই বৃষ্টি নামল। বিরামহীন বৃষ্টি। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো সব কালো কালো। চারিদিকে এক ভয়ংকর অন্ধকার। নদীর জল আছড়ে পড়ল নদীর পাড়ে। হাজার হাজার মাছ, মাছের পাহাড় ছিটকে ছিটকে পড়ছে নদীর ডাঙায়। এক ভয়ংকর জলোচ্ছ্বাস। সেই ভয়ংকর মারণখেলায় খুব কম মানুষই বেঁচে ছিল। অল্পসংখ্যক যারা বেঁচেছিল তারাও খুব অল্পদিনই জীবনের আলো দেখতে পেয়েছিল। কয়েকদিন বা কয়েকমাসের মধ্যে তাঁরাও মরে গেল। কারও কারও অঙ্গহানি হল, কেউ কেউ ক্যানসারের শিকার হল, কারও মাথার চুল খসে পড়ল, কারও মাথার চুল সাদা হয়ে গেল, কেউ আবার অন্ধ হয়ে গেল, কেউ কেউ আবার দেখতে হয়ে গেল বিশ্রী কুৎসিত বন্যপ্রাণীর মতো, কারও কারও গায়ের চামড়া কুঁকড়ে গেল, কারও কারও আবার চামড়ার রং বদলে গেল। একটি প্রায় তিন মিটার দীর্ঘ, চার টনের বোমা সবকিছু ওলটপালট করে দিল। ঠিক তিনদিন বাদে ৯ আগস্ট, ১৯৪৫ সালে নাগাসাকিতে একই ঘটনা ঘটল। একটি বোমায় সব শেষ করে দিল।...

হঠাৎই মৃদু করাঘাত আমার ঘরের দরজায়। দরজা খুলে দেখি সামনে দাঁড়িয়ে আকিরা। আকিরার ঠোঁটে মৃদু মৃদু হাসি। আকিরার হাতে একটা মোটা বই। একটু লজ্জিত হয়ে আকিরা জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি ক্লান্ত?'

'একদম না। ভেতরে আসুন।' বললাম আমি। আমরা দু'জন অনেকক্ষণ কথা বললাম। সেসব অনেক কথা। রাজনীতি, রণনীতি, সিনেমা আর হিরোশিমার কথা।

আকিরা আমাকে একটি বই উপহার দিলেন। একটি মোটা ভারী বই। হিরোশিমার ওপর সব মনে রাখার মতো ছবি বইটাতে। সম্পাদনা করেছেন আকিরা নিজেই। বইটির নাম 'হিরোশিমা'। আমি শুধু বিস্ময়ের সঙ্গে বইটির পাতা ওলটাচ্ছিলাম।

যখন দ্বিতীয় বি[illegible] শেষ তখন তারা [illegible] লক্ষ লক্ষ মানুষকে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

খুন করল। কেনই বা আণবিক বোমার আঘাত হানা হল। যুদ্ধ হোক বা না-হোক কেউ কোথাও কোনওদিন আণবিক বোমা এভাবে ফেলেছে!

এসব মূল প্রশ্নগুলো আকিরার মনের ভেতর তোলপাড় হচ্ছিল। তবুও তিনি আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করেননি, আমার কাছ থেকে কোনও মন্তব্যও আশা করেননি। তিনি নিজেই এসবের উত্তর দিচ্ছিলেন।

'এটা হল আমেরিকার এক ধরনের হেজেমনি, দাদাগিরি।' আমি চুপ করে আকিরার কথাগুলো শুনছিলাম। আমার বলার কিছু ছিল না। শুধু আকিরার চোখের দিকে তাকিয়েছিলাম।

আকিরা কথাগুলো বলে যেন একটু হালকা হলেন, উঠে দাঁড়ালেন, একটু হেসে বললেন, 'সরি, আপনাকে এতক্ষণ বিব্রত করলাম।' এতক্ষণের আলোচনা হঠাৎই যেন শেষ হয়ে গেল। আকিরা বললেন, 'কাল সকালে প্রথম ফ্লাইটটা ধরতে হবে। আমরা টোকিও যাব।' আকিরা বেরিয়ে গেলেন আমার ঘর থেকে।

আমি আলো নিভিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করলাম। ঘুম এল না। আমার মনে পড়ে গেল আমার ছেলে ও তার ইউনিভার্সিটির বন্ধুদের কথা। একটা সময়ে ওরা যখন কলকাতায় ছিল তখন আমার ছেলের বন্ধুরা নানা আলোচনায় মেতে উঠত। সে আলোচনাতে আমিও থাকতাম। আলোচনা না বলে বলা যেতে পারে নিপাট আড্ডা। বাঙালিদের ষোলো আনা আড্ডা। একদিন ওরা নিউক্লিয়ার বোমা নিয়ে পড়ল। হিরোশিমা নাগাসাকি ম্যানহাটান প্রোজেক্ট, আরও কত কী! আমি দীপঙ্করকে বললাম— দীপঙ্কর ওদেরই একজন, দীপঙ্কর হোম, বোস ইনস্টিটিউটে কাজ করে—বললাম, ও ছোট করে কিছু লিখে দিতে পারে? আমাকে? ই-মেলে? যত তাড়াতাড়ি সম্ভব? আমার খুব দরকার। পরের দিনই লেখাটা পেলাম।

> আপনি যেটা চেয়েছিলেন সেটি পাঠালাম। ফ্যাক্স করলাম। আমি দু' দুটো জায়গা থেকে ব্যাপারটা যাচাই করে নিয়েছি।
>
> ১৯৩৯ সালে যে নিউক্লিয়ার ফিসন আবিষ্কার হয় সেটা আসলে ইউরেনিয়ামের নিউক্লিয়াসে নিউট্রন কণার আঘাতে, নিউক্লিয়াস ভেঙে প্রচুর এনার্জি তৈরি হয়। এবং চেন রি-অ্যাকশনের ফলে, অ্যাটম বোমের ক্ষেত্রে কোটি কোটি অ্যাটম ভেঙে যায় মুহূর্তে উৎপন্ন হয় পাহাড় প্রমাণ এনার্জি। এ পরীক্ষাটা প্রথমে হয় জার্মানিতে, এবং এ পরীক্ষার দরুন একটি ভয়ংকররকম ভীতি তৈরি হয় পৃথিবীর সর্বত্র। হয়তো বিশ্বযুদ্ধের সময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জার্মানি এরকম ভয়ংকর বোমা তৈরি করতে পারে। এই সন্দেহটা আরও বেশি ঘনীভূত হয় যখন ওয়ার্নার হাইসেনবার্গ, জার্মানিতেই থেকে যান যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায়। শুধু তাই নয় হাইসেনবার্গ জার্মান নিউক্লিয়ার এনার্জি প্রোগ্রামের সর্বময় কর্তাব্যক্তি হয়ে দাঁড়ান। ঠিক তখনই বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানীরা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সম্মিলিত হন এবং ম্যানহাটান প্রোজেক্ট তৈরি হয়।

এই ম্যানহাটান প্রোজেক্ট ত্বরান্বিত হয় যখন হাইসেনবার্গ জার্মানি অধিকৃত ডেনমার্কে বেড়াতে আসেন। কথা বলেন ডেনমার্কের বিশিষ্ট পদার্থ বৈজ্ঞানিক নিলস্ বোর-এর সঙ্গে। নিলস্ বোর হাইসেনবার্গ-এর রিসার্চের গুরু ও পথপ্রদর্শক ছিলেন। দু'জনের কী কথা হয়েছিল সে ব্যাপারটা আজও রহস্য। কিন্তু ডেনমার্কের বিজ্ঞানী নিলস্ বোর সন্দেহ করলেন যে সম্ভবত হাইসেনবার্গ জানতেন কী করে আণবিক বোমা তৈরি হয়। স্বভাবতই নিলস্ বোর ডেনমার্ক ছেড়ে পালিয়ে গেলেন, মিত্রশক্তির বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। বললেন যে হাইসেনবার্গ জার্মানিতে আণবিক বোমা তৈরি করতে ব্যস্ত। তিনিই উদ্যোগ নিয়েছেন এসব ব্যাপারে।

উপরন্তু নিজেদের পরিকল্পনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এঁরা সবাই আইনস্টাইনকে বোঝালেন যে আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে এ ব্যাপারে চিঠি লিখে বিশদভাবে জানানো হোক। আণবিক বোমা তৈরি করা সম্ভব এবং সে বোমা এই যুদ্ধে ব্যবহার করা যাবে। সুতরাং প্রেসিডেন্টের অনুমতি চাই। যাইহোক, হিরোশিমাতে যা ঘটল তারপর আইনস্টাইন স্বীকার করেছিলেন, প্রেসিডেন্টকে চিঠি লেখাটা তাঁর বিরাট ভুল।

যদি আইনস্টাইন চিঠিটি না লিখতেন, যদি না হাইসেনবার্গ ও নিলস্ বোর-এর ডেনমার্কে দেখা না হত, তাহলে হয়তো পৃথিবীর ইতিহাস ভিন্ন চেহারা নিত। অন্য খাতে বয়ে যেত ইতিহাসের পাতা।

পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়, জার্মানি আণবিক বোমার ব্যাপারে বেশিদূর এগোতে পারেনি। সম্ভবত নিলস্ বোর আর হাইসেনবার্গ-এর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। ইতিহাস বলে হাইসেনবার্গ নিজেই ততটা সঠিক

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

জানতেন না যে জার্মানরা আণবিক বোমা তৈরি করতে পারবে কি পারবে না। ওঁর উদ্দেশ্য ছিল বোরকে বোঝানো যে মিত্রপক্ষের বিজ্ঞানীদেরও এ ধরনের পরিকল্পনা বন্ধ করা উচিত।

আসল সত্য জানা খুব কঠিন। হয়তো সবটাই ভুল। সবটাই হয়তো পৃথিবীতে মহাপ্রলয় ডেকে এনেছিল। কে জানে কী হয়েছিল, কী হতে পারত। সত্যিই যে কী ঘটেছিল, বলা খুব শক্ত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন প্রায় শেষ, তখন আমেরিকার গোপন প্ল্যানগুলো গোপন জায়গায় লুকনো থাকবে কেন? মিত্রশক্তির দেশগুলোকে কিছু জানানো হল না? তারা অন্ধকারেই রইল। গোপনভাবে আণবিক বোমার শক্তি পরীক্ষা হল সেই নিউ মেক্সিকোতে ঠিক হিরোশিমার ধ্বংসের এগারো দিন আগে। সবকিছুই গোপনে। এমনকী, হিরোশিমার ঘটনা যেদিন ঘটল সে খবরটাও মিত্রশক্তির কাছে বজ্রাঘাত হয়ে দাঁড়াল। এত নাটক কেন?

আকিরা ইওয়াসাকির সেই কথা মনে পড়ল।

আমেরিকার হেজেমনি, মাতব্বরি। আর কী হতে পারে!

পরের দিন অনেক ভোরে আমাদের টোকিওগামী প্লেনটা আকাশে উড়ল ঠিক সময়ে। আমরা যখন হিরোশিমা ছাড়ছি আকিরা তখন আমাকে বললেন, তাকিয়ে দেখুন। আমি কাচের জানলা দিয়ে দেখলাম সেই হিরোশিমাকে আবার।—একটি নতুন হিরোশিমা। এক নতুন ইতিহাস। জাপানের যে-কোনও পরিচ্ছন্ন শহরের সঙ্গে তুলনা করা যায়। উজ্জ্বল রোদে এক ঝকঝকে হিরোশিমা। ভাবাই যায় না।

পরের দিন আকিরা নেই আমার সঙ্গে। তাঁর ডাক্তারের কাছে যাওয়ার কথা। একটি অল্পবয়সি মেয়ে, সুন্দর ইংরেজি বলতে পারে, সে মেয়েটি অর্থাৎ দোভাষী আমার সঙ্গী হল। ওঁর সঙ্গে গেলাম জাতীয় নাট্যশালা মঞ্চে কাবুকি দেখবার জন্য। কাবুকি হল জাপানের জনপ্রিয় ঐতিহ্যশালী নাটকের আঙ্গিক। শ্রুতিমধুর সংগীত, নাটকীয় ইশারা, আর অভিনেতাদের শরীরের ভাষা মুগ্ধ করেছিল এক বিখ্যাত মানুষকে। তিনি হলেন রাশিয়ার বিখ্যাত চলচ্চিত্রনির্মাতা আইজেনস্টাইন। যাঁর লেখা আজও মুগ্ধ করে আমাকে। আইজেনস্টাইন এই কাবুকি নিয়ে, সিনেমার ভাষা নিয়ে অনেক কিছু লিখেছিলেন। শুধু তাই নয় সিনেমার ভাষা ও কাবুকিকে মিলিয়েছেন চিনের হাইরোগ্লিফ-এর সঙ্গে। আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আগেই হোটেলে বসে কাবুকি নিয়ে হোমওয়ার্ক করে অনেক কিছু জেনে গিয়েছিলাম। সুতরাং নারিতা এয়ারপোর্ট ছোঁওয়ার আগেই কাবুকি ছিল আমার দ্বিতীয় পছন্দের স্থান অর্থাৎ হিরোশিমার পরেই। যদিও কাবুকি নাটক ও সংগীত দেখার কোনও পূর্ব-অভিজ্ঞতা ছিল না আমার।

আমি ও আমার সঙ্গী দোভাষী মেয়েটি প্রবেশ করলাম সেই বিশাল অডিটোরিয়ামে। অডিটোরিয়ামটির ঐশ্বর্য তার সহজ গড়নে। বেশিরভাগ দর্শকই প্রবীণ। দর্শকসংখ্যাও নগণ্য। মেয়েটি বলল 'কাবুকি যুবক-যুবতিদের জন্য নয়।'

আমি মেয়েটিকে বললাম, 'তোমার কেমন লাগল?'

'আমি বার তিনেক এসেছি। প্রতিবারই বিদেশি পর্যটক নিয়ে। এটাই আমার কাজ। আজও তাই।'

সেই টানা দু' ঘণ্টা বসে থাকা, কোনও বিশ্রাম নেই। আমি বুঝতে পারলাম আমি আইজেনস্টাইনের ধারে কাছে নেই। যখন লম্বা পনেরো মিনিটের বিশ্রামের ঘণ্টা বাজল তখনই আমি ঠিক করলাম যে আমি হোটেলে ফিরব।

আমাকে একটু অভিনয় করতে হল। দোভাষী মেয়েটিকে বললাম, আমার এক বন্ধুর সঙ্গে মিটিং আছে। এই কাবুকি যে এত বড় আর দীর্ঘ সময়ের অনুষ্ঠান সেটা আমি বুঝতে পারিনি।

'আপনি তা হলে হোটেলে ফিরে যেতে চান?' বলল মেয়েটি।

'হ্যাঁ।'

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি একটি ট্যাক্সি ডাকল। আমাকে হোটেলে নামিয়ে দিয়ে সে চলে গেল কাছাকাছি একটা রেল স্টেশনে। আমি বুঝতে পারলাম যে মেয়েটিও যেন নিষ্কৃতি পেল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

পরের দিন সকালে আকিরার সঙ্গে দেখা। আকিরাকে বেশ তরতাজা দেখাচ্ছিল। 'কীরকম লাগল কাবুকি?' জিজ্ঞেস করলেন আকিরা।

আমি মিথ্যে বললাম না। আমি বললাম অনেক চেষ্টা করেছি মেলাতে, কিন্তু পারলাম না।

আকিরা কিন্তু অবাক হলেন না। শুধু বললেন—'কতক্ষণ ছিলেন? অসুবিধে হয়েছে?' খুব শান্তভাবে বললেন তিনি।

অসুবিধে কেন হবে! সত্যি কথাটাই বলছি। কিন্তু যখন বললাম, আমি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সেখানে দু' ঘণ্টা ছিলাম, আকিরা যেন খুব স্বস্তি পেলেন। আকিরা বললেন যে এক বিশাল ব্যক্তিত্ব, জাঁ লুক গোদার গত বছর আমার মতো কাবুকি দেখতে গিয়ে আধঘণ্টা বাদে বেরিয়ে আসেন নাট্যশালা থেকে। শুধু তাই নয়, গোদার খোলাখুলি একটি মন্তব্য করেছিলেন। আমি অবশ্য তা করব না। কিন্তু এটা ঠিক যে কাবুকি দেখতে গিয়ে আমার অস্বস্তিও কম হয়নি।

আমি যা করেছিলাম, ঠিক তেমনি অডিটোরিয়াম থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন গোদার একইভাবে।

আইজেনস্টাইনের মোটামোটা বই-এ সাহিত্য, শিল্প, সমাজতত্ত্ব, দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি, এমনকী সার্কাসের ব্যাপার-স্যাপার নিয়েও আলোচনা আছে। কিন্তু তাঁর ছবিতে সবসময় যে এগুলো স্থান পেয়েছে, এমন নয়। আইজেনস্টাইন বিংশ শতাব্দীর সবচাইতে বড় নতুন শিল্পধারার চিন্তাবিদ।

১৮৯৮ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং মৃত্যু ১৯৪৮ সালে। অত্যন্ত অল্পবয়সে মাঝরাতে তাঁরই ঘরে একগাদা বইয়ের মাঝখানে চেয়ারে বসে রঙিন ছবি নিয়ে ভাবতে ভাবতে তিনি মারা যান। বেশ কিছু কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

আমার মনে আছে একবার মস্কোতে অনেকক্ষণ সময় কাটিয়েছিলাম তাঁরই ঘরে, তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েছিলাম। সেই ঘরে শুধু ছড়ানো-ছিটোনো বই। তাঁর হাতে আঁকা সুন্দর স্কেচগুলোও ছড়িয়ে ছিটিয়ে। রঙিন ফিল্মও ছড়িয়ে টেবিলের ওপর। সেই নির্জন ঘরে আমি, সঙ্গে আমার বন্ধু নাউম ক্লিম্যান—ওই আর্কাইভের ডিরেক্টর।

মাদাম কাসিকো কাওয়াকিতা আমাকে ওঁর অফিসে আমন্ত্রণ করেছিলেন। ইনি হলেন একজন বিশিষ্ট মহিলা যিনি জাপানি সিনেমা বা জাপানি ছবিকে পৃথিবীর সমস্ত দর্শকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়েছেন।

অনেকক্ষণ ছিলাম মাদামের অফিসে। তাঁর আর্কাইভে, জাপানের টোকিওর লাইব্রেরিতে ছবি দেখবার জন্য। শুধু জাপানের ছবি নয়, আরও কিছু ছবি। মাদাম খুবই আলাপী মহিলা এবং কোনওদিন কোনও ছবির উৎসব অর্থাৎ চলচ্চিত্র উৎসবে যোগ দিতে ছাড়েন না। উনি বললেন, আকিরা কুরোসাওয়ার সঙ্গে কথা বলাতে পারলাম না, কারণ উনি শুটিংয়ে ব্যস্ত।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

পরে অবশ্য মস্কোতে আমি ও আমার স্ত্রী গীতার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয় আকিরা কুরোসাওয়ার। একইসঙ্গে আমরা তিনজনে যাই বাল্টিক সমুদ্রের ধারে একটা স্বাস্থ্যনিবাসে, রেপিনো-তে। ওখানে রুশ চলচ্চিত্রকারেরা আসতেন স্বাস্থ্যোদ্ধার করতে।

পুরনো কয়েকজন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ, ফিল্ম সোসাইটির সদস্য এবং নতুন নতুন মানুষজনের সঙ্গে আলাপ, কিছু ছবি দেখা, প্রদর্শনীতে যাওয়া, জাপানের টোকিওর লাইব্রেরি—এসব ছাড়াও সবচাইতে বেশি আকর্ষণ করেছে হাকোনে ওপেন এয়ার মিউজিয়াম, এক বিশাল খোলা ময়দান। সেখানে রেস্তোরাঁ খুব কম। খাওয়া আর মজা করা দুটো আলাদা জিনিস। আমি নানারকমের কাঁচা মাছ খেলাম কিন্তু মজা পেলাম না। চারিদিকের দৃশ্য দেখার যে আনন্দ, সেটা আমার কাছে তেমন কিছু নয় যতটা মানুষ দেখতে ভাল লাগে। মানুষগুলো কেউই বসে নেই, সব সময়ে ব্যস্ত। কেবলই মানুষ আর মানুষ।

জাপানে থাকার শেষ দিন দেখা হল ডকুমেন্টারি ছবির পরিচালক নোরিয়াকি সুচিমোতো-র সঙ্গে। ইনিও আমার তালিকায় ছিলেন। আমি তাঁর একটি ছবিই দেখেছি যেটা কোনও কাহিনিভিত্তিক ছবি নয়। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার কোনওদিন দেখা হয়নি। ১৯৭২ সালে জেনেভায় একটি ছোট্ট শহরে ছোট্ট চলচ্চিত্র উৎসবে তাঁর ছবিটি আমি দেখি। শহরটির নাম নিয়োঁ। জেনেভার কাছাকাছি শহরটি।

আনন্দের মুহূর্তগুলো বন্ধুদের নিয়ে সুন্দর কাটছিল। বেসিল রাইট যিনি ইংরেজি ডকুমেন্টারি তৈরি করেন তিনিও হলেন বন্ধুদেরই একজন। ছবির বিচারক ছিলেন ছ'জন। আমি ছিলাম বিচারকদের প্রধান অর্থাৎ সভাপতি। সে এক অস্বস্তিকর অবস্থা। আমি সভাপতি! কে কে পরিচালক অতশত জানতাম না। তবুও জেনে নিলাম কিছু কিছু। ছবিগুলি কীরকম। কী ধরনের।

মরিৎস দ্য হ্যাডেল্‌ন নিয়োঁ চলচ্চিত্র উৎসবের পরিচালক, পরবর্তীকালে বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবের প্রধান হয়েছিলেন, তিনি সুচিমোতো-র ছবি সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য জোগাড় করবার অক্লান্ত চেষ্টা করলেন। যদিও বা ছবির প্রিন্ট পাওয়া গেল কিন্তু পরিচালককে পাওয়া গেল না।

এই ছবির মূল বিষয় হল একটা মারণরোগ ছড়িয়ে পড়েছে নদীর ধারে, আর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

নবীন পরিচালক সমস্ত মৎস্যজীবীদের জিজ্ঞেস করছেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যে ব্যাপারটা কী! রহস্যটা কোথায়! কী রোগ এটা!

ছবিটির পরিচালক প্রায় দু' ঘণ্টা বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। ছেলেমেয়ে, বুড়োবুড়ি সবার সঙ্গে। পরিচালক আবিষ্কার করলেন যে, একটি রাসায়নিক কারখানা থেকে কোনও বিষাক্ত বাই প্রোডাক্টস ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয় নদীতে। এটা মালিকপক্ষের জ্ঞাতসারে একধরনের দূষণ, কারণ কারখানাটি নদীর পাড়ে।

ক্যামেরা নিয়ে ফিল্মের দলবল মৎস্যজীবীদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় দিনে রাতে, যেখানে যেখানে তাদের পায়। তাদের বিষণ্ণ স্বর, আক্রান্ত মুখ অনর্গল ধরা পড়ে যেতে থাকে ক্যামেরায়। যেমন ঘটছে তাই তুলে আনছে ক্যামেরা, কোনও কিছু সাজিয়ে গুছিয়ে নয়। পল রোথা-র ভাষায়: 'Dramatization of Actuality.' মালিকপক্ষ এবং মৎস্যজীবী এবং যারা মারা গেছে বিনা চিকিৎসায়, তাদের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে খোলাখুলি বচসা শুরু হয়ে যায়। শুরু হয়ে যায় লড়াই মৎস্যজীবীদের সঙ্গে কারখানার মালিকপক্ষের। অসাধারণ কাজ। মহৎ কীর্তি। কোনওরকম চিত্রনাট্য ছাড়াই ছবিটি তৈরি হয়েছে। এমনই অসামান্য এর সম্পাদনা, গড়ন-গঠন।

এক বৃদ্ধ মৎস্যজীবীকে দিয়ে ছবি শেষ হয়। তিনি নিজেই যেন নিজের সঙ্গে কথা বলে যান। নদীর মাঝখানে মাছ ধরতে ধরতে, নিস্তরঙ্গ জলের ওপর তিনি বলে চলেন নিজের জীবনের কথা, নদীবাহিত জীবনের কথা, চমৎকার সব মাছের কথা, সুস্বাদু রান্নার কথা... কারও বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই। এত তুলকালাম ঘটার পরে এই অনুচ্চারিত ট্রিটমেন্ট আমাদের অবশ করে দেয়, একেবারে ভিতর পর্যন্ত ছুঁয়ে যায়। ছবিটির নাম নদীটির নামেই, অসুখের নামও ওই—'মিনামাতা'।

সেই দোভাষী মেয়েটি যে মেয়েটির সঙ্গে কাবুকি দেখতে গিয়েছিলাম, আমার গাইড ছিল যে মেয়েটি, তার খোঁজ করলাম কারণ আকিরার খবর পাচ্ছিলাম না।

হাসপাতালে আকিরা ভর্তি হবেন। চিকিৎসার প্রয়োজন। তিনি ভাল নেই। এ-খবরটা জানলাম। শেষদিনে বিদেশমন্ত্রক থেকে লোকজন দেখা করতে এল। এটা একটা রুটিনমাফিক কাজ। আমি ওদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানালাম,

দুনিয়ার পাঠক এক হও

আকিরার কথা জিজ্ঞেস করলাম। ওরা বলল এখনও তিনি হাসপাতালে। হাসপাতাল ছুটি দিচ্ছে না। কেন ছুটি দিচ্ছে না? কারণ তিনি ক্যানসারে ভুগছেন।

আমার কোনও উপায় ছিল না তাঁর সঙ্গে দেখা করবার। পরে জানতে পারলাম অন্য একজনের কাছ থেকে যে আকিরার মৃত্যু হয়েছে।

সেই মৃত্যুর খবর দ্বিতীয়বার যাচাই করতে পারলাম না, জানতেও পারলাম না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চতুর্থ অধ্যায়

দেশে ফিরে এলাম। যদি পেছনে তাকাই হিসেব করলে দেখা যাবে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭৯ সাল যেন একটা টাইম মেশিন কাজ করে গেছে, অবশ্যই হিরোশিমার সেই ৬ আগস্ট এবং নাগাসাকির সেই ৯ আগস্ট, ১৯৪৫ সালকে ধরে নিয়ে।

এখন আবার মনে পড়ে সেই সময়ের কথা। সেই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ, সেই ভারতের কথা। সেই ১৪ বা ১৫ আগস্ট দিল্লি থেকে জওহরলাল নেহরু মধ্যরাতে বক্তৃতা দিলেন ভারতের জনসাধারণের উদ্দেশে।

> Long years ago we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. not wholly and in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will wake to life and freedom....

তখন একটা এমন সময়, একটা এমন মুহূর্ত যখন ইতিহাসের পাতায় নতুন যুগের ইতিহাস লেখা হচ্ছে। আনন্দ উত্তেজনা মানুষের মধ্যে, সব মিলেমিশে জাতীয় উৎসব চলছে। একটা দেশ জন্ম নিল, একটা জাতি জন্ম নিল—স্বাধীনতার বিরোধীদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে। সেদিন দিল্লিতে ওই ঐতিহাসিক দিনে মাত্র একজন উপস্থিত ছিলেন না। ঠিক সেই দিনে, সেই রাত্রেই তিনি এই কলকাতা শহরে এলেন সম্ভবত বেশ কয়েকটা দিনের জন্য। মহাত্মা গাঁধী। এমন নয় যে তিনি এইরকম স্বাধীনতার জন্য তিতিবিরক্ত, এই নয় যে তিনি স্বেচ্ছা নির্বাসনে এলেন এখানে। তিনি এখানে এসেছিলেন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে। এ শহরের উন্মাদ উত্তেজিত মানুষগুলোর সম্বিৎ ফেরাতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

১৯৪৬ সালের সেই বিশাল নিধনযজ্ঞ শেষ হলেও হিংস্রতা আবার দানা বাঁধছিল। হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গার রক্ত তখনও শুকিয়ে যায়নি। সেটা পুবদিকেও নয়, পশ্চিমেও নয়। সর্বত্র কেমন একটা ভাব। মহাত্মা ছুটে ছুটে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় শুধু একটু শান্তির জন্য, একটু শুভ বুদ্ধির জন্য।

১৪-১৫ আগস্ট দেশের সাধারণ মানুষ স্বাধীনতা উৎসবে গা ভাসিয়ে দিল। আবার সবাই বেদনাও অনুভব করল যে দেশটা ফালাফালা হয়ে গেল। একদিকে চলছে মানুষের আনন্দে আত্মহারা হয়ে স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করার খেলা, আবার অন্যদিকে চলছে রাগ, দুঃখ, ক্ষোভ, হতাশা, আশ্রয়হীন মানুষের তীব্র গতিতে পূর্ববঙ্গ আর পশ্চিম পঞ্জাবের সীমান্তে নিজের নিজের বাসস্থান খুঁজে নেওয়ার সংগ্রাম, বেঁচে থাকার লড়াই। চলছে কাতারে কাতারে নিরাশ্রয় মানুষের আশ্রয়ের খোঁজ। যে আনন্দ মানুষকে আত্মহারা করে দিয়েছিল, উন্মত্ত করে দিয়েছিল সেটাও বেশিদিন স্থায়ী হল না। ভারতের এপারে ওপারে, ভারতে পাকিস্তানে, কোথাও না। পশ্চিমে সাম্প্রদায়িক বিপদ করাল ছায়ার সৃষ্টি করল, বিশেষত রাজধানী দিল্লিতে এবং পাকিস্তানের কোথাও কোথাও। বাস্তুহারারা এদেশ থেকে ওদেশে, আবার ওদেশ থেকে এদেশে আসতেই লাগল। নিষ্ঠুরতা, খুনখারাপি, লুট, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া, পুড়িয়ে দেওয়া, ধ্বংসের খবর আসতেই লাগল। উন্মত্ত জনতার হিংসা বাড়তেই লাগল এবং চারিদিকে হিংসার দাবানল ছড়িয়ে পড়ল। কেবল হিংসা উন্মাদনার রোমহর্ষক খবর।

মহাত্মা তখন দিল্লিতে ভীষণভাবে নিজেকে অসহায় মনে করছেন। সমস্ত বড় বড় নেতা আমলা সকলের সঙ্গে কথা বলছেন। জানতে চাইছেন কী তখন পরিস্থিতি।

পরিস্থিতি যখন আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে, যখন চারিদিকে চরম বিশৃঙ্খলা, তখনও তিনি স্বভাবসিদ্ধ ধীর শান্ত। তখনও তিনি ধীরে ধীরে বললেন, 'আমি এখন চিনদেশে নেই। আমি দিল্লিতে। আমি আমার চোখ কান কিছুই হারাইনি। তোমরা যদি আমার নিজের দেখা ও শোনার উপলব্ধিকে, আমার বিশ্বাসকে অবিশ্বাস করো, আমি অবশ্যই তোমাদের কিছুই বোঝাতে পারব না, মানাতেও পারব না। তোমরাও আমাকে বোঝাতে পারবে না।' মহাত্মা বুঝলেন যে তাঁর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কাছে আর কোনও রাস্তা নেই, তাঁর সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র অনশন ব্যবহার করা ছাড়া। তিনি প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন, 'আমার অশান্ত মনকে শান্ত করতে হবে নিজেকে কষ্ট দিয়ে, নিজের সংগ্রাম দিয়ে। আশা করি আমি অনশন করলেই ওদের চোখ খুলবে। আসল সত্যকে ওরা জানতে পারবে।'

কয়েকদিনের মধ্যেই সবাই বুঝতে পারল যে আশ্চর্য জাদুমন্ত্রের মতো ঘটনা ঘটছে। কিন্তু অনশন করতে গিয়ে মহাত্মা দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন শারীরিকভাবে এবং সে দুর্বলতা বেড়েই চলছিল। তবুও রোজ তিনি প্রার্থনাসভা চালিয়ে যাচ্ছিলেন প্রতিটি বিকেলবেলায় সন্ধেবেলায়। সেখানে গীতা, কোরান, বাইবেল সবই পাঠ হত। কিন্তু ৩০ জানুয়ারি, ১৯৪৮ তিনি হিংসারই বলি হলেন। স্তব্ধ হয়ে গেলেন চিরকালের জন্য।

আবার পণ্ডিত নেহরুর কণ্ঠস্বর রেডিয়োতে ভেসে উঠল স্বাধীনতালাভের ঠিক পাঁচ মাস বাদে। দুঃখে বিষাদে ভরা সেই কণ্ঠস্বর। '...The light has gone out of our lives and there is darkness everywhere. I do not know what to tell you and how to say it. Our beloved leader, Bapu, as we called him, the Father of the Nation, is no more....'

তবুও মনুষ্য জীবন এবং একটা সরকার চলছিল। মানুষ খাচ্ছে দাচ্ছে, বেঁচে থাকছে, যুদ্ধ করছে, লড়াই করছে, ধ্বংস হচ্ছে, মরছে, আবার বাঁচছেও।

আমার বাবা-মায়েরা তখনও সেই ফরিদপুর শহরে বাস করছে। তাঁরা ভাবতেই পারেননি যে এ-বাসস্থান এ-ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে। যেখানে দীর্ঘদিন বসবাস করার দরুন একটা মায়ার সংসার রয়ে গেল। দেখতে দেখতে কয়েকটা মাস চলে গেল, একটা বছর ঘুরে গেল। রোজই একটা-না-একটা সমস্যা তৈরি হতে লাগল। ক্রমে ক্রমে পরিস্থিতি ও সময় খারাপের দিকে চলে যেতে লাগল। শেষ পর্যন্ত বাড়ি জমি যা যা স্থাবর সম্পত্তি ছিল একদিন জলের দরে সবকিছু বিক্রি করে তাঁরা কলকাতাতে একেবারে বাস্তুহারার মতো এসে হাজির হলেন।

ফরিদপুর শহর থেকে চলে আসার সময় আমার বাবা সেই বাড়ির নতুন মালিককে বললেন, 'একটা ছোট্ট অনুরোধ করছি। আমার ছোট মেয়ে রেবার একটি স্মৃতিসৌধ আছে পুকুরের ধারে। সে আমার পাঁচ বছর বয়সের সবার ছোট মেয়ে, জলে ডুবে মারা যায়। পারলে এ স্মৃতিসৌধকে রক্ষা কোরো।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রেবা আমাদের সব ভাইবোনেদের খুব কাছের ও আদরের বোন ছিল। আমাদের বড় পরিবারে সাত ভাই এবং পাঁচ বোন। আমি ভাইদের মধ্যে ষষ্ঠ আর রেবা বোনেদের মধ্যে সবার ছোট। কেন জানিনা রেবাকে পাড়া-প্রতিবেশী সবাই খুব ভালবাসত। যতটা আমার মনে পড়ে সেই দুর্ঘটনার দিনটি ছিল একটি ছুটির দিন। আমরা তখন দুপুরবেলায় ভাত খাচ্ছিলাম। রেবা সবার আগে খেয়ে উঠে পুকুরঘাটে চলে যায়। তখনও আমাদের খাওয়া শেষ হয়নি।

আমার পরিষ্কার মনে আছে যে আমাদের সেই পুকুরঘাটটি ভারী সুন্দরভাবে তৈরি, ঘাটের সিঁড়িগুলো বাঁশের, পুকুরের জলের দিকে নেমে গেছে। জলের ঠিক কয়েক ইঞ্চি ওপরে সিঁড়ির ধাপগুলো। সেই ধাপগুলো প্রায় পুকুরের নীচের এক-চতুর্থাংশ অংশ পর্যন্ত চলে গিয়েছে।

আমরা সবাই পুকুরের ওখানে বেড়াতে ভালবাসতাম। ওই সিঁড়ির দু'পাশে জলরাশি। আমরা ওই সিঁড়িতে বসে বসে দুটো পা জলের ওপর ঝুলিয়ে রাখতাম। রেবাও আমাদের মতো সেখানে যেত, বসত, পা দুটো ঝুলিয়ে জলের ওপর রেখে পা নাচাত। রেবা একেবারে পুকুরের সামনের ধাপটায় বসত এবং পা ঝুলিয়ে একটু সহজে, একটু আরামে বসে থাকত।

কিন্তু সেদিন ঠিক কী হয়েছিল কী ঘটনা ঘটেছিল, সেটা কেউ জানে না। সেই সময়ে পুকুরপাড়ে কেউই ছিল না। আমরা সবাই ধরে নিয়েছিলাম যে রেবা সেদিন বোধহয় পুকুরের ধারে একদম শেষ প্রান্তে চলে গিয়েছিল। সেখানে বসে পা দুটো ঝুলিয়ে রেখেছিল পুকুরের জলের ওপর। হঠাৎ সে বুঝতে-না-বুঝতেই পা ফসকে জলে পড়ে যায়। আমরা রেবাকে খোঁজাখুজি করছি, রেবা কোথায়, রেবা কোথায়! এ-বাড়ি ও-বাড়ি পাড়া-প্রতিবেশীদের ঘরে ঘরে খোঁজ করে যখন রেবাকে পাওয়া গেল না তখন আমার মেজদা, যে সাঁতার জানত, সঙ্গে সঙ্গে পুকুরে ঝাঁপ দিল। মুহূর্তের মধ্যে রেবাকে পুকুরের জলের তলা থেকে টেনে নিয়ে চলে এল। রেবার শরীরটা তখন ঠান্ডা।

রেবার মৃত্যুর কাহিনি সেই অঞ্চলে পাড়ায় পাড়ায় ছড়িয়ে গেল। পাড়ার সবাই এল কারণ তারা সবাই রেবাকে স্নেহ করত, ভালবাসত। আমার বড় ভাই শৈলেশ আমাদের সবার দাদা যে বড় শহরে থাকত, খবর পেয়ে চলে এল। দাদার সঙ্গে এলেন দাদার প্রাণের বন্ধু কবি জসিমউদ্দিন। রেবা জসিমউদ্দিনের কাছে প্রায় অমূল্য সম্পদের মতো। জসিমউদ্দিন যাঁকে আমরা জসিমদা বলতাম

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তিনি সমস্ত ঘটনা সবার কাছ থেকে শুনে সময় নষ্ট না করে সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলেন সেই ঘাতক পুকুরঘাটে। তিনি সারাটা দিন ওই ঘাটে বসে রইলেন। তাঁকে চা খেতে বলা হল, তিনি খেলেন না। সেই দুপুরবেলা তাঁকে ভাত ডাল তরকারি দেওয়া হল। তিনি সামান্য কিছুও ছুঁয়ে দেখলেন না। প্রায় সন্ধে সন্ধে হয়ে এসেছে তখন জসিমদাকে আমার মা ঘাট থেকে ডেকে পাঠালেন। তারপর নিজেকে নিজেই প্রায় টেনে নিয়ে সেই ঘাটে গেলেন। জসিমদা মাকে জড়িয়ে ধরে শিশুর মতো কেঁদে উঠলেন। আমার মা ও জসিমদা কিছুক্ষণ চুপচাপ ঘাটে বসে রইলেন। তারপর জসিমদা নীরবতা ভেঙে মাকে বললেন রেবার গোপন কথা। অনেক গোপনকথা, যেসব জসিমদাই একমাত্র জানতেন। যেসব কথা জসিমদাকে রেবা বলেছিল প্রায় মাসখানেক আগে।

রেবা জসিমদাকে বলেছিল একদিন সারা রাত জেগে রেবা দেখবে কী করে ভোরের ফুল ফোটে, কীভাবে কখন জলের ছোঁয়ায় ফুলের গায়ে নানান রং লাগে।

পরবর্তীকালে আমার মা রেবা সম্পর্কে অনেক গল্প বলেছিলেন আমাকে।

জসিমদার হৃদয়ের গোপন কোণে অনেক অনেক কবিতা গাঁথা ছিল, অনেক কবিতার লাইনও গাঁথা ছিল, যখন তিনি প্রাইমারি স্কুলের ছাত্র ছিলেন। যখন তাঁর বয়স বাড়ল তখন তিনি একজন বিখ্যাত কবি হলেন, এমনকী রবীন্দ্রনাথের নজরেও পড়লেন। তাঁর একটি বিখ্যাত ধ্রুপদীকাব্যগীতি 'নকশিকাঁথার মাঠ' একটি অসাধারণ গীতিনাট্য। জসিমউদ্দিনের কবিতা ও গান সবই গ্রামের কথা, গ্রামবাংলার কথা। সন্ধে হয়ে যাওয়ার পর জসিমদা পুকুরঘাট থেকে উঠে এসে আমাদের বাড়িতে এলেন। কিছুক্ষণ কাটালেন আমাদের সবার সঙ্গে।

উনি চলে গেলেন নিজের গ্রাম গোবিন্দপুরে যেখানে তাঁর বাবা থাকতেন। এ গ্রামটি আমাদের বাড়ি থেকে চার-পাঁচ মাইল দূরে। যাওয়ার আগে জসিমদা আমার মাকে একটি দীর্ঘ কবিতা দিয়ে গেলেন যেটি তিনি ঘাটে বসে বসে সেদিন অতক্ষণ লিখেছেন। জসিমদা মাকে বলে গেলেন এ-কবিতাটিতে রেবার কথা আছে। এ কবিতাটি কখনই ছাপবেন না। এ কবিতাটি শুধু আপনার জন্য।

আমার মা সযত্নে এ কবিতাটি নিজের হেফাজতে রেখে দিয়েছিলেন বহুবছর, ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত যতদিন মা বেঁচেছিলেন। সযত্নে একটি খামে কবিতাটি রাখা ছিল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

মা যেদিন শ্মশানঘাটে গেলেন সেদিন আগুনের লেলিহান শিখায় মায়ের মৃতদেহর সঙ্গে এ কবিতাটিও পুড়ে ছারখার হয়ে গেল।

বেশ একটা দীর্ঘ সময় কেটে গেল, যে সময়ের কোনও শেষ নেই, কোনও সীমারেখা নেই। ইতিমধ্যে ১৯৯০ সালে সাতচল্লিশ বছর বাদে আমি ও আমার স্ত্রী সেই ফরিদপুর শহরের সেই বাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, বাড়িটাকে দেখলাম। সাতচল্লিশ বছর আগে আমি এ দেশ ছাড়ি। এখন এই আমার নিজের মাতৃভূমি যে দেশে সেই দেশটার নাম বাংলাদেশ। একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র।

এ বাড়িটিতেই আমার শৈশব ও কৈশোর কেটেছে। এই সাতচল্লিশ বছরে এই বাড়িটার মালিকানা একবারই বদলেছে।

আমার বাবার কাছ থেকে যে ভদ্রলোক বাড়িটি কিনেছিলেন তিনি কথা রেখেছিলেন। সেই পুকুরপাড়ে রেবার স্মৃতিসৌধ সযত্নে রক্ষা করেছিলেন। তিনি আবার বাড়িটাকে অন্য একজনকে বিক্রি করে দিয়ে করাচি চলে যান।

সাতচল্লিশ বছর পরে বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবি—আমি আমার সেই দূরের ফেলে আসা অতীতকে একটিবারের জন্যও ভাবিনি, পেছন ফিরে তাকাইনি। একবারও ভাবিনি দেশভাগের কথা। কিন্তু এখন কেন ভাবছি!

যদি তাই হয় তা হলে এখন কেন আমার মন সেকথা বলছে। বিগত পনেরো বছরে এ কথা মনে হয়নি অথচ এই কয়েক বছরে আমি আমন্ত্রিত হয়ে ঢাকায় এসেছি বেশ কয়েকবার। প্রায় আধ ডজনবার আমার নিজের সেই ফেলে আসা বাসভূমিতে যাওয়ার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছি। সে আমন্ত্রণ ছিল ঢাকা থেকে ফরিদপুর। আবার ফরিদপুর থেকে ঢাকা। সত্যি বলতে আমার কাছে এ প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই।

সাতচল্লিশ বছর বাদে নিজেকে প্রশ্ন করি কেন এমন হল, কেন আমি আমন্ত্রণ পেয়েও সেই শৈশবের কৈশোরের বাসভূমিতে গেলাম না তখন ঢাকা থেকে ফরিদপুরে যাওয়ার পথটা ভারী সুন্দর ছিল, পুরো একদিন সময় চলে যেত নদীতে জাহাজে, যে জাহাজে ওপরে নীচে শোয়ার জায়গা থাকত। সেই জাহাজ আসত নারায়ণগঞ্জ থেকে। জাহাজগুলোর নাম ছিল এমু অথবা অস্ট্রিচ এরকম ধরনের। নদী তখন বর্ষায় ভয়ংকর। সে নদী হল পদ্মা। তারপর ছোট্ট ডিঙির মতো নৌকায় চড়ে, ফেরিতে চড়ে, যার নাম ছিল ডামডিম, সরু খালের ভেতর

দুনিয়ার পাঠক এক হও

দিয়ে যেতে হত খালের দু'পাশে ধান আর পাটের খেত শেষ করে সোজা ফরিদপুর।

এখন সেখানে যাতায়াতব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নত। সেখানে মোটরগাড়ি এসে জায়গা করে নিয়েছে। ফরিদপুরের ভেতরটা ভেতরেই রয়েছে। শুধু একটা ফেরি করে পদ্মা নদী পার হয়ে আবার মোটরগাড়ি। অনেক কম সময়ে ফরিদপুর পৌঁছে যাওয়া যায়। ১৯৯০ সালে আমি ও আমার স্ত্রী গীতা যখনই ঢাকা পৌঁছলাম আমরা ঠিক করলাম ফরিদপুর যাব। সেটা যদি কয়েক ঘণ্টার জন্য হয় তাও। আমরা দু'জনে ঢাকায় তিনদিন ছিলাম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে। ঠিক করলাম চারদিনের দিন আমরা ফরিদপুর যাব। আমাদের সঙ্গে ছিল অল্পবয়সি যুবক ক্যামেরাম্যান শশী আনন্দ। শশী আনন্দের বাবা ও মা দেশ বিভাগের পর চলে আসেন এদেশে। যখন তাঁরা এদেশে আসেন তখন তাঁরা বাস্তুহারা। এটা হল পশ্চিম পঞ্জাব থেকে পূর্ব পঞ্জাবে। তখন কিন্তু শশী জন্মায়নি। শশী জন্মেছে ভারতে। এই শহর কলকাতাতে। আমার মতোই সে এখানেই বড় হয়েছে। শশী তাঁর বাবা আর মায়ের মুখে দেশ বিভাগের পর দেশের বাড়ির অনেক ঘটনা, অনেক কাহিনি শুনেছে। সেটা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। তাই সে পূর্ব পাকিস্তানে অধুনা বাংলাদেশে আমার দেশের বাড়ি দেখতে উৎসাহী হল।

সে স্মরণীয় যাত্রা, যে যাত্রা ভোলা খুব কঠিন। আমরা তিন বিদেশি, আমি, আমার স্ত্রী গীতা আর শশী আনন্দ। আমাদের পথপ্রদর্শক ও সঙ্গী খয়ের খাঁ, এক মজার মানুষ।

আমরা যখন সেই ফরিদপুর শহরের কাছাকাছি এসে গেছি তখন আমি খুব উত্তেজিত, উত্তেজনার আগুন পোহাচ্ছি।

'সামনে কী?' যেন অনেকটা পড়া ধরার ভঙ্গিতে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন খয়ের সায়েব।

'কেন, সেই খালটা!' আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বললাম। অবাক করে দেওয়ার জন্য বললাম, 'কেন, সামনেই কাঠের সেই পোল।'

'কাঠের সেই সেতুটা আর নেই। সেখানে এখন কংক্রিটের বাঁধানো সেতু। কাঠের সেতুটা ভেঙে পড়বার আগেই এটা তৈরি হয়েছিল। সেটাও প্রায় বছর পনেরো হয়ে গেল।' খয়ের সাহেবের এই কথার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সেই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

কংক্রিটের সেতুর কাছে এসে পড়লাম। আমাদের গাড়িটা সেতুটি পার হল এবং সোজা বেরিয়ে একটা লম্বা রাস্তায় পড়ল। সাজানো ফিটফাট, সভ্যতার ছোঁয়া লেগেছে এখানে। সেই সময়ে যখন আমি নেহাতই ছোট তখন এই জায়গাটা একটি নিষিদ্ধ পল্লী ছিল। গাড়িটা হঠাৎই একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। আমরা গাড়ি থেকে নামলাম।

যেখানে নামলাম সেখানে উষ্ণ অভ্যর্থনা, প্রশংসা আর ভালবাসা। তারপর ভালমন্দ খাওয়া। একটু বিশ্রাম নিলাম। তারপর পায়ে হেঁটে এগোতে লাগলাম সেই অতীতের খোঁজে। সেই দেশের ফেলে আসা বাড়ির দিকে।

আমার মনের ভেতরে একটার পর একটা স্মৃতি—সেই মনের গোপন কোণে সেসব পুরনো কথা উঁকি মারছিল। প্রায় এক দেড়শো লোক আমাদের পেছন থেকে খেয়াল করছিল। ওরা আমাকে চিনতে পেরেছিল। ওদের কয়েকজন পেছন পেছন এল, আমরা সেই বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়ালাম। প্রতিটি পদক্ষেপেই উত্তেজনা। আমি নিজের সঙ্গে নিজে লড়াই করছিলাম, একটা অনিশ্চয়তা যেন আমাকে চেপে ধরেছিল। সেই স্মৃতির উন্মোচন যেন 'লস্ট হরাইজন'-এর হারিয়ে যাওয়া নায়ক রোনাল্ড কোলম্যান-এর মতো।

আমি সবাইকে কাছে ডেকে বললাম, আমি এখানে আমার নিজের মতো করে পথ চলব, তোমরা কেউ কোনও কথা বলবে না। যদি আমি কখনও ভুল করি পথ চলতে চলতে, তা হলেও নয়। আমি আবিষ্কার করলাম নতুন করে নিজেকে, সাতচল্লিশ বছর বাদে।

সে এক অভিজ্ঞতা। আমি নিজেই সব জায়গা খুঁজে পেলাম সাতচল্লিশ বছর পরেও। কিছু মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আমার দেশের বাড়ির সামনে। কেউ একটি কথাও বলল না। এক অখণ্ড অপূর্ব নীরবতা।

গীতা কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, 'তুমি সব জায়গাগুলো চিনতে পেরেছ! এদেরও চিনতে পেরেছ!' আমি মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। কিছু বললাম না। গীতা আমার হাতটা চেপে ধরল। আমার কান্না পেল। কিন্তু কাঁদতে পারলাম না।

এক ভদ্রলোক পেছন থেকে এসে বললেন এঁরা যাঁরা সামনে দাঁড়িয়ে ওঁরাই এখন এ বাড়িতে থাকেন। ওঁরা নতুন এসেছেন।

এক মাঝবয়সি ভদ্রমহিলা, অতি সাধারণ বাড়ির বউ, একগুচ্ছ ফুল এনে গীতার হাতে দিয়ে হেসে বললেন, 'আপনি শ্বশুরবাড়িতে এসেছেন।' বললেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'আসুন। সেই পুকুর পাড়ে। যাবেন তো?' গীতার তর সইছিল না। ও আমার কাছে রেবার কথা অনেক শুনেছে।

ভদ্রমহিলা বললেন, 'চলুন, রেবাকে মনে পড়বে। দেখবেন, আপনাদের বাবার কথা আমরা রেখেছি। ভাঙচুর একটু-আধটু যা হয়েছে, তাও সারিয়েছি।'

কথাগুলো শুনছি আর আমরা দু'জন—আমি আর গীতা, মুখ চাওয়াচাওয়ি করছি। আমি কী বলতে যাব গীতাকে, আমার গলাটা আটকে গেল।

ভদ্রমহিলা আবার বললেন, 'কী হল? আসুন?'

হঠাৎ মনে পড়ল মহাত্মা গাঁধীর কথা। মহাত্মা! যখন অনশন করা ছাড়া তাঁর কাছে আর কোনও রাস্তা ছিল না, যখন হিংসার দাবানল ছড়িয়ে পড়েছিল দিকে দিকে, তখন যদি তিনি শুনতে পেতেন আজকের এই কথাগুলো! যদি আমি আমার বাবাকে বলতে পারতাম যে তার সেই ছোট্ট রেবার স্মৃতিসৌধ আজও সেই পুকুরঘাটে সুরক্ষিত! যদি আমার মাকে আমি জানিয়ে দিতে পারতাম যে তার মেয়ে রেবা এখনও সেই ঘাতক-পুকুরঘাটে বেঁচে আছে! যে ঘাটে জসিমদা সারা দুপুর, সারা বিকেল, সারা দিনটা কাটিয়েছেন একা! আর শুধুই রেবার কথা ভেবেছেন।

মনে পড়ছে মায়ের সঙ্গে জসিমদার শেষ দেখা কবে। সেও এক ঘটনা। মা তখন খুবই অসুস্থ, শয্যাশায়ী। জসিমদাকে তখন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে হয়েছে সাম্মানিক ডি. লিট উপাধি পাওয়ার জন্য। পরে কয়েকটা দিন কলকাতায় কাটিয়ে যাবেন ঠিক করলেন। রোজই আমার খোঁজ করছিলেন। আমি তখন কলকাতার বাইরে ছিলাম। ফিরে আসতেই আমাকে ডেকে পাঠালেন, বললেন, কতদিন মায়ের সঙ্গে দেখা হয়নি, এবার দেখা না করে ঢাকায় ফিরে যাবেন না। জসিমদাও আমাদের ভাইদের মতো আমাদের মাকে মা বলে ডাকতেন। বললেন, চল, আমাকে এখনই নিয়ে চল, তোর জন্যেই আমি এ ক'দিন বসে আছি। সঙ্গে সঙ্গে আমি মাকে আর আমার সেজদাকে জানিয়ে দিলাম আমরা আসছি। আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই নাকতলায় পৌঁছে গেলাম। বাড়ির দরজার পাশে এসে গাড়িটা যখন গর্জন করে থেমে গেল, মা তখন উঠোনে ছুটে এলেন ডাক্তারের নির্দেশ না মেনেই। সমস্ত শক্তি দিয়ে মা ডেকে উঠলেন: 'জ-সি-ম!' গাড়ির দরজা খুলে ছুটে গেলেন জসিমদা। জড়িয়ে ধরলেন দু'জন দু'জনকে, উঠোনের মাঝখানে, মা আর জসিমদা। দু'জনেই তখন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

কাঁদছেন, শিশুর মতো কাঁদছেন। বারান্দার এক কোণে বসে আমি দেখছিলাম। দেখছিলাম ইতিহাস। একটা মুখ ভেসে উঠল, আমার সামনে এসে দাঁড়াল। ঋত্বিক। ঋত্বিক ঘটক। মৃত মানুষটা আমার সামনে। মৃত, কিন্তু কয়েকটা ছবি এখনও ভীষণভাবে জেগে রয়েছে, দেশ হারানোর বেদনা ছবিগুলোতে।

এই প্রসঙ্গে চট করে বলে নিই বাবার সঙ্গে আমার অদ্ভুত বোঝাপড়ার কথা। কখনও সম্মানার্থে তাঁকে আমি সম্ভ্রমসূচক বর্ণনায় রাখছি, আবার কখনও অন্তরঙ্গতায় বন্ধুদের মতো করেই বলছি তার কথা। কখনও 'তিনি' বলেছি, কখনও বা 'তুমি'।

'সময় বদলেছে, আমিও বদলে গিয়েছি।' এটা আমার বাবার কথা। ১৯৪৮ সালে ঠিক দেশ বিভাগের এক বছর বাদে এই কথাটি বলেছিলেন আমাকে আর আমার বন্ধুদের। সলিল চৌধুরী, ঋত্বিক ঘটক, তাপস সেন, কলিম সরাফি এবং আমাদের সকল বন্ধুর বন্ধু নৃপেন গঙ্গোপাধ্যায়কে। ওরা আমাদের পার্ক সার্কাসের বাড়িতে প্রায় রোজই আসত। চারটে ঘরের মধ্যে সবচাইতে ছোট ঘরটায় যেটায় আমি থাকতাম সে ঘরটায় আরামের সঙ্গে, মজার সঙ্গে আড্ডা চলত। আমার মা চায়ের পর চা পাঠিয়ে দিত আর বাবা হঠাৎ হঠাৎ ঘরে ঢুকে পড়ত আমাদের না জানিয়ে। এসে এসে আমাদের গল্পগুজব আড্ডা শুনত। তখন আমরা হয়তো আমাদের যৌবনের উন্মাদনা নিয়ে আলোচনায় মগ্ন। কেউ থিয়েটার নিয়ে, কেউ সিনেমা নিয়ে। আরও অনেক কিছু নিয়ে।

বাবা আড্ডা পছন্দ করত, ভালবাসত, কিন্তু তাঁর উপস্থিতিতে আমাদের অসুবিধে হত। 'আমাকে তোমরা বাস্তুহারা ভেব না। আমি তোমাদেরই একজন।' বাবা সবসময় বলত 'আমি কিংবা আমার স্ত্রী কেউই দুঃখ পাই না তোমরা আমাদের সম্পর্কে যাই ভাব না কেন। আমরা বাস্তুহারা নই, আমরা রিফিউজি নই।'

আমার বাবা সাহসী মানুষ ছিল। সাধারণভাবে মৃত্যু সম্পর্কে তার কোনও ভাবলেশই ছিল না। এসব নিয়ে ভাবতই না। বাবা চলে যায় এ পৃথিবী ছেড়ে ১৯৫৪ সালে।

'দৈনিক যুগান্তর' পত্রিকার খ্যাতনামা সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় আমার বাবার মৃত্যুর পর বাবাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সম্পাদকীয়তে গুরুত্ব দিয়ে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

লিখলেন। সে সময় এ পত্রিকাটি বহুল প্রচারিত ছিল। এটাই আমার বাবার জীবনের অন্তিম কাহিনি।

আমরা বন্ধুরা বা আমাদের দলটা শুধু পাঁচজনের নয়। আরও অনেকেই ছিল তখন। নিজের নিজের স্বপ্ন নিয়ে আমরা চলছি, আমাদের আড্ডাও চলছে সমানে, একটা ছোট্ট চায়ের দোকানে। দোকানটার নাম ছিল 'প্যারাডাইস কাফে।' ওই দোকানটার যিনি মালিক ছিলেন তিনি ঘোড়ার রেস খেলায় এত ব্যস্ত থাকতেন যে দোকানটিতে তিনি নজরই দিতে পারতেন না। আমাদের বুঝতে পেরে ভদ্রলোক দোকানটি আমাদের দায়িত্বে চাপিয়ে দিয়ে চলে যেতেন।

আমরা চা কম খেতাম কারণ চা খেতে গেলে পয়সা লাগে। কিন্তু চুটিয়ে আড্ডা মারতাম যে আড্ডাতে কোনও খরচ নেই। যে আড্ডা চলত একনাগাড়ে পাঁচ ঘণ্টা ছ' ঘণ্টা।

একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়। নিউ থিয়েটার্স স্টুডিয়োতে চাকরি করত। আর বাদবাকি আমরা সবাই বেকার। আমাদের বাস্তবিক পক্ষে কোনও কাজই ছিল না। শুধু আমরা আমাদের স্বপ্ন নিয়ে নাড়াচাড়া করতাম।

একদিন আমি অনেক খোঁজাখুঁজি করে আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টির একটি পত্রিকার প্রায় দুর্লভ সংস্করণটি জোগাড় করলাম। পত্রিকাটির নাম 'মাসেস অ্যান্ড মেইনস্ট্রিম'। আমি পেয়েছিলাম একেবারে নতুন এবং টাটকা এক সংস্করণ। এই সংস্করণে পাবলো নেরুদার একটি দীর্ঘ কবিতা ছিল। নাম 'দ্য ফিউজিটিভ', লেখা আমেরিকার কোনও একটি জায়গা থেকে—'ফ্রম সামহোয়্যার ইন আমেরিকা'স।' কোনও শহরের নাম ছিল না, উত্তর না দক্ষিণ আমেরিকা সেটাও গোপন রাখা হয়েছিল। কারণ, চিলি-র এই কবিকে সবসময় স্বেচ্ছা নির্বাসনে থাকতে হত, শাসকদের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য। অথচ এর আগে চিলির-ই রাষ্ট্রদূত হিসাবে ঘুরে বেড়িয়েছেন এদেশ-ওদেশ। পরে আবার নোবেল পুরস্কারও পান। আশ্চর্য জীবন! এটা পেয়ে আমি সময় নষ্ট না করে প্যারাডাইস কাফেতে ছুটে গেলাম, সেখানে তখনও জমজমাট আড্ডা। আমার মুখ থেকে পত্রিকা আর পাবলো নেরুদার কথা শুনে সকলে হইহই করে উঠল। কবিতাপাঠ আমার একেবারেই আসে না, তবু কবিতাটা পাঠ করবার লোভ সামলাতে পারলাম না। এক গেলাস জল খেয়ে, গলাটা ঝেড়ে নিয়ে ধীরে ধীরে পড়তে শুরু করলাম।

দীর্ঘ প্রায় আট থেকে দশ পাতা। যখন আমি কবিতাটি পড়ছি তখন সবাই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমাকে ঘিরে মনোযোগ দিয়ে শুনছে। উৎফুল্ল হয়ে শুনছে। এই কবিতাটিতে একটি লাইন আছে যে গরমে তৃষ্ণার্ত হয়ে 'ফিউজিটিভ' এলোমেলো ভাবে ঘুরতে ঘুরতে অনেকক্ষণ বাদে একটা দোকানে গিয়ে এক বোতল 'কোকাকোলা' কিনে খেল।

কোকাকোলা! বন্ধুরা সব হইহই করে উঠল। বলল—হতেই পারে না। তখন এমন একটা সময়, যখন ম্যাকার্থি সদলবলে সর্বত্র চষে ফেলছে কমিউনিস্টদের ধরবার জন্য, ঠিক যেভাবে ফাঁদ পেতে শিকার ধরে। এমনকী চ্যাপলিনও ছাড়া পেলেন না, তাঁর বিরুদ্ধে বিশাল রিপোর্ট তৈরি করল এফ বি আই, নানাভাবে তাঁকে হেনস্তার চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগল। এ কোনও সভ্য দেশে ঘটে না, সারা পৃথিবী তোলপাড় হল, প্রতিবাদ আসতে লাগল প্রতিটি কোণ থেকে। এই পরিস্থিতিতে কেউই চুপ করে থাকতে পারে না, এদেশেও পারেনি, কমিউনিস্টরা তো নয়ই। তার ওপর তারা যদি কট্টর হয়। সেই কট্টর কমিউনিস্টরাই আমেরিকান পানীয়কে বয়কটের ডাক দিল, গলা মেলাল নরমপন্থীরাও। আমিও ভিড়ে গেলাম, যদিও আমি কখনওই কমিউনিস্ট পার্টির কার্ড-হোল্ডার ছিলাম না। এই যখন অবস্থা, কোকাকোলাকে দূরে ঠেলা ছাড়া আমাদের আর কোনও রাস্তা ছিল না। অথচ পাবলো নেরুদার মতো মানুষ যখন তেষ্টায় এক ঢোক কোকাকোলা খেয়ে গলা ভিজিয়ে নিলেন, আমরা, প্যারাডাইস কাফে-র দলবল, ভারী মুশকিলে পড়ে গেলাম। আর কোকাকোলাকে বর্জন করার পথ রইল না। নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলেও নেরুদার পছন্দের এই পানীয়টি দিয়ে গলা ভেজানোর কোনও সুযোগ কিন্তু আমরা পেলাম না। কোকাকোলা কিনব, খাব, গলা ভেজাব... কিন্তু পয়সা কোথায়!

এরকম অনেক গল্প আমার স্মৃতিতে আজও রয়েছে।

এ-সব কাহিনি বা গল্প গীতাও জানত। আমি গীতাকে সবই বলেছিলাম। গীতাও তখন এসব ঘটনা বা গল্পের ভেতরে ঢুকতে শুরু করেছে, বুঝতে চেষ্টা করছে। মজাও পাচ্ছে।

একদিন একটা বই গীতাকে উপহার দিলাম। আমার ভালবাসার প্রথম চিহ্ন। এ বইটার লেখক জুলিয়াস ফুচিক। চেকোস্লোভাকিয়ার রাজনৈতিক কর্মী। হিটলারের নাৎসিবাহিনী এঁকে গ্রেপ্তার করে। মারাত্মক অত্যাচার হয় তাঁর ওপর। তাঁকে পাঠানো হয় কনসেনট্রেশন ক্যাম্প-এ।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

একদিন এঁকে সেই ক্যাম্পের জেলে হিটলারের ঘাতকরা অমানুষিকভাবে মেরে, জানোয়ারের মতো হাত পা ভেঙে ফেলে রেখে দিয়ে চলে যায়। তখন তাঁর জ্ঞান নেই, কিছুই নেই। নিয়মমাফিক ডাক্তার এল শুধু ডেথ সার্টিফিকেট দিতে কিন্তু পরীক্ষা করে বিরক্ত হয়ে জেলখানার নোটবুকে একটি ছোট নোট দিয়ে চলে গেল। নোটটা হল এ লোকটার শরীরের গঠনতন্ত্র মানুষের নয়, ঘোড়ার। ফুচিক আশ্চর্যভাবে বেঁচে যান। মরলেন না। পরবর্তীকালে সুস্থ হয়ে এই বইটি লেখেন। ফুচিকের ডায়েরি। এটা লেখেন অতীব গোপনে জেলের ভেতরে। ডায়েরিটা নাৎসিবাহিনীর এক প্রহরী চুরি করে ছাপতে দেয় এক প্রকাশককে। ডায়েরিটা প্রথমে চেক ভাষাতে ছাপা হয়। খুব তাড়াতাড়ি বিভিন্ন ভাষায় ছেপে সমগ্র পৃথিবীতে বইটা প্রকাশ পায়। বইটির নাম 'নোটস ফ্রম দ্য গ্যালোজ।' বাংলায় অনুবাদ হয়ে বইটির নাম হয় 'ফাঁসির মঞ্চ থেকে।'

গীতা ছিল কলকাতা থেকে কুড়ি কিলোমিটার দূরে। উত্তরপাড়ার মেয়ে। যখন আমি গীতাকে প্রথম দেখি ভিড়ের মধ্যে, আমি ওর চোখের সুন্দর একটি চাউনিতে মুগ্ধ হয়ে যাই। অসাধারণ। সেই লজ্জাজড়ানো চোখের দৃষ্টি, অথচ কী সুন্দর অভিব্যক্তি। একই চোখের চাউনি, একইরকম অভিব্যক্তি পেয়েছিলাম অনেক পরে আরও একজনের মধ্যে—স্মিতা পাতিল!

কলকাতার ঠাসা ভিড়ের মধ্যেই বারবার গীতার সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে, বারবার সেই ভিড়ের মধ্যে কতবার কথাও হয়েছে। ভিড়ের মধ্যেই আবিষ্কার করলাম আমরা দু'জনেই দু'জনকে ভালবেসে ফেলেছি। যাইহোক, সাত বছর বাদে আমরা বিয়ে করলাম। মনে পড়ে বিলি ওয়াইলডার-এর সুন্দর ছবি। আমার এক বন্ধু আমাদের বলতেন 'সেভেন ইয়ার ইচ।'

আমার পরিষ্কার মনে আছে একটি ঘটনা, যে ঘটনা মনে রাখাটাও যথেষ্ট মূল্যবান। সেটা হল একদিন সন্ধেবেলা আমরা আবিষ্কার করলাম যে আমাদের ভবিষ্যৎটা আমাদেরই হাতে, ভবিষ্যৎ আমরাই গড়ব।

সে সময় আমরা দু'জনে ভিড় এড়িয়ে চলতাম। একদিন একটা ঘটনা ঘটল। কলকাতায় এসে গীতা পিসিমার বাড়িতে সপ্তাহ দুয়েক থাকবে কথা ছিল। একটি থিয়েটার গ্রুপে নাটকের মহড়া দেওয়ার জন্য ওকে এখানে থাকতে হয়। নাটকে গীতার ছিল প্রধান চরিত্র। কথা ছিল যে আমি হাওড়া স্টেশন থেকে একটি লোকাল ট্রেন ধরে সোজা উত্তরপাড়ার বাড়ি থেকে ওকে নিয়ে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কলকাতায় পিসিমার কাছে পৌঁছে দেব। সবকিছুই ঠিকঠিক চলছিল। আমিও ঠিক সময়মতো হাওড়া স্টেশনে চলে এলাম। ট্রেনে ওঠার আগে হুইলার-এর স্টল থেকে একটা পেঙ্গুইন-এর বই কিনলাম। তখন পেঙ্গুইন-এর বই খুব সস্তা ছিল। বইটার নাম 'আ কেস ফর কমিউনিজম'। লেখকের নাম গ্যালাচার। উনি হাউজ অব কমন্স-এর একমাত্র কমিউনিস্ট সদস্য ছিলেন। দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বইটায় চোখ বোলাচ্ছিলাম। আমার হাতঘড়িতে দেখলাম সময়টা। ছুটে উঠলাম চলন্ত ট্রেনে। সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম ভুল ট্রেনে উঠেছি যেটি লুপ লাইন ধরে চলছে। বলাবাহুল্য মেইন লাইন দিয়ে ট্রেনটা চলছে না। আমি সঙ্গে সঙ্গে পরের স্টেশনে নেমে অন্য ট্রেন ধরে অর্থাৎ মেইন লাইন ধরে চলতে শুরু করলাম। যখন গীতার উত্তরপাড়ার বাড়িতে পৌঁছলাম তখন দেরি হয়ে গিয়েছে। সূর্য তখন ধীরে ধীরে পশ্চিম আকাশে ডুবে যাচ্ছে। গীতাকে সঙ্গে নিয়ে ফেরবার সময় তাড়াতাড়ি আসবার জন্য গঙ্গা পার হয়ে এলাম। ঠিক করলাম গঙ্গার ওপর যে ব্রিজটা আছে সে ব্রিজটা হেঁটে পার হব। ব্রিজের ওই প্রান্ত থেকে বাস ধরে কলকাতায় চলে আসব। সূর্যাস্তের অপূর্ব দৃশ্য সেটাও গঙ্গার ওপর ব্রিজের ওপর হাঁটতে হাঁটতে উপভোগ করার লোভ সামলাতে পারলাম না।

হাঁটতে হাঁটতে ব্রিজের মাঝখানে এলাম আমরা। একটু থামলাম ব্রিজের রেলিংটার কাছে। দূরের দৃশ্য দেখলাম, নীচের দিকে গঙ্গাবক্ষে চোখ মেললাম। গঙ্গার স্রোত বইছে আর ছোট ছোট ঢেউগুলো ব্রিজের বড় বড় পিলারগুলোর ওপর আছড়ে পড়ছে জলের ধাক্কা খাওয়ায় ছলাৎ ছলাৎ সুন্দর শব্দ কানে আসছে। মৃদুমন্দ বাতাস বইছে, কোনওদিকে কোনও ফিসফিস শব্দও নেই। চারিদিকে শান্ত নীরবতা বিরাজ করছে। এ নীরবতাকে অনুভব করার লোভ সামলানো যায় না।

সুন্দর মুহূর্তগুলো চলে যাচ্ছে। তখনই সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা ঘটল। আমি এই প্রথম গীতার হাতদুটো দু'হাত দিয়ে ধরতে গেলাম। এর আগে আমরা কখনও ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করিনি, কিন্তু সেদিন আমি গীতার হাত ধরে ওকে চুমু খাওয়ার চেষ্টা করলাম। প্রচণ্ড নার্ভাস ছিলাম, ঠোঁটটা গিয়ে পড়ল ওর নাকের উপর, আর আমার হাতটাত কেঁপে 'আ কেস ফর কমিউনিজম' বইটা সেই অসতর্ক মুহূর্তে হাত ফসকে গঙ্গার জলে গিয়ে পড়ল। আমার প্রথম চুম্বনের সঙ্গে কমিউনিজমের সপক্ষে গ্যালাচারের যুক্তিজাল গঙ্গায় ভেসে গেল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আমার বাবার সঙ্গে গীতার একটা সুন্দর সম্পর্ক ছিল। বাবা গীতাকে পছন্দ করত বেশ কতকগুলো কারণে। গীতার যুক্তিবাদী মানসিকতা, গীতার গল্প বলার সুন্দর সপ্রতিভ ভঙ্গি, গীতার কবিতা পড়ার ভঙ্গি ও উচ্চারণ। এতগুলো মহৎ কারণের জন্য গীতাকে খুবই পছন্দ করত। বাবা গীতাকে কল্যাণী নামে ডাকত। বাবার নিজের পছন্দের নাম। এসব ঘটনা আমাদের বিয়ের আগে। একদিন বাবা কোনও একটি বিশেষ দিনে গীতাকে নিজের কাছে ডেকে পাঠাল একান্ত ব্যক্তিগত কারণে। গীতাকে তার জীবনের কিছু গোপন কথা বলল। সে গোপনকথা বা কাহিনি হল বাবা তার যৌবনে বাবার বিধবা অল্পবয়সি কাকিমাকে ভালবাসতেন। যে কাকিমা বাবার চাইতে বয়সে ছোট ছিলেন। ভারী মিষ্টি দেখতে ছিল বাবার কাকিমা। কাকিমা খুব অল্প বয়সে বিধবা হন। কিন্তু সেই সময়ে সামাজিক বিধিনিষেধের জন্য সে ভালবাসাটা দানা বাঁধে না, কোনও রূপ নেয় না। তবুও বাবা গীতার কাছে স্বীকার করেছিল যে সেই ভদ্রমহিলাকে বাবা ভোলেনি। গীতাকে বলেছিল একথা তুমি কাউকে বলবে না। এমনকী জানতেও দেবে না। 'Not to tell her, never to let her know.'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল এই ইংরেজি বাক্যটা কার লেখা জানো কি?

গীতা কথাটা বুঝতে পারল না। বাবা বলল, এটা 'এনক আর্ডেন' কবিতার একটি লাইন। কবি টেনিসনের একটি অসামান্য সৃষ্টি। তারপর বলল এনকের গল্পকথা। বাবা টেনিসনকে ভালবাসত এবং এ লাইনটাকেও। 'Not to tell her, never to let her know.'

এ ঘটনা আমাদের বিয়ের এক বছর আগের ঘটনা। গীতা এ-কথা গোপন রেখেছিল। বাবার মৃত্যুর পর গীতা এ-কথা আমাকে বলেছিল। বাবার একান্ত গোপন ভালবাসার কথা, লুকিয়ে লুকিয়ে চুপিচুপি ভালবাসার কথা।

বাবা খুব আশা করেছিল গীতাকে মঞ্চে একবার দেখবে, গীতার অভিনয় দেখবে। সে সুযোগ বাবার আর আসেনি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পঞ্চম অধ্যায়

এসব লিখছি আলসেমিতে গা এলিয়ে দিয়ে, অক্ষরগুলো লিখছি যেসব অক্ষর লেখার কোনও মানে হয় না। অল্প জেনে বা অর্ধভাগ জেনে কোনও ভাবনা নিয়ে উথাল-পাথাল সেসব ভাবনা আমার ডায়েরির পাতাতে অসংখ্য জট পাকিয়েছে। আমি শুরু করলাম ছোট ছোট ব্যক্তিগত কথা দিয়ে, আবার কোনও বিশেষ প্রয়োজনীয় জাতীয় ব্যাপার নিয়ে, এমনকী আন্তর্জাতিক স্তরে দেশে বিদেশের নানারকম ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে। সেই পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় আমার জট-পাকানো সেসব কথাতেই ডায়েরির পাতা ভরে উঠল।

১৯৫০ সাল। সোভিয়েত চিত্রপরিচালক সেভলোড পুডভকিন-এর কলকাতা সফর। সঙ্গে যশস্বী অভিনেতা নিকোলাই চেরকাসভ। সফরসূচি এক সপ্তাহ। এক ব্যস্ত সপ্তাহকাল।

১৯৫১ সাল। 'চার্লি চ্যাপলিন।' আমার লেখা একটা বই। তখনও চ্যাপলিন ছবি বানিয়ে চলেছেন। প্রকাশক নতুন। তেমন কোনও আশা-জাগানো ব্যাপার নয়।

সেই বছরেই কলকাতার নানা প্রান্তে উপকণ্ঠে লোকেশন ঢুঁড়ে বেড়াতে ফরাসি চিত্রপরিচালক জঁ রেনোয়ার এ দেশে আসা। সঙ্গে ক্লদ রেনোয়া, ক্যামেরাম্যান, জঁ রেনোয়ার ভ্রাতুষ্পুত্র। ছবির নাম 'দ্য রিভার'।

১০ মার্চ, ১৯৫৩ সাল। আমাদের বিয়ে। আমার পকেট খালি, গীতাও কপর্দকশূন্য। তথাপি বেপরোয়া দুজনেই।

২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪ সাল। বাবার মৃত্যু। একমাস পরে, ২১ অক্টোবর, আমাদের প্রথম ও একমাত্র সন্তান কুণাল-এর জন্ম।

১৯৫২ সালে, কুণালের জন্মের দু'বছর আগে, কলকাতা শহরে এবং

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আরও তিনটি জাতীয় কেন্দ্রে এক বিশাল অনুষ্ঠান। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। দিল্লি কলকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ। সংগঠনে কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের উদ্যোগ ও তত্ত্বাবধান।

অসাধারণ সব ছবি। বাছাই করা ছবি। শুধু কি সাম্প্রতিক দু-তিন বছরেরই ছবি, না, আগেকারও? অতশত নিয়ে মাথা ঘামাননি বাছাইকারীরা। কোনও প্রতিযোগিতা নয়, কোনও ইঁদুর দৌড় নয়, দর্শকদের শ্রেণিবিন্যাস বাছবিচার কিছুই নয়, ছিল উন্মুক্ত উৎসব আর ব্যতিক্রমী ছবির মেলা।

ব্যতিক্রমী ছবি, রকমারি ছবি। বিচিত্র ভাবনা, রকমারি গড়ন। বিচিত্র দর্শক, বিচিত্র রুচি। ধরা যাক ইতালির নিওরিয়ালিজম। রবার্তো রোসিলিনির কথা আমরা সবাই শুনেছি, পড়েছি, ছবিও বা দু-একটা দেখেছি। ভিত্তোরিও ডি সিকার বেলাতেও তাই। কিন্তু জাভাত্তিনির কথা! নিওরিয়ালিজম-এর ব্যাখ্যাতার কথা! তখন আমরা কজনই-বা শুনেছি জাভাত্তিনির সেই আশ্চর্য সুন্দর ভাষ্য: 'একজনের প্রশ্ন: নিওরিয়ালিজম বস্তুটি কী?' জাভাত্তিনির জবাব: 'We make things spectacular not by the *exceptional* qualities but by the *natural* qualities.'

প্রশ্নকর্তা আমেরিকান। প্রযোজক বললেন, 'ধরুন, একটা উড়োজাহাজ দেখাতে হচ্ছে। উড়ছে। তখন মেশিনগান থেকে একটা গোলা ছুটে গেল। কেমন হবে? জমবে না?'

জাভাত্তিনি বললেন, 'অতটা আমরা যাব না। উড়ুক না উড়ছে যখন। একবার নয়, তিনবার নয়, অসম্ভব না হলে কুড়িবার। হ্যাঁ, ঠিকই, গুলি খেয়ে ভেঙে পড়াটা বাস্তব। ব্যতিক্রম—এক্সেপশন। সব সময় তো ঘটে না। ওড়াটাই স্বাভাবিক— ন্যাচারাল। নিওরিয়ালিজম যে বানিয়ে বানিয়ে গল্পকথা বলে না এটাই বড় কথা।'

অন্যান্য অসাধারণ ছবিও উৎসবে দেখানো হয়েছিল। আকিরা কুরোসাওয়ার কথাই সবার আগে বলতে হয়। দেখার আর বোঝার শেষ নেই। আর জাক তাতি! তিনিও বড় কম যান না। স্ল্যাপস্টিক কমেডির এক চূড়ান্ত খেলোয়াড়। চ্যাপলিনের পরেই যাঁর নাম। এবং ম্যাক্সলিন্ডারের মন্ত্রশিষ্য। উৎসবের সেদিন আমরা কেউই ভুলতে পারিনি, পারব না তাতির সেই ছবি— *Jour de Fête*। বাংলায়, 'উৎসবের দিন'। কিন্তু একটা কথা। ভারতীয় জীবনযাত্রার বিচারে আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অন্তত জোর গলায় বলব: বাহান্ন সালের শাশ্বত ছবির ভিড়েও ওই ইতালিয়ান নিওরিয়ালিজম হয়ে থাকবে চিরকালীন। শক্ত মাটির ওপর গ্রথিত।

ফিল্ম সোসাইটি গড়ে উঠল ১৯৪৮ সালে, বাহান্ন সালের চার বছর আগে। সত্যজিৎ রায় ও চিদানন্দ দাশগুপ্ত দু'চার বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে তৈরি করলেন ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি। শুধু সভ্যরাই কার্ডের অধিকার নিয়ে ছবি দেখছেন। চেনাজানা থাকলে দু-চার-দশ-বিশ জন গেস্টকেও ঢুকিয়ে দেওয়া সম্ভব। আমি ওই গেস্ট হয়েই ছবি দেখতাম এবং আমার মতো আরও দু-চার জন। পয়সা কড়ি তেমন না-থাকাতে কার্ডহোল্ডার হতে পারিনি। বাহান্ন সালে আর্থিক অবস্থা কিছুটা সামলে নিতে পেরেছি বলেই উৎসবের সাত-সাতটা দিন তিনটে করে ছবি দেখতাম সবাই। সে এক দারুণ সময়। আর সেসব তো যেমন তেমন ছবি নয়।

উৎসব শেষ হল, কিন্তু উৎসবের মুখরতা ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র। অনেকেই এখন ছবি নিয়ে মেতে উঠেছে। শুধু ছবি দেখা নয়, ছবি করাও। স্টুডিয়োতে যাঁরা এতকাল ছবি বানিয়ে চলেছেন তাঁরা ব্যাপারটাকে বড় একটা আমল দিচ্ছেন না। এত শোরগোল তোলার কারণ তাঁরা খুঁজে পাচ্ছেন না। সেকালে বড় মাপের কাজ হয়নি এমন নয়। হয়েছে একালেও। এতকাল যে তাঁরা যন্ত্রপাতি নিয়ে শুধু খেলাখেলা খেলেই গিয়েছেন তা তো নয়। তবে?

তবে কী? বিষয়টা তর্কের নয়, বোধের। তাই সহজ নয়, ব্যাপারটাকে সহজ করে বোঝানো। বুঝেছিলেন সত্যজিৎ রায়, সহযোগিতায় তাঁর গোনাগুনতি দু'-চারজন বন্ধুও। যাঁদের মধ্যে প্রধান সুব্রত মিত্র আর বংশী চন্দ্রগুপ্ত। তাঁরা স্থিরপ্রতিজ্ঞ যে ছবি তাঁদের করতেই হবে। 'পথের পাঁচালী' তাঁরা করবেনই।

আর আমরা? প্যারাডাইস কাফে-র দল? অনেক অনেকটা পথ এগিয়েও হয়তো শেষপর্যন্ত পৌঁছুতে পারব না। তারই সঙ্গে ভয়ংকর অর্থাভাব। রুজিরোজগারের জন্য অন্য কিছু কি দেখব? সিনেমার সব ছেড়েছুড়ে? সে এক ভয়ংকর দিন। ১৯৫১।

সে এক ঘটনা! তখন কেউই আমরা বিয়ে করিনি। এক হৃষীকেশ ছাড়া। বিয়ে হওয়া না হওয়াটা হৃষীর হাতে ছিল না, ছিল বাবা-মা'র হাতে। এদিকে প্যারাডাইস কাফে-র ম্যারাথন আড্ডা চুটিয়ে চলছে। আড্ডা আর স্বপ্ন। চালিয়ে যাচ্ছি কিন্তু সবই অকাজের কাজ, কিছুই হচ্ছে না। মাঝে মধ্যে ফাঁকা লাগে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভেতরটা। মনে হচ্ছে সলিলের একটা কিছু হয়ে যাবে। শিগগিরই। গান লেখা, সুর দেওয়া, নিজের গলায় গান গাওয়া, সব চলছে। রেকর্ডিং-এর হাতছানি চোখের সামনে ভাসছে। তা ছাড়া, গল্পলেখার হাতটাও বেশ জোরালো। মুশকিল একটাই। ওই পার্টিবাজি, কমিউনিস্ট পার্টি। কর্তাদের তা পছন্দের নয়। এদিকে ঋত্বিক ভাবছে একবার মুম্বাই ঘুরে আসাটা মন্দ কি। ফিরে তো আসবেই। তাপস এখানে-ওখানে আলো করতে শুরু করেছে, স্টেজে, নজরকাড়া আলো। সবাই বলাবলি করছে। আর আমি? না পারি আলো করতে, পদ্য লেখা, গান করা কোনওটাই চলে না, ঋত্বিকের মতো ডাকাবুকো হওয়ার সাহসও নেই। অথচ কিছু-না-কিছু করতেই হবে। যে যেমন ভাবছে বেরিয়ে পড়ল। আশ্চর্য, লোকজনের নেকনজরেও পড়ল সবাই। নিজ নিজ পথে চলল। যে যেমন করতে চেয়েছিল। এক আমি ছাড়া। শেষ পর্যন্ত এক ওষুধ কোম্পানিতে ঢুকে পড়লাম। ছবিটবি বোঝে না এমন এক বন্ধু চাকরিতে ঢুকিয়ে দিল। এক সপ্তাহের মধ্যে আমাকে চালান করে দেওয়া হল কানপুরে। কানপুর মানে সেই কানপুরে, বিভুঁইবিদেশে! বন্ধু বলল, 'বলতে কইতে পারিস, তোর হবে।'

হল ঠিকই, কিন্তু থাকতে পারলাম না। কানপুরে পৌঁছোতেই বড়সড়, ঢাউসও বলা চলে, গোটা দুয়েক প্যাকেট পেলাম। ব্রাঞ্চ অফিস থেকে এসেছে। ওষুধের স্যাম্পল, গুচ্ছের লিটারেচার, একপ্রস্থ লিখিত উপদেশে ঠাসা। বলা আছে, নেড়েচেড়ে সব দেখে নেবে, ডাক্তারদের সঙ্গে কথা চালাচালির ধরনধারণ বুঝে নেবে। নির্দেশ, প্রতিদিন ছ'-সাত জনের চেম্বারে যাওয়া, প্রয়োজন হলে ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা করা, বড় ডাক্তাররা যেহেতু সদাই ব্যস্ত, সময় করে নেওয়া ব্যস্ততার ফাঁকে। কঠিন কাজ বলে কাজে আলগা দেওয়া চলবে না। ঠিকঠাক নিয়মে চললে জানবে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। আর বাজে বকা একদম নয়।

অবশ্যই বাজে বকেছি। কাঁড়িকাঁড়ি বাজে বকেছি। খুচরো সময় পেলে ওষুধের কথা বলেছি। ওষুধের স্যাম্পল আর লিটারেচার টেবিলে রেখে চলে এসেছি।

মনে হয়নি এত বকবক করার দরুন ডাক্তাররা বিরক্ত হয়েছেন। কেউ কেউ-বা ভারি খুশিও হয়েছেন। ব্যারাকপুর-কানপুর-ঝাঁসির কাহিনি আমি মোটামুটি ভালই জানতাম। সিপাহি বিদ্রোহের নানা কথা, ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

অত্যাচার, আর ভারতীয় সেপাইদের কঠিন লড়াই। ডাক্তারদের এসব কথা বেশ লাগত, ভাবতেনও, বলেছেনও সেসব কথা।

বলেছেন, ভেবেছেন ওষুধ বিক্রি করতে এসে এত কথা! আর সবটাই গল্পের ঢঙে! সবটাই ইতিহাস! ওষুধের ধারে কাছে নেই! থাকারই বা কি দরকার। সেসব তো রয়েছেই লিটারেচারে আর স্যাম্পল-এ। সেসব কি জানতে হবে রিপ্রেজেন্টেটিভদের কাছ থেকে! মজার ব্যাপার, দ্বিতীয় বার দেখা হতে কেউ কেউ-বা আমাকে চিনতেও পেরেছেন, আমার সেই গল্পের টুকরো টাকরা দু'-একটা কথা মনেও রেখেছেন। একবার ঝাঁসির এক ডাক্তার, মাথায় পাগড়ি, গলায় টাই, বয়স সত্তর পেরিয়ে গিয়েছেন, দেখেই চিনেছেন কে আমি। মহাখুশি দ্বিতীয় দর্শনে। প্রথমবারই যখন জানলেন আমি কলকাতার মানুষ, তিনি শ্যামাপ্রসাদের কথা বলতে শুরু করলেন। সে কি উচ্ছ্বাস! রোগ রুগী অর্থ উপার্জন কিছুক্ষণের জন্য ভুলে গেলেন। বিস্তর বললেন হিন্দু মহাসভার কথা। আমি তর্ক করলাম। কিন্তু আশ্চর্য, ডাক্তার আমাকে তাঁর চেম্বার ছেড়ে চলে যেতে বললেন না। এবার, দ্বিতীয়বার, আমাকে দেখেই বলে উঠলেন, 'হ্যালো, কমরেড!' আমি হেসে ফেললাম, বললাম, 'লাস্ট টাইম হোয়েন আই কেম, ইউ গেভ মি অ্যান এক্সট্রাক্ট অব ইওর পলিটিক্যাল প্যাশন। নাউ দিস টাইম আই শ্যাল গিভ ইউ অ্যান এক্সট্রাক্ট অব চিকেন।' আমার ব্যাগটার ওপর আলগা এক চাপড় দিলাম, যেন, 'আছে, আছে।'

ডাক্তার হো হো করে হেসে উঠলেন, আমাকে জড়িয়ে ধরলেন।

কিন্তু শুধু এঁরাই তো নন, আমাকে বসতে হবে আরও অনেকের সঙ্গে। যেমন, ওষুধের দোকানদার, আড়তদার, আরও অনেকে। বেচাকেনার একটা ব্যাপার আছে না! তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তার ধরনটা আলাদা। তা ছাড়া, ছোট বড় আরও শহর, আরও লোকলস্কর। কথার শেষ নেই। দাওয়াইওয়ালা আমি, আমাকে ব্যবসা দিতে হয়। আমাকে ভাল থাকতেই হবে।

বুঝতে পারছি বেচাকেনার ব্যাপারে আমার মালিকেরা বেশ খুশি। হয়তো আমার 'উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ'-এর কথা একটু-আধটু ভাবছেন। যদিও, ওঁদের অজান্তে আমি ঢের বাজে বকেছি, ওষুধের কথা যৎসামান্য। ওঁরা কি কখনও খোঁজ নিয়েছেন ওষুধের কমপোজিশনের কতটুকু আমি জানতাম? আমার হাসি পেত। অস্বস্তিও বোধ করতাম। মহৎ মানুষের সেই কথা আছে না— ফাঁকি দিয়ে কোনও মহৎ কাজ হয় না!

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

তবু, এসব সত্ত্বেও আমি আমার জীবনযাত্রায় তেমন জুত করে উঠতে পারছিলাম না। একদিন 'উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ'-এর কথা উড়িয়ে দিয়ে চাকরিটা ছেড়ে দিলাম। চাকরিতে ঢোকার পাঁচ মাস পরেই। ভাল লাগছিল না।

একদিনের কথা বলি। সেদিন ঝাঁসিতে। নানা কারণে জায়গাটা আমার ভাল লেগেছিল। সারাদিনের কাজকর্ম সেরে একটা দোকান থেকে একটি সাইকেল ভাড়া করলাম। সাইকেলে চেপে রাস্তাঘাট-অলিগলি ঘুরে ফিরে এক নির্জন জায়গায় উপস্থিত হলাম। শহরের বাইরে। বিশাল মাঠ, মাঠটা জুড়ে বড় বড় পাথরের চাঁই, আবার কিছু বা ছোট পাথরের চাঁই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। যুগ যুগ ধরে এ-পাথরের চাঁইগুলো পড়ে আছে। চারিদিকে গাছপালা নেই বললেই চলে। এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা।

সন্ধে হয়ে এসেছে। পশ্চিম দিগন্তে নানা রকম রঙের খেলা চলছে। আকাশ ছাড়া সবকিছুই যেন মৃত। চারিদিক নিস্তব্ধ। আমার বুকের ভেতর টিপটিপ আওয়াজ। আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। এক অসামান্য পরিবেশ। ভাল লাগার, ভয় পাওয়ার। ঘণ্টাখানেক আগেও মানুষ দেখে দেখে কথা বলে বলে আমি মানসিকভাবে অসুস্থ বোধ করছিলাম। মনে হচ্ছিল এরা সবাই আমার অচেনা, অজানা শুধু নিজেদের নিয়েই রয়েছে। ভেবেছিলাম শহরের বাইরে এসে মুক্ত হব নিরঙ্কুশ, বল্গাহীন, উদ্দাম। মনে হল সময়টাকে উপভোগ করব প্রাণপ্রাচুর্যে। কিন্তু সেই মুহূর্তে বড় নিষ্প্রাণ মনে হল।

হঠাৎ, হঠাৎই, যে-পাথরটার চাঁইয়ের ওপর বসেছিলাম সেখানে দেখি একটি বছর দশেকের ছেলে, বোধহয় ভিখিরি, আমার সামনে দাঁড়িয়ে। কিন্তু দেখে মনে হল না সে ক্ষুধার্ত ভিখিরি। ছেলেটির চোখদুটো উজ্জ্বল। আমি হাসলাম। ছেলেটিও হাসল। আমি ছেলেটিকে দশটা টাকা দিলাম। ওই সময় দশটাকা মানে অনেক, বৈভবশালিতা। ছেলেটি বিস্ময়ে আমার দিকে তাকাল। তাকিয়েই রইল। ছেলেটিকে আমি কাছে টেনে নিলাম, কাঁধ ঝাঁকিয়ে পিঠে চাপড় দিলাম, হাসলাম। টাকাটা ইজেরের পকেটে পুরে ছেলেটি লম্বা এক দৌড় দিল। এক দৌড়ে কিছুটা গিয়ে ফিরে তাকাল একবার। দেখলাম চোখদুটো উজ্জ্বল ও বিস্ফারিত। আমার মনে হল যেন আমি এক অন্য মানুষ। আমি লাফিয়ে উঠলাম। দেখলাম আমার চারপাশটা উদাস, চারিদিক নির্জন। কেন জানি না, আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, একা। যে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

কথাগুলো আমার ভেতরে ঘুরপাক খাচ্ছিল সেগুলোকে জড়ো করে যতদূর যায় ছড়িয়ে দিলাম:

'দেখরে শালা, কেমন আছি আমি! নির্বাসনে!'

সত্যি আমি নির্বাসনে। চারিদিক জনহীন, আমি একা। চারিদিক স্তব্ধ। হঠাৎ কেমন করে হল আমি জানি না, সমস্ত স্তব্ধতাকে ভেঙে চৌচির করে আমার অস্বাভাবিক চিৎকার। তিনদিন পরে ঝাঁসিতে এই আমি প্রথম বাংলায় কথা বললাম, বাংলায় চেঁচালাম। কেউ বুঝুক আর নাই বুঝুক। আর কেই বা আছে বোঝার! এ এক পাগলামি। সেই ফরাসি কমেডিয়ান জাক তাতির ভাষায় 'Inspired Nonsense'। অথবা চ্যাপলিনের কোনও উদ্ভট আচরণ।

হোটেলে ফিরে এলাম। ছোট হোটেল, ছোট ঘর, দরজা তত ছোট নয়, কিন্তু ঘরের আয়নাটা ঘরের তুলনায় খানিকটা বেঢপ ঠেকে। সোজা লম্বা, সামনাসামনি দাঁড়ালে পায়ের আঙুল থেকে মাথার চুল পর্যন্ত সবটাই দেখতে পাই। ওই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আর একটা 'আমি'-কে খুঁজে পাই। আমি আর আমার 'ডাবল'।

এ কী! একী করছি! বলা নেই কওয়া নেই, এক এক করে আমি নিজেকে খুলে ফেললাম। বিবস্ত্র।... তারপর... কথা বলতে শুরু করলাম আমি আমারই সঙ্গে। আমার 'ডাবল'-এর সঙ্গে। চোখে চোখ রেখে। উলঙ্গ।

বললাম, 'কি হে মৃণাল সেন, তুমি না ছবি করতে চেয়েছিলে! সিনেমার ওপর অনেক পড়াশুনো করেছ, সিনেমার নান্দনিক দিক নিয়ে অনেক ভেবেছ, অনেক লিখেছ, অনেক চেষ্টা করেছ তোমার পাঠককে চমকে দিতে, ভানুমতীর খেলা খেলতে। আসলে তুমি কিন্তু দাওয়াইওয়ালা, এই দোকান থেকে ওই দোকানে গিয়ে ওষুধ বিক্রি করে বেড়িয়েছ। এসব কী করতে গিয়েছিলে। মৃণাল সেন? মনে আছে, ঝাঁসিতে যাওয়ার আগের দিন ধর্মতলা স্ট্রিটের কমলালয় স্টোরস-এর বইয়ের ডিপার্টমেন্টে বসে আছ, বইটই ঘাঁটছ। পেছন থেকে এসে কাঁধে হাত রাখলেন শেক্সপিরিয়ান অধ্যাপক নীরেন রায়। হাতে তুলে দিলেন সেই বইখানা: 'ম্যাজিক মাউনটেন'। বললেন, 'একা একা থাকবে, যখন খালি খালি লাগবে, পড়বে। পড়ে শান্তি পাবে।' মনে পড়ছে, মৃণাল সেন?

ছবি করতে গিয়েছিলে। কত কি ভেবেছিলে। কিছু করতে পেরেছিলে? পারনি। ওষুধ বিক্রি করতে বেরিয়ে এলে। ওটাই কর ভাই মৃণাল সেন, ওটাই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আসবে ভাল। ওসবই জমবে ভাল। মালিককে খুশি কর, মাইনে বাড়বে, 'ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল' হবে। ছবিটবি তোমাকে দিয়ে হবে না। যা পারবে তাই কর। বুঝেছ মৃণাল সেন।'

বকে যাচ্ছি, নিজেই নিজের সঙ্গে বলে চলেছি। বলে চলেছি আর ভাবছি এই বুঝি ভেঙে পড়ব। নাঃ, অত সোজা নয় তাও জানি। দরজাটা কি খোলা? না, ঘরে ঢুকেই ছিটকিনিটা দিতে ভুলিনি। আমি একা আমার ঘরে। বন্ধ ঘর। ভয় কি! কেউ তো আর দেখছে না।

চোখে চোখ রাখলাম, চোখে চোখ রাখলাম, চোখে চোখ রাখলাম। স্থির তাকিয়ে আছি। স্থির। হঠাৎ মনে হল বুকে একটা চাপ পড়ছে। মনে হল গলায় কি একটা উঠে আসছে। তাকিয়ে আছি চোখে চোখ রেখে। চোখ কি ছলছল করছে? কে, না তো। সেই মুহূর্তে কি হল, নিজেকে ভ্যাংচাতে শুরু করলাম, নানাভাবে, অসভ্যের মতো, কখনও চোখ ঢেকে, কখনও বা খুলে, আবার এক-চোখো হয়েও বা। আর আমার মুখোমুখি আমি। এবার সত্যিই গলা ভিজে এল। কাঁদব কি! কাঁদছি কি! আর পারিনি, এবার বাঁধ ভেঙে গেল। কাঁদছি পাগলের মতো, কাঁদছি শিশুর মতো, কাঁদছি হাউহাউ করে। আমি একা, একা ঘরে, নিঃসঙ্গ। দরজায় টোকা: বাবু, বাবু! ডাকছেন!

তিনদিন পরে একটা টেলিগ্রাম। আমি কাজে ইস্তফা দিলাম। ফিরে আসার জন্য নয়। চলে যাওয়ার জন্য। কলকাতায় থেকে যাওয়ার জন্য।

আবার সেই কলকাতা, আবার সেই প্যারাডাইস কাফে, আবার গীতা, উত্তরপাড়ায়।

ভালমন্দর রাস্তা ডিঙিয়ে শেষপর্যন্ত ছবির রাজ্যেই থেকে গেলাম। স্থির মেনে নিলাম যে ছবির জগতে বিরাট ঝড় ও ভূমিকম্পের পরেও আমি আমার অতীত নিয়ে আর ভাবব না আর বেঁচে থাকব ব্যক্তিগত হাজার মান-অপমানের বোধ নিয়ে। কালক্রমে চড়াই উতরাই ডিঙিয়ে এমন এক সমতলে এসে দাঁড়ালাম যখন বুঝতে অসুবিধে হল না যে আমাকে আর পেছনের দিকে তাকাতে হবে না। বাস্তবিকই, প্রযোজক নিয়ে তেমন ভাবতে হয়নি সেই থেকে। ছবি কখনও চলেছে, কখনও বা চলেনি এবং মাঝে মধ্যে 'পপুলার ফেইলিওর' (popular failure) সত্ত্বেও আপোশ করিনি এতটুকু। নিজের সঙ্গেই নিজে কথা বলেছি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও

তর্ক করেছি, পরীক্ষা নিরীক্ষা সদা সর্বদা চাপিয়ে গিয়েছি নির্ভাবনায়। ফলে বরাবর খোলামনে বিতর্কিত পরিচালক হয়েই থেকেছি, সে থেকে মুক্তি পাইনি। এবং বিতর্কের প্রশ্নে এক বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর কথা আমাকে 'হারকিউলিস'-এর সম্মান দিয়েছে: 'Truth attains a quality only when it becomes controversial.'

যে ছবিটিকে কেন্দ্র করে এক বিশাল তর্ক জমে উঠেছিল, দু'মাস ধরে চলেছিল ইংরেজি দৈনিক 'দ্য স্টেটসম্যান'-এ, সেই ছবিটির নাম 'আকাশ কুসুম' (১৯৬৫)। গল্পটি এক আধুনিক যুবককে নিয়ে, নগরজীবনে অভ্যস্ত, অভাবগ্রস্ত, কিন্তু দীনতার বেড়া ভেঙে ধনী হওয়ার প্রবল আগ্রহ। জীবনধারা পালটে ফেলবার জন্য বেপরোয়া। বুদ্ধিমান, মজাদার কিন্তু প্রয়োজনে একটু-আধটু মিথ্যে বলতে বাধে না। সেই মিথ্যের দরুন অসৎ বলা যায় না কোনও কারণেই। এক যুবতীকে ভাল লাগে, সুন্দরী, বড় ঘরের মেয়ে। বনেদিয়ানার ভান করতে হয় যুবকটিকে। অর্থাৎ কিছুটা মিথ্যে বলতে হয়, মিথ্যের চাইতেও বেশি বা। কোনও তঞ্চকতা নেই, কোনও ফাঁকি নেই। ফলে, যুবকটিকে মিথ্যে বলতে হয় আরও বেশি। জালে জড়িয়ে পড়ে। সম্পর্কও বেড়ে ওঠে দুরন্ত। সমপ্রাণ এক বন্ধু আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যে মানুষ। ব্যাপারটাকে মোটেই ভাল চোখে দেখে না। তখন ঘটনা অনেকটা গড়িয়ে গিয়েছে। যুবকটি একসময়ে নিষ্ঠুর বাস্তবের শিকার হয়। যখন যুবকটির মতিগতি ফেরে তখন এই খেলার জন্য অনেক মূল্য দিতে হয়। খেল খতম!

তর্কের শুরু 'দ্য স্টেটসম্যান'-এর রিভিউ দিয়ে। আমার ভাল লেগেছিল, কিন্তু লেখক আশিস বর্মন দু-একটা ছোট প্রশ্ন তোলেন। ব্যাপারটা ওখানেই শেষ হতে পারত, কিন্তু সত্যজিৎ রায় আমাকে ফোনে বলেন, 'আপনাকে আঘাত করার কিছু নেই, শুধু ওর গল্পের ওপর আমি কিছু বলব।' তাতে আমার আপত্তির কোনও কারণ নেই। থাকলেই-বা। সত্যজিৎ রায় তাঁর সুন্দর লেখার ভঙ্গিতে লেখক সম্পর্কে কিছু বললেন। একটু সমালোচনাও। আশিস বর্মন পালটা যে লেখাটি লিখলেন তা হয়তো না লিখলেও চলত। বিশেষ কারণ না থাকলেও আমিও কিছু লিখলাম। স্রেফ কিছু মজা করার জন্য। আবার সত্যজিৎ রায়। আবার আমি আর আশিস। চলল বাদ-প্রতিবাদ। আরও আরও। জুটলেন আরও একশোর ওপর পত্রলেখক। দুটো দল হয়ে গেল, দুপক্ষই লিখল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

তর্ক-বিতর্ক চলতেই থাকল। ব্যাপারটা ক্রমেই শক্ত হয়ে উঠল, লড়াই লাগল 'অ্যান্টিকিউইটি'র সঙ্গে 'কনটেম্পোর‍্যানিটি'র।

তর্কযুদ্ধ, শব্দের লড়াই। যেদিন পত্রিকার সম্পাদক জানালেন, 'সবশেষ, আর নয়।' সেদিনই সত্যজিৎ রায় আমাকে বললেন, 'আমার ব্যাগ-এ আরও অনেক শব্দ ছিল।' বলে হাসলেন। আর আমি বললাম, 'আমারও ছিল, ট্রাকভর্তি, যদিও আপনি আমার চাইতে ঢের বেশি বুদ্ধিমান।' সম্পাদক প্রাণ চোপরা রায় দিলেন, 'ইট ওয়াজ নোবডিজ লস, নোবডিজ গেইন।'

বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর কথাটা আবার মনে পড়ল: 'Truth attains a quality only when it becomes controversial.'

বেশ মজা হল দু'মাস ধরে।

কান-এ ৪৫তম চলচ্চিত্র উৎসব। ওই উৎসবে একটি বই বেরোবে। কান ফেস্টিভালে যাঁরা এতকাল এসেছেন তাঁদের নিয়ে। তাঁদের কিছু লেখা, স্কেচ, ডায়েরি, তাঁদের ব্যক্তিগত নানা ভাবনা— এইসব নিয়ে। ওঁরা আমাদের তিনজনকে চান। অর্থাৎ তিনজনের পত্রাঘাত। আশিস বর্মন-সত্যজিৎ রায়-মৃণাল সেন। কুরোসাওয়া, ফেলিনি, আন্তোনিয়নি এবং আরও অনেকের। বেশ ভারি বই। ফরাসিতে। নাম *Les Visiteurs de Cannes*— 'লে ভিজিতর দ্য কান'। ফরাসি না-বুঝেই বইয়ের ওজনটাই আমার খুব ভাল লেগেছিল।

কিছু সময়ের মধ্যেই প্যারাডাইস কাফের বন্ধুরা ধীরে ধীরে উঠে আসতে লাগল শক্ত হাতে। সবচাইতে লম্বা শক্তপোক্ত ও দুঃসাহসী, ঋত্বিক ঘটক, সব সময়েই দেখা যেত সে যেন নিজের ছবিতে মহৎ সত্যকে খুঁজে বার করতে সচেষ্ট। ঋত্বিক বলত, 'আমি সেই ভাষার কথা খুঁজি যে ভাষায় কথা কম, যে ভাষা জানায় বোঝায়, এবং এমন এক পরিবেশে পৌঁছে দেয় যা 'আর্কিটাইপ্যাল ইমেজ' হিসেবে পরিচিত।' সলিল চৌধুরীর সংগীত কিছুদিনের মধ্যেই এক জাতীয় সম্পদের অধিকারী হয়ে উঠল। দেশি ও লোকসংগীত এবং পাশ্চাত্য ও পৃথিবীর নানা জায়গার সুরকে সুন্দরভাবে তৈরি করে পরিবেশন করল। গানের জগতে সলিল অদ্বিতীয় হয়ে উঠল। হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় যে আমাদের মধ্যে প্রথম ও একমাত্র চাকুরিজীবী ছিল। বোম্বাই পৌঁছে গিয়েই জনপ্রিয় হয়ে উঠল

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এবং দেখতে দেখতে ফিল্মজগতের প্রচুর শ্রদ্ধা আদায় করে নিল। বংশী চন্দ্রগুপ্তর জন্ম কাশ্মীরে নয়, পঞ্জাবে তা যতটা বোঝা গেল তার চাইতে ঢের বেশি বৈভবশালী হয়ে দাঁড়ান শিল্প নির্দেশনার জগতে। তাঁর দ্বিতীয় জন্ম হল কলকাতাতেই। আর তাপস সেন এত দ্রুত উঠে এল আলোর জগতে এবং আলো আর অন্ধকার নিয়ে এমন সব খেলায় মেতে উঠল যে ওর অসম্ভব ক্রিয়াকাণ্ড দেখে আমি বলতাম: তাপস একদিকে আলোর সম্রাট, অন্যদিকে অন্ধকারের প্রহরী। তাপস অতুলনীয় তাপসের জগতে।

আমার মনে আছে আমেরিকার শিকাগো শহরে আমার একটি ছবির আমন্ত্রণে বক্তব্য রাখতে হল আমাকেই এবং বক্তব্যের পর আমার একটি ছবি সেখানে দেখানো হল। এমন সময় এক ভারতীয় আমার সঙ্গে দেখা করলেন। সময়টা ১৯৭৫ সাল। সম্মান দিয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে বললেন, 'প্যারাডাইস কাফেতে আমি চা সরবরাহ করতাম খদ্দেরদের।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এখন আপনি কী করেন?'

সে এমন একটা ভাব করল যেন সে একটা অপরাধ করেছে। কাঁচুমাচু হয়ে বলল, 'শিকাগোতে একটি প্রাইভেট স্কুলে ইংরেজি পড়াই।' এবারে আমি গর্বের সঙ্গে বলতে চাইলাম যে একটি ট্র্যাফিক-কণ্টকিত এক অতি সাবেকি রাস্তার চায়ের দোকানের ছেলে শিকাগোতে ইংরেজি পড়ায়। ভাবাই যায় না।

চল্লিশের দশকে কত মঞ্চসফল নাটক দেখেছি। আমি অবাক হয়ে যাই ভাবতে গিয়ে। এই শহরে এবং শহরের বাইরে, পার্কে, মাঠে, কাঠের বা বাঁশের তৈরি মঞ্চে কত সব অভিনয় দক্ষতা। এ ছাড়া ব্যালে, ব্যালাড, সংগীত এবং আরও একাধিক শিল্পসফল নাচ-গান-নাটক দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে। এসব সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের সময়ের কথা। সেই ব্রিটিশ শাসকদের শয়তানি এবং সে সময়কার নতুন ভাবনার বিদেশি চলচ্চিত্রের কথা। আমি কোনও দিন এসব দেখতে ব্যর্থ হইনি। বিশেষত 'নবান্ন' নাটক। 'রামলীলা' (সেই গতানুগতিক পুরনো সংগীতমুখরিত অনুষ্ঠান এখন আধুনিক) এবং 'গাঁধী-জিন্না মিটিং এগেইন।' এই ব্যালে-টার জন্য সাধারণ মানুষের উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখার মতো: অর্থবহ-অনাড়ম্বর-অসামান্য-অভূতপূর্ব। আমি একজন বহিরাগত। তবুও আমি ভীষণভাবে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যে দল এসব অনুষ্ঠানগুলো করত সেই দলের নাম ভারতীয় গণনাট্য সংঘ। ওই আন্দোলনে আমিও জড়িয়ে গেলাম। ভাবতে গেলে অবাক হতে হয়। বোধহয় ওদের এসব কান্ডকারখানায় ম্যাজিক ছিল।

আমি ওদের অভিনেতা বা কেউই ছিলাম না। তবুও মনের দিক দিয়ে আমি ওদের একজন ছিলাম। এ জন্যই কি আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমিও ওদের মতো শো বিজনেস-এ যোগ দেব। বোধ হয় তাই।

একটি বিশাল পরিবর্তন এল স্বাধীনতার পর। নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্য হল রাজনৈতিক কারণে, এমনকী শিল্পের জগতেও ঝগড়া হল। এসব কারণে দলগুলোর শক্তি বা প্রাণ কমে গেল। সংগঠন দুর্বল হল। কারণ একটা নয়, একাধিক।

গণনাট্য সংঘের ক্ষেত্রে এ একটি বিরাট ধাক্কা। স্বাধীনতার পর এ-বিরোধ এড়ানো গেল না। কে আসল শত্রু চিহ্নিত করবার ব্যাপারটা দানা বাঁধল। এ ভাঙনের একটা বড় কারণ হল ব্যক্তিত্বের সংঘাত। শুধু তাই নয়, ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের লড়াই গ্রুপের ভেতরে। মনে হয় এগুলোই ভাঙনের কারণ।

এর মধ্যে সবচাইতে শক্তিশালী শম্ভু মিত্র। পাথরের মতো শক্ত। উজ্জ্বলধারার ক্রিয়াকর্ম শুরু করলেন। সেই সময় আর একজন মানুষ, নিঃসঙ্গ। একা। তিনি বিজন ভট্টাচার্য। তিনি বোধ হয় ঠিক জানতেন না কী করে একটি গ্রুপ তৈরি করতে হয়। কিন্তু অসাধারণ স্রষ্টা। তিনি শম্ভু মিত্র নন।

সেই সময় নতুন নতুন নাটক, নতুন নতুন অভিনেতা আসতে লাগলেন। বিভিন্ন নাটকের দল, বিভিন্ন কাহিনি, বিভিন্ন স্টাইল সেসব নাটকের।

শুরু হল নাট্যচর্চা। নাটককে ভালবেসে আমিও ওঁদের সঙ্গে বাইরে থেকেই জড়িয়ে পড়লাম। ধরা-বাঁধা সমাজব্যবস্থায় কোনও কিছু ভিন্ন স্বাদের হলেই মনোযোগ দেওয়া উচিত বলে মনে করি আমি। যেমন বাদল সরকার। বাংলা নাটকে নতুন চিন্তাধারা আনলেন। যেমন উৎপল দত্তের 'কল্লোল' নাটক। ভারতীয় নৌ বিদ্রোহের ওপর। উৎপল দত্তরা নাটকটা শুরু করলেন দর্শকদের মাঝখান থেকে উঠে এসে। প্রসেনিয়াম থেকে নীচে নেমে এসে। উৎপল দত্তের অভিনেতারা নীচে হাঁটলেন, ধীরে ধীরে মঞ্চে চলে গেলেন। আরও হাজারটা ভাবনা। ভারতীয় নাট্যমঞ্চে এ এক নতুন স্বাদ, নতুন অভিজ্ঞতা।

বাদল সরকার নাটককে ময়দানে এনে হাজির করলেন। এমনকী,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অভিনেতারা দর্শকদের সঙ্গে কথা বললেন। ঠিক যেরকম শহরের পার্কে বা মাঠে ময়দানে যে পরিবেশ থাকে ঠিক সেই পরিবেশে নাটক হল। এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। বাদল সরকার নাট্য আন্দোলন চালিয়ে যান। তাঁর নাটকে কোনও মঞ্চ নেই। কী অসাধারণ অভিজ্ঞতা।

নতুন চিন্তা, নতুন অভিনেতাদের আগমন। সবাই নিঃস্বার্থ ভাবে উৎসর্গ করছেন নিজেদের। গীতাও দলে ভিড়ে গেল।

সেই সময় অনেক আগে সেই ১৯৫০ সাল থেকে ষাটের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত দারুণভাবে চলল। আজও চলছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ষ ষ্ঠ অ ধ্যা য়

আমার সম্পর্কে যদি কিছু বলতেই হয় তাহলে বলব আমি চলাফেরা করি বাস্তবে, বর্তমানে। অর্থাৎ এই মুহূর্তে কী ঘটছে তার মধ্যে। সব মানুষের মতো আমিও রোজ সেই অতীতের মোকাবিলা করি একটু দূর থেকে, স্মরণ করি সেই অতীতকে, সেই ইতিহাসকে। কিন্তু সেই অতীতকে বিচার করি স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজের মতো করে বর্তমানের সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে। অতীত আর বর্তমানের সঙ্গে ক্রমাগত কথা বলি।

আমি যেসব কাহিনি বলছি সেসব কাহিনির মধ্যেই আমার বিশ্বাসের বীজ রয়েছে। আমি অতীতকে বর্তমানের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে যোগসূত্র তৈরি করে চলি।

অতীতের সঙ্গে বর্তমানের যোগাযোগ ঘটাতে গিয়ে আমার মনের গভীরে অসতর্কভাবে এসে যায় এমন কিছু কথা যে কথা খুলে দেয় অতীত আর বর্তমানের বন্ধ দরজা।

মনে পড়ে, সেই সারনাথের কথা। গয়ার বোধি গাছের নীচে জ্ঞানচক্ষু উন্মেষের পর বুদ্ধদেব তাঁর প্রথম বাণী দেন সেখানেই। সেখানেই আমি ১৯৫১ সালের জানুয়ারি মাসে প্রথম যাই। তখন আমি মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ হয়ে উত্তরপ্রদেশের এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছি। এসব ঘটনা কিন্তু আমার সিনেমা তৈরি করার আগে। এই ঐতিহাসিক জায়গায় আমি একা ঘুরে বেড়াচ্ছি, সঙ্গে শুধু গাইড, সমস্ত গাছগুলো দেখছি, দেখছি সেই বিখ্যাত লায়ন ক্যাপিটাল। সিঁড়ির নীচে যখন নামলাম তখন দেখলাম একটা ছোট সরু রাস্তা চলে গেছে যেসব ঘরে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা থাকতেন সেইদিকে।

আমি যখন সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামলাম তখন দেখলাম সামনে গোটা কয়েক ছোট্ট ঘর, ছোট্ট দরজা, একটা ছোট্ট ফ্রেমের মতো। আমি ভাবলাম এই ঘরটায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও

ঢুকব। আমি যথেষ্ট লম্বা বলে মাথাটা নিচু করে ছোট্ট দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকলাম। ঘরটায় প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে একটা রহস্যজনক শক্তি আমাকে চেপে ধরল। আমি বুঝলাম না ব্যাপারটা কী! ঢোকার জন্যে যখন মাথাটা নিচু করলাম তখনই মনে হল আমি নিজে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। আবার যখন সোজা হয়ে দাঁড়ালাম তখনই যেন আমি নিজের মধ্যে ফিরে এলাম। আমি একজন মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ, ওষুধ বেঁচে খাই, বড় বড় ডাক্তারের কাছে ধর্না দিই সেই আমি এইখানে মুহূর্তের জন্য এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী।

অবাক হওয়ার মতো ঘটনা। যেটা আমি নিজের অজান্তেই করেছি সেটা হল মাথা নিচু করা। অথচ এই সামান্য মাথা নিচু করার জন্য একটি আশ্চর্যের ঘটনা ঘটল। এইভাবে মাথা নিচু করা ব্যাপারটা সেই বুদ্ধের আমল থেকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা করে আসছেন। এটা করা হয় ঘরে প্রবেশ করবার সময় আবার ঘর থেকে বাইরে আসার সময়। এটাই আমি করেছিলাম। তাতে আমার কাছে খুলে গেল যেন এক রহস্যময় দরজা, অনেকটা সুইং ডোর-এর মতো, যাকে মাঝখানে রেখে ছুঁয়ে ফেলা যায় অতীত আর বর্তমানের তাৎক্ষণিক মুহূর্তগুলো।

আর একটি গল্প না-বললেই নয়। সেটি হল ভুবনেশ্বরের কাছে ধৌলির ঘটনা। ওড়িশা অর্থাৎ কলিঙ্গ'র এক সময়ের রাজধানী এই ধৌলি।

১৯৬৫ সালে আমি ধৌলি যাই। ভারত সরকারের হয়ে একটা ছবি করতে হচ্ছে। এক ঘণ্টার এক তথ্যচিত্র। পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাস। সারাদেশ চষে বেড়াচ্ছি পিঠে ইতিহাসের বোঝা চাপিয়ে। ইতিহাসের গন্ধ পেলেই ছুটে চলেছি। ধৌলি সেই ইতিহাসের এক কেন্দ্রবিন্দু। আমি আমার লোকজন নিয়ে যখন সেখানে পৌঁছলাম তখন ধৌলি শান্ত, সমাহিত। নীরবতা বিরাজ করছে। পাশ দিয়ে একটি নদী বয়ে গেছে, জল নেই বললেই চলে। দয়া নদী। মৌন, মূক, নির্বাক।

ইতিহাস বলে: যীশু খ্রিস্টের জন্মের দুশো বছর আগে কলিঙ্গ-র রাজধানী ধৌলি এক সময় ভয়ংকর হয়ে উঠল। রক্ত-হত্যা-মৃত্যু-নৃশংসতায় ধৌলির প্রান্তরে নরক জাগল। এই হল বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর সম্রাট অশোকের শেষ যুদ্ধ। হাজার যুদ্ধের এক যুদ্ধ, অন্তিম যুদ্ধ। এবং এখানেই সম্রাটের জীবনে আমূল পরিবর্তন। তিনি দীক্ষিত হলেন বৌদ্ধধর্মে, চন্ডাশোকের রূপান্তর ঘটল

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ধর্মাশোকে। প্রয়োজনের তাড়নায় সম্রাট অশোক তাঁর সমগ্র সাম্রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে দিলেন নির্দেশনামা। পাহাড় আর স্তম্ভের ওপর খোদাই করা নির্দেশনামা। সবই সম্রাটের নির্দেশে, সবই তাঁর লাখ লাখ প্রজাদের উদ্দেশে, প্রজানুরঞ্জনের জন্য। নির্দেশনামার গা ঘেঁষে শ্বেতপাথরের হাতি— ভগবান বুদ্ধের মোটিফ। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অশান্ত অস্থির সম্রাট জানালেন যে দেশের এবং সাম্রাজ্যের প্রজারা তাঁরই প্রিয় সন্তান। যারা এদের কোনও রকম ক্ষতি করবে তারা শাস্তি পাবে। সে যেই হোক, যত বড় মাপের মানুষই হোক না কেন কঠোর শাস্তি মিলবে তাদের। আরও অনেক অনেক কথা শিলালিপিতে রয়েছে, যুদ্ধের অনেক বীভৎস কাহিনি। সমস্ত বাণী বা নির্দেশনামার শেষ কথা 'শান্তি'।

আমি সেই পবিত্র পাথরের পাশে বসে আছি। প্রখর রোদের তাপ এবং সেই নোনতা চিটচিটে গরম বাতাস আমাকে ও আমার সঙ্গীদের ভীষণ কষ্ট দিচ্ছিল। সেই ধূ ধূ প্রান্তরে না আছে কোনও গাছ-গাছড়া, না আছে কোনও শীতল আচ্ছাদন।

মনে হল কে যেন রয়েছে আমার পেছনে। ঘুরে তাকালাম। দেখি, কয়েক গজ দূরে এক বৃদ্ধা বসে আছে, রোদের তাপ অগ্রাহ্য করে বসে আছে। বসে আছে একটা লাঠি হাতে। অনেক বয়স হয়েছে বৃদ্ধার, গায়ের চামড়া কুঁচকে গিয়েছে, শরীরটা বেঁকে গিয়েছে, বয়সের ছায়া সমস্ত শরীরে। বসেই আছে, এক আধটু হাঁটছেও বা, লাঠিটা অবশ্য সঙ্গেই। আমি ভাবি, একা একা এখানে এই নির্জনে বসে কেন? না, নির্জনে তো নয়, একটু দূরেই একটা গোরু চরছে। গোরুটাকে চরাতেই এসেছে বৃদ্ধা। ওটাই একটা গোচারণ ভূমি।

আমি তাকিয়েছিলাম গোরুটার দিকে, তাকালাম বৃদ্ধার দিকে। বৃদ্ধাও তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমি মুচকি হাসলাম, অকারণে। বৃদ্ধাও হাসল, অকারণেই বা। কী হল, কেন হল, আমি জানলাম না, বৃদ্ধাও জানল না হয়তো, কিন্তু বর্তমানের তাৎক্ষণিক মুহূর্তগুলো তখন আর রইল না। সেই আজব রহস্য!

সম্রাট অশোকের নির্দেশনামাকে ভর করে আমি তখন দাঁড়িয়ে কলিঙ্গ-র অতীতে। বৃদ্ধাও তখন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সামনে। দয়া নদীতে তখন শুধুই রক্ত। কিংবদন্তি তাই বলছে। আর ইতিহাস বলছে: রক্ত, হত্যা, মৃত্যু আর নৃশংসতা। বীভৎস, অশ্লীল। অসহ্য বেলেল্লাপনা। আমি দেখছিলাম আমার মতো করে। বৃদ্ধা, বৃদ্ধার ভাবনায়। অবশ্যই সবটাই কল্পনায়। সেই তাৎক্ষণিক মুহূর্তের ইশারায়। রহস্যময়তায়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

যেন অকস্মাৎ গোরুর ডাক শোনা গেল। হা-ম্-বা! সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তের মধ্যে ফিরে এলাম বর্তমানে। ধৌলি তখন মৌন মূক নির্বাক, যেমন ছিল। অদূরে গোচারণ ভূমি। দেখি শ্বেত পাথরের হাতি, পাথরে খোদাই করা নির্দেশনামা, আর রোদের তাপ অগ্রাহ্য করে লাঠি হাতে সেই গোরু চরানো প্রাচীন বৃদ্ধা। কল্পনায় নয়, বাস্তবে।

বৃদ্ধাটি অবশ্যই নিরক্ষর, অশোক সম্পর্কে তার কোনও প্রশ্ন নেই, থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু ইতিহাস পাঠে যাঁরা দীক্ষিত তাঁরা সম্রাটের নির্দেশনামায় নানা প্রশ্ন তুলবেন হয়তো। হয়তো বলবেন, সহস্র লক্ষ মানুষ মেরে অজস্র রক্ত ঝরিয়ে বিশাল সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটিয়ে একি করা হল, শেষ পর্যন্ত। এবং সম্রাট কী করলেন? শেষ ডাকে শেষ পর্যন্ত শেষ কথা বললেন: শান্তি, নিঃসীম শান্তি!

সবটাই কি গ্রহণীয়? অঘটন নেই কি কিছুই?

হয়তো বিষয়টা তর্কের নয়, হয়তো বা বোধেরও নয়। তাই ধৌলি প্রসঙ্গ না বাড়িয়ে আমরা ফিরে যাই না কেন কলকাতায়, কলকাতায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল-এ, যেখানে ব্রিটিশ ভারতকে খুঁজে পাওয়া যাবে নানাভাবে! আমার তথ্যচিত্রের কাজে লাগবে অবশ্যই। বিশেষ করে সিপাহি বিদ্রোহের ঘটনা, জরুরি কিছু টুকিটাকি।

১৮৫৭-৫৮ সাল। সিপাহি বিদ্রোহ। শুরু যার কলকাতার উপকণ্ঠে, ব্যারাকপুরে। যার রুদ্ররোষ কয়েকমাসের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে দেশের নানা প্রান্তে, উত্তর ভারতে, মধ্য ভারতে। যুদ্ধবাজ ইংরেজ তখন ভিড়ে গিয়েছে ষোলো আনা! অতএব আর কোনও থামা নেই। শুধুই হিংসা আর বর্বরতা। সিপাহিরা বিধ্বস্ত। এবং শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহিদের হার। সেই থেকে যুদ্ধের তাণ্ডবলীলার ধারাভাষ্য আর জয়-পরাজয়ের খতিয়ান ইতিহাসের পাতায় পাতায়, পাথরে নয়, ফলকে নয়।

সম্রাট অশোকের প্রচার হয়েছিল পাথরে-ফলকে, সমস্ত সাম্রাজ্য জুড়ে। পাহাড়ের গায়ে গায়ে সম্রাটের আত্মশোধন হয়েছিল। পাহাড়ের গায়েই স্বীকারোক্তি।

আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রচার চলে অন্য পথে, আত্মশ্লাঘায়, শত্রু নিধনে। ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয় দারুণ বিক্রমে। ভালোমন্দ মিশিয়ে ভাষ্য। ভাষ্য কোমল ও কঠিন। মহারানি ভিক্টোরিয়ার নামে ঘোষণাপত্রটি— to the (native) Princes,

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

Chiefs and the People of India. পাঠ সম্ভবত ভিক্টোরিয়ার অথবা মহারানির কোনও রাজপ্রতিনিধির। পঠিত এলাহাবাদ-এ, ১ নভেম্বর ১৮৫৮ সালে।

কলকাতা মহানগরেরই এক অংশে এক বিশাল প্রান্তরের একেবারে মাঝখানে একটি প্রাসাদ, আগাগোড়া শ্বেতপাথরে তৈরি। নানা সম্ভারে সাজানো মিউজিয়ামটি— ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। সবই ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে রয়েছে আজও, অতি সযত্নে রক্ষিত। সেখানেই রয়েছে ইংরেজ আমলের মহামূল্যবান দলিল দস্তাবেজ। মহারানি ভিক্টোরিয়া-র ঘোষণাপত্রটি-ও। ভালোমন্দ মেশানো কোমল-কঠোর সেই ঘোষণাপত্রের অংশবিশেষ এখানে তুলে ধরা হল:

'...We shall respect the Rights, Dignity, and Honour of Native Princes as Our own; and We desire that they, as well as Our own Subjects, should enjoy that Prosperity and that social Advancement which can only be secured by internal Peace and good Government.

... it is Our further Will that, so far as may be, Our Subjects, of whatever Race or Creed, be freely and impartially admitted to Office in Our Service, the Duties of which they may be qualified, by their education, ability, and integrity, duly to discharge.

... We deeply lament the evils and misery which have been brought upon INDIA by the acts of ambitious Men, who have deceived their Countrymen by false reports, and led them into open Rebelion. Our power has been shown by the suppression of that rebellion in the field; We desire to show our Mercy by pardoning the Offences of those who have been thus misled, but who desire to return to the path of Duty.

...Our Clemency will be extended to all Offenders, save and except those who have been, or shall be, convicted of having directly taken part in the Murder of British Subjects. With regard to such, the demands of Justice forbid the exercise of Mercy.'

ঘোষণাপত্রের কথায় অন্য এক কথা মনে পড়ে যায়।

১৯৫০ সালের একটা দিন। কলকাতায় এলেন দুজন আফ্রিকান,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

গায়ানাবাসী। দেশটি ছিল ব্রিটিশ উপনিবেশ। জাতীয় আন্দোলনের জেরে ইংরেজ দেশছাড়া। যে দুজন কলকাতায় এলেন তাঁরা তখন নতুন প্রজাতন্ত্রের দুই খ্যাতিমান মন্ত্রী— প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী ছেদি জগন, পূর্বপুরুষেরা কোনওকালে ভারতের মানুষ ছিলেন। শিক্ষামন্ত্রী খাস আফ্রিকান, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া শেষ করে দেশে ফেরেন। কলকাতার ধর্মতলায় অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাড়িতে ঠিক হল এঁরা নিজেদের দেশ সম্পর্কে কিছু বলবেন। আমি প্রথম সারিতে বসে বক্তৃতা শুনছি। অসাধারণ বক্তা শিক্ষামন্ত্রী, এবং কনিষ্ঠতম মন্ত্রী। একটা কথা বলেন এক মিনিট দেড় মিনিট, বা দু'মিনিট তারপরেই অন্য প্রসঙ্গে। এক সময় শিক্ষামন্ত্রী বললেন, 'আমরা যখন ছোট ছিলাম, আমাদের শেখানো হত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য কখনও অস্ত যায় না। যখন বড় হলাম নিজেরাই শিখলাম যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রক্ত কখনও শুকোয় না।' গায়ানার জনসাধারণ সে কথাই জানেন।

মহারানী ভিক্টোরিয়া-র ভালমন্দ মেশানো ঘোষণাপত্র প্রচারের পরেও গায়ানার শিক্ষামন্ত্রী যা বলেছিলেন তা দ্ব্যর্থহীনভাবে খাঁটি: 'এ-দেশে রক্ত শুকোয় না।'

ইতিহাসবেত্তা আমি নই, একেবারেই নই। তবু গোটা দেশ ঘুরে একদিন ছবিটি শেষ করলাম। নাম *Moving Perspectives*। আমার এক বন্ধু কিরণময় রাহা, কেন্দ্রীয় সরকারের এক বড় আমলা, তখন ওড়িশায় বদলিতে ছিলেন, বললেন, 'একবার ওড়িশায় চলে আসুন না!' আমি বলি, 'হঠাৎ আবার!' কিরণবাবুর ইচ্ছে আমি এবার ওড়িয়া ভাষায় একটা বড় ছবি করি। বললেন, 'গুজরাতের এক ভদ্রলোক, বহুকাল ওড়িশায় বাস, ওখানে নানা কিছু করেছেন, এবার একটা ছবি করতে চান।' তবে তিনি চান, বিষয়বস্তু যেমনই হোক, সবটাই পরিচালকের মর্জি অনুযায়ী, কিন্তু ভাষাটা হবে ওড়িয়া। আমি ভাবলাম: বাংলার মানুষ আমি, আমিই পরিচালক, লেখক ওড়িশার, প্রযোজক গুজরাতের। সুন্দর ব্যাপার, সুন্দর প্রস্তাব, একটু 'কিন্তু-কিন্তু' করে রাজি হয়ে গেলাম। লেখকের নাম কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী, অতি বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক। গল্পের মূল নাম 'মাটির মণিশ', ছবির সাবটাইটেল দিলাম *Two Brothers*।

খেত-খামারে ভরাট এক গ্রাম। সেই গ্রামের এক যৌথ পরিবারের গল্প।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কৃষিকার্যের জমি তাদের। পরিণত বয়সেই পরিবারের সর্বময় কর্তা মারা যায়। যৌথ পরিবারে থেকে যায় দুই ছেলে। বড়টির তিন সন্তান— দুটি কন্যা ও এক পুত্র। ছোট ভাইয়ের কোনও সন্তানাদি তখন হয়নি। বাবার মৃত্যুর পরে পরিবারের সর্বময় কর্তা হয়ে দাঁড়াল বড় ভাই। বড় ভাই-ই জমি-জায়গা স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির কুলপতি (প্যাট্রিয়ার্ক)। যদিও গ্রামের সবাই জানে, গল্পের পাঠক হিসেবে আমিও জানি, বড় ভাই অর্থাৎ কুলপতি খুবই ভাল মানুষ, কালে ভদ্রে এমন মানুষ পাওয়া যায়— ভাল ছেলে, ভাল ভাই, ভাল স্বামী এবং কর্তব্যপরায়ণ পিতা। এই সত্যটাই মেনে এসেছি আমি এবং গ্রামের সবাই। যেহেতু আমাকে ছবি করতে হচ্ছে, তাই আমার পড়ারও শেষ নেই, পড়েই চলেছি, একবার দুবার অনেকবার। এ-হেন মূল্যায়নে আবিষ্কার করলাম— আশ্চর্য এক আবিষ্কার, যে এই গল্পটির মধ্যে পিতৃতান্ত্রিক শাসন বা শোষণ অদ্ভুতভাবে লুকিয়ে আছে। অর্থাৎ সুখের সংসার হয়েও পরিবারটি শোষণহীন নয়। অর্থাৎ আপাত মিষ্টি মধুর গল্পটির অন্তর্নিহিত যুক্তির আড়ালে রয়েছে 'the rule of the patriarch' (পিতৃতন্ত্রের শাসন)।

একজন উচ্চশিক্ষিত রিসার্চ স্কলার মাঠে ময়দানে গ্রামে গঞ্জে আমার শুটিং দেখছিলেন দু'চারদিন ধরে। আমার ওই কথাটা— 'দ্য রুল অব দ্য প্যাট্রিয়ার্ক'— শুনে ভদ্রলোক তর্ক তুললেন, বললেন, 'এ কী বলছেন আপনি? মাটির মণিশ-এর একটি লাইনেও একথা নেই।'

আমি বলি, 'নেই ঠিকই, কিন্তু বানিয়ে আমিই-বা একথা বলতে যাব কেন!'

'তবে?'

'দেখুন, স্বীকার করবেন তো এটা একটা যৌথ পরিবার!'

'অবশ্যই।'

'কিন্তু এক অর্থে দুটো ইউনিট একই পরিবারে রয়েছে। অথচ খাওয়া-দাওয়া চলা-ফেরা খেত-খামারে কাজকর্ম করা একই সঙ্গে চলছে।'

'ঠিক!... বলুন।'

আমি ততক্ষণে একটা জায়গা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছি, বললাম, 'আপনি কি মনে করেন না যে এই যৌথ পরিবারের ছোট ভাইয়ের স্ত্রী একসঙ্গে এবং এক চালার নীচে থেকেও একটু বঞ্চিত।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভদ্রলোক বললেন, 'ছোট ভাইয়ের স্ত্রীর নতুন পরিবেশে একটু অমন হতেই পারে, পারে না কি?'

'তার মানে, নতুন স্ত্রী পরিবারটিকে ঠিক মানিয়ে নিতে পারছে না। মহিলাটি এখনও এ-বাড়ির কেউ হতে পারছে না, এখনও বাইরে, আউটসাইডার।'

'আউটসাইডার!'

'নিশ্চয়ই। তা ছাড়া, অঙ্কটা বুঝুন সোজা অঙ্ক। বড় ভাইয়ের ইউনিটে ওরা পাঁচজন। আর ছোট ভাইয়ের, দু'জন। মানবে কেন ছোট ভাই বা তার স্ত্রী! অধিকার কি দু'জনেরই এক নয়? খাওয়া-দাওয়া কৃষি কাজ সবই যেখানে এক।'

তর্ক এখানেই শেষ। আমরা কেউই কারওর যুক্তি মেনে নিতে পারছি না। এরপরে ভুবনেশ্বরে ছবিটি দেখিয়ে এক জব্বর আলোচনা এড়ানো গেল না। কেউ বললেন, 'ভাল', কেউ-বা বললেন, 'খুবই ভাল', আবার কারও মতে আমি মূল কাহিনিকে উলটে পালটে দিয়েছি। এ মোটেই ঠিক নয়, এ অন্যায়, স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে যা তা করেছি।

আমি খুশি যে এ-ছবিটি নিয়ে খোলাখুলি বিতর্ক হল। এক সুন্দর আলোচনা, সপক্ষে বিপক্ষে। একটি স্বাস্থ্যকর লক্ষণ।

ছবিটি আমার অবশ্য ভাল লেগেছিল। ছবিটিকে আমি ভালবেসেছিলাম, ছোট ভাইয়ের চরিত্রটিতে আমি নিজেকে খুঁজে পেলাম। সেই আকাশের উড়োজাহাজ, সেই রাতের স্বপ্ন, ভালবাসার দৃশ্য, সব...।

যথারীতি চলেনি ছবিটি। ব্যবসা করেনি। প্রযোজক, অর্থাৎ গুজরাতের সেই ভদ্রলোক, ওড়িশা থেকে কলকাতায় চলে এলেন। এসে বললেন, ছবিটির শুরুতে কিছুটা এদিকে ওদিক করা যাক, মাঝখানের কতকটা আর সব শেষে একদম বদলে দিন। আমি তাঁকে বললাম আমার নামটা পরিচালক হিসেবে রাখবেন না। এবং সেটা এখুনি। একদম মুছে ফেলুন সবকিছু।

অথচ নানা কারণেই 'মাটির মণিশ' আমার প্রিয় ছবি। গ্রামীণ গল্প হলেও নাগরিক মেজাজে ছবিটি সমৃদ্ধ। এই জন্যই মাটির মণিশ-এর মধ্যে আমি আধুনিকতার আন্দাজ পাই। ছবিটির অভিনয় আমাকে মুগ্ধ করেছে।

যখনই আমার ছবি চলেনি, ব্যবসা করেনি তখনই আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যেত। আমি ভাবতাম এটি আমার শবদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ছবি। আমি নিজেকে সরিয়ে নিয়ে নির্বাসনে গিয়ে বসে বসে ভাবতাম, বিশ্লেষণ করতাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নিজেকে আবার আত্মস্থ করতাম। চিন্তা করতাম গভীরে। ঠিক ওই কনসেনস্ট্রেশন ক্যাম্পের বন্দি বা কয়েদির মতো প্রায় মরে গিয়েও সেই ডাক্তারের মতো বলতে পারি আমার শরীরের গঠন মানুষের নয়—ঘোড়ার গঠনতন্ত্র। যতই প্রহার করো আমি মরব না।

একটি ভয়ংকর দিনে যুদ্ধের সময় জুলিয়াস ফুচিক জার্মান কনসেনস্ট্রেশন ক্যাম্পে শুয়েছিল, তাঁকে প্রচণ্ড প্রহার করে ফেলে রেখে দিয়েছিল। ডাক্তার এল ডেথ সার্টিফিকেট দিতে। ডাক্তার এসে রেগে গেল কারণ সে দেখল সেই বন্দি মরেনি প্রচণ্ড প্রহারের পরেও। রেগেমেগে ডাক্তার নোট দিয়ে গেল এই বলে যে এই লোকটার শরীরের গঠনতন্ত্র মানুষের নয়, এটা ঘোড়ার। একটি লাইনে একটি কয়েদির জীবনের বাস্তব সত্য বেরিয়ে এল (চতুর্থ অধ্যায়)।

অহেতুক আশাবাদী মানুষ আমি নই। তবুও আমি কোথাও-না-কোথাও আলো দেখতে পেতাম। সমস্ত বাতাসে যেন এক নতুন স্বাদ। এক নতুন হাওয়া। বাতাস নেই, স্নিগ্ধ বাতাস বইতে লাগল। আমার বন্ধু-বান্ধব পরিবর্তনের কথা ভাবল। আমিও ভাবলাম। কোনওরকম আপোশ নয় অথচ পরিবর্তন চাই। নতুন ভাবনা নতুন আঙ্গিক বা নতুন ভাবে কিছু বলা চাই। যে ধ্যানধারণার ওপর চলছিলাম সেখান থেকে সরতে হবে যেভাবেই হোক। এরকম একটা সংকটজনক মুহূর্তে আমি মরিয়া হয়ে গেলাম। যেটাই আসুক সেটাকে নিয়ে সমস্ত ভাবনা-চিন্তাকে ভেঙে তছনছ করে নতুন কিছু করার ভাবনায় আমি হাঁটতে লাগলাম।

এক সপ্তাহের জন্য হঠাৎই পুনায় যেতে হল। পুনা ফিল্ম ইনস্টিটিউটের একটি ওয়ার্কশপে। ছাত্রদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হবে বিভিন্ন ছবির বিষয়ে। সেখানে যাওয়ার পথে যেন ঈশ্বর প্রেরিত দূতের মতো আমার দীর্ঘকালের বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমি সকালের ফ্লাইটে মুম্বাই এলাম এবং ডেকান কুইন-এ সূর্য ডোবার আগের গাড়িতে পুনা রওনা হব। সুন্দর একটি ভ্রমণ অভিজ্ঞতা। আমি ভাবলাম আমার বন্ধু অরুণ কউলের সঙ্গে সকালবেলাটা আড্ডা মারব। অরুণ কাশ্মীরের ছেলে। সেখানেই বড় হওয়া। কিন্তু এখন মুম্বাইয়ের বাসিন্দা। অরুণ খুব ভাল বুদ্ধিটুদ্ধি দিতে পারে, কিন্তু আসল কাজ কিছুই হয় না।

অরুণ বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে ওর দু'কামরার অফিসে নিয়ে গিয়ে আমাকে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

একটা টেবিলের সামনে চেয়ারে বসিয়ে দিল। ঘরে একটা বাথরুমও ছিল, টেবিলের ওপর পাশের ঘর থেকে একটা টাইপ মেশিন আর একগুচ্ছ সাদা কাগজ এনে বলল, শোন, এতক্ষণ বলিনি। তোমাকে এখুনি একটি চিত্রনাট্য লিখে দিতে হবে। সেই অনেক আগে শোনা গল্পটার ওপর যেটা তুমি আমায় একবার বলেছিলে।

'চিত্রনাট্য। এখুনি। আমাকে ট্রেন ধরতে হবে।' বললাম আমি।

'ট্রেন ধরবে। চিন্তা নেই। এখনও চার পাঁচ ঘণ্টা সময় আছে।' বলল অরুণ।

'চিত্রনাট্য করতে চার ঘণ্টা সময় লাগবে। কোনও ব্যাপার নয়।' চেপে ধরল অরুণ।

'একটা চিত্রনাট্যের জন্য চার ঘণ্টা!' অবাক হলাম আমি।

'মোটামুটি একটা দশ-বারো পাতার আউটলাইন হলেই চলবে,' বলল অরুণ।

চিত্রনাট্যটা মোটামুটি আমার মাথায় ছিল, লেখাও ছিল কিছুটা, তবুও সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে নিতে হবে। এ স্ক্রিপ্টই হোক বা আউটলাইন হোক এ-কাগজগুলো একটি নির্বাচকমণ্ডলীর টেবিলে যাবে। তুমি কার কাছে এ প্রস্তাবটা রাখবে? বললাম আমি।

তখন অরুণ ব্যাপারটা খুলে বলল। ব্যাপারটা হল যে অরুণ একটি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া আন্ডারটেকিং-এর চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলেছে— অফিসটি হল ফিল্ম ফাইনান্স করপোরেশন। সেই চেয়ারম্যান বলেছেন একটি স্বল্প বাজেটের হিন্দি ছবি করতে হবে। অল্প বাজেটের ছবির অনেক সুবিধে।

ইতিমধ্যে চা এসে গেল। অরুণ বলে গেল, তোমার চা, দুপুরের খাবার সব এসে যাবে ঠিকঠাক। তুমি কাজটা শেষ করো। কথাটা বলে অরুণ বাইরে থেকে অফিস ঘরের তালা বন্ধ করে আমাকে জেলখানার বন্দির মতো রেখে চলে গেল। সে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা!

আমি সেই ফিল্ম ফাইনান্স করপোরেশনের চেয়ারম্যানকে চিনতাম। ইনি হলেন হিম্মৎ সিং। কৃষ্ণ মেননের কাছের মানুষ। লন্ডনে একসঙ্গে পড়াশুনো করেছেন। যদিও তিনি লন্ডনে পুরোপুরি নিজের পড়াশুনো শেষ করেননি। একবার তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়। নিপাট ভদ্রলোক।

যাই হোক, আমার কাজ ওই বন্ধ ঘরে বসে শেষ হল প্রায় ঘণ্টাতিনেক বাদে। শুধু আউটলাইন নয় আরও কিছু বেশি। ঠিক স্ক্রিপ্ট নয় অথচ স্ক্রিপ্টের মতো। নির্বাচকদের বুঝতে কোনও অসুবিধে হবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অরুণ কউল খুব খুশি হল। শুধু বলল ছবিটি হিন্দিতে হবে। এরা এরা অভিনয় করবে।

'হিন্দি!' আমি চমকে উঠলাম।

'ভুলে যেও না তোমার আগের ছবি মাটির মণিশ ওড়িয়া ভাষাতে তৈরি হয়েছে,' বলল অরুণ।

যাই হোক, মোটামুটি এই দাঁড়াল যে ছবিটি হিন্দিতে হবে। অভিনয় করবে উৎপল দত্ত এবং শেখর চট্টোপাধ্যায়। উৎপল দত্ত ও শেখর চট্টোপাধ্যায় নাটক ও ছবির মানুষ, অভিনেতা এবং আমার প্রিয় বন্ধু। নায়িকা বা ছবির নারী চরিত্র পরে ঠিক হবে। যদি সব কিছু ঠিক থাকে। যদি ফিল্ম ফাইনান্স সিগন্যাল দেয়। ছবির খরচ বহন করবে ফিল্ম ফাইনান্স।

ইতিমধ্যে ডেকান কুইন-এর টিকিট বাতিল করে পরের দিন সকালের ট্রেন ধরবার টিকিট এসে গেল আমার কাছে। সকালের ট্রেনটা ডেকান কুইনের মতো এত আরামের নয়। ফিল্ম ফাইনান্সের অফিস থেকে একটি অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম নিয়ে এল কউল। এই অফিসটার নাম এখন এন এফ ডি সি। ন্যাশনাল ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন।

গভীর রাত পর্যন্ত আমরা ছবিটি নিয়ে আলোচনা করলাম, বাজেট নিয়ে কথা বললাম। কত টাকা চাইতে হবে সেসব নিয়েও আলোচনা হল। অরুণ কউল ফর্মটি ফিল আপ করল, আমি সই করলাম। কাগজপত্রের কাজটা শেষ হয়ে গেল।

অরুণ কউল স্টেশনে এসে সকালবেলার ট্রেনে তুলে দিয়ে গেল। শুধু বলে গেল ইউনিট সাজাতে আর শিল্পী নির্বাচন করতে যেন ভুল না হয়। শুধু তাই নয়, যে নায়িকা হবে সে একটি মিষ্টি অল্পবয়সি মেয়ে হবে। গ্রাম্য মেয়ে। ভাবাই যায় না। এ ঘটনা ঘটেছিল একটি দিনের মধ্যে। চব্বিশ ঘণ্টায় সব কিছু ঘটে গেল।

হিম্মৎ সিং সময় নিলেন না। আমাকে সমস্ত ব্যাপারটা জানিয়ে ছবি শুরু করতে বললেন। পরবর্তীকালে এক কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসার আমাকে জানাল যে ইন্দিরা গাঁধী স্বল্প বাজেটের ছবির ব্যাপারে খুবই উৎসাহী ছিলেন। যাঁর জন্য ফিল্ম ফাইনান্সের টাকাটা ফেরতের ব্যাপারে কোনও গ্যারান্টি বা কোলেটারাল সিকিউরিটির ব্যাপারও শর্ত হিসেবে রইল না। ইন্দিরা গাঁধীর মনে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

হয়েছিল যে এটা একটা পরীক্ষা হিসেবে গণ্য করা হোক। ২১ অক্টোবর ১৯৬৮ সালে মুম্বাইয়ে ফিল্ম ফাইনান্সের অফিসে আমাকে এই ছবিটির মোট খরচের দুই-তৃতীয়াংশ টাকা একটি চেকে দিয়ে দেওয়া হল। ঘটনাচক্রে আমার ছেলের জন্ম হয়েছিল ২১ অক্টোবর দিনটিতেই, চোদ্দ বছর আগে। যখন সই-সাবুদ করছিলাম চেকটি পাওয়ার জন্য তখন আমার মনে ছিল না যে ওই দিনেই আমার ছেলে কুণাল জন্মেছে। গীতা টেলিফোনে কলকাতা থেকে আমাকে জানাল, মনে করিয়ে দিল। কুণালও খুশি হল। এই হল 'ভুবন সোম'-এর ইতিহাস, এ ছবি তৈরির ইতিহাস। একটি ছোট্ট কাহিনির ওপর নির্ভর করে ছবিটি তৈরি হয়।

কাহিনির রচয়িতা লেখক বনফুল। ছবিটি তৈরি হয় সাদা-কালোতে। অবশ্যই হিন্দিতে।

ভুবন সোম অনেক দিক দিয়ে আমার কাছে একদম নতুন। এটি আমার প্রথম হিন্দি ছবি। উৎপল দত্তেরও প্রথম হিন্দি ছবিতে অভিনয়। সুহাসিনী মূলে কোনও দিন মঞ্চে বা সিনেমায় অভিনয় করেনি। এমনকী স্কুলেও কোনও অভিনয় করেনি। বিজয় রাঘব রাও প্রথম একটা পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবিতে সুরসৃষ্টি করলেন। সেটাও আমার ছবি 'ভুবন সোম'-এ। কে কে মহাজন এ ছবিতে অসাধারণ কাজ করল। ইতিহাস সৃষ্টি করল। অমিতাভ বচ্চন এ ছবিতে নিজের গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর দিলেন প্রায় দেড় থেকে দু' মিনিট এবং প্রথম ছবিতে কিছু উপার্জন করলেন। অমিতাভ টাকা নিতে চায়নি কিন্তু আমি বাধ্য করলাম টাকা নিতে। তিনশো টাকা। এ ছবিটির মোট খরচ অবিশ্বাস্য। মাত্র দু' লক্ষ টাকা। যেটা আমরা চেষ্টা করেছিলাম সেটা আর কিছুই নয়, শুধু স্বল্প বাজেটের ছবি। এত অল্প খরচে ছবি তৈরি করা ছবির জগতে একটি রেকর্ড।

'ভুবন সোম' ছবিতে আছে ভুবন সোমেরই কথা। ভুবন সোম বিপত্নীক। রেল কোম্পানিতে উঁচুমাপের উচ্চপদস্থ আমলা, বয়স প্রায় অবসর নেওয়ার কাছাকাছি। ভুবন সোম বিশ্বাস করেন সেই পুরনো ন্যায়, নীতি, সততা, পরিশ্রম, নিয়মানুবর্তিতা, কর্তব্যপরায়ণতা এই সব মূল্যবোধে। কর্তব্যে গাফিলতি করলে কাউকে ছেড়ে কথা বলেন না। এমনকী, নিজের ছেলের সামান্যতম ত্রুটিও উনি ক্ষমা করেন না। বন্ধু-বান্ধবহীন এক বিশাল ব্যক্তিত্ব। ভুবন সোমের পৃথিবী তাঁর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অফিসঘর, অফিসঘরে ঠাসা ফাইল আর ক্রমাগত টেলিফোনে অফিস-সংক্রান্ত কথাবার্তা। সম্ভবত একটু একঘেয়েমির জগৎ থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য ছুটি নিলেন। ছুটি নিয়ে বেড়াতে গেলেন এক ভিন্ন পরিবেশে। যেটা তাঁর কাছে এক বিচিত্র যাত্রা। সেখানে মুক্ত আকাশ, মুক্ত বাতাস, পাখির কলকাকলি আর সমুদ্রের ধারে বালির পাহাড়। সেখানে একটি অল্পবয়সী মিষ্টি ও রহস্যজনক গ্রাম্য যুবতির সঙ্গে ভুবন সোমের কথাবার্তা, আলাপ। ছবির মূল বিষয় বলতে এই সব এবং আরও কিছু হয়তো। সবশেষে ভুবন সোম তাঁর সেই নিজের পৃথিবী, নিজের অফিসে ফিরে এলেন। কাউকে জবাবদিহি করতে হবে না, কারও প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে না। ছবির শুটিং যখন শুরু হল ইউনিটের সবাই শিশুর মতো আনন্দে কাজে মেতে গেল।

যেন কিছু শিশু এক উন্মাদনার খেলায় মেতেছে। সেট সেটিং যেটুকু না করলে নয়। আমরা উন্মাদনার পৃথিবীতে প্রবেশ করলাম। সেই উন্মাদনা আর কিছুই নয়, সেটা হল দক্ষতা, নিয়মানুবর্তিতার উন্মাদনা। কাজের পাগলামি।

একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। একটি দৃশ্যে সেই গম্ভীর ভুবন সোম সেই শক্তপোক্ত আমলা নিজের পৃথিবী অর্থাৎ অফিসে ফিরে এলেন। সত্যি কথা বলতে কী, এ দৃশ্যটা কীভাবে করব ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। তিনি কি দুঃখী হবেন না অসুখী হবেন, না তিনি লোকের কাছে হাস্যস্পদ হবেন। কিছুই ঠিক করে উঠতে পারছিলাম না। বেশ কঠিন ব্যাপার যেটা বলে বোঝানো যাবে না। ব্যাখ্যা করে বোঝানো যাবে না, অনুভূতির ব্যাপার। আমি উৎপলের দিকে তাকালাম এবং ওঁর কাছে গেলাম। উৎপলকে একধারে একটু আলাদা করে নিয়ে বললাম আমি তখন মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিলাম। সেই ১৯৫১ সালে ঝাঁসির একটা হোটেলে, নির্বাসনে। কীভাবে আমি নিজেকে সেই হোটেলের ঘরে বন্দি করে রেখেছিলাম, ভাবতে পারি না। সেই হোটেলের ঘরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে জামাকাপড় ছেড়ে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়ালাম। আয়নায় মুখ ভ্যাংচালাম, চিৎকার করলাম উন্মাদের মতো এবং শেষে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললাম। সারা শরীরে ঘাম ঝরছে দরদর করে। তিনদিন বাদে আমি কাজে ইস্তফা দিলাম।

উৎপল একটি কথাও বলল না, শুধু আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর শান্তভাবে আমার হাতটা চেপে ধরল। আমাকে দশ মিনিট সময় দাও। কথাটা বলে উৎপল আমার ঘর ছেড়ে চলে গেল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

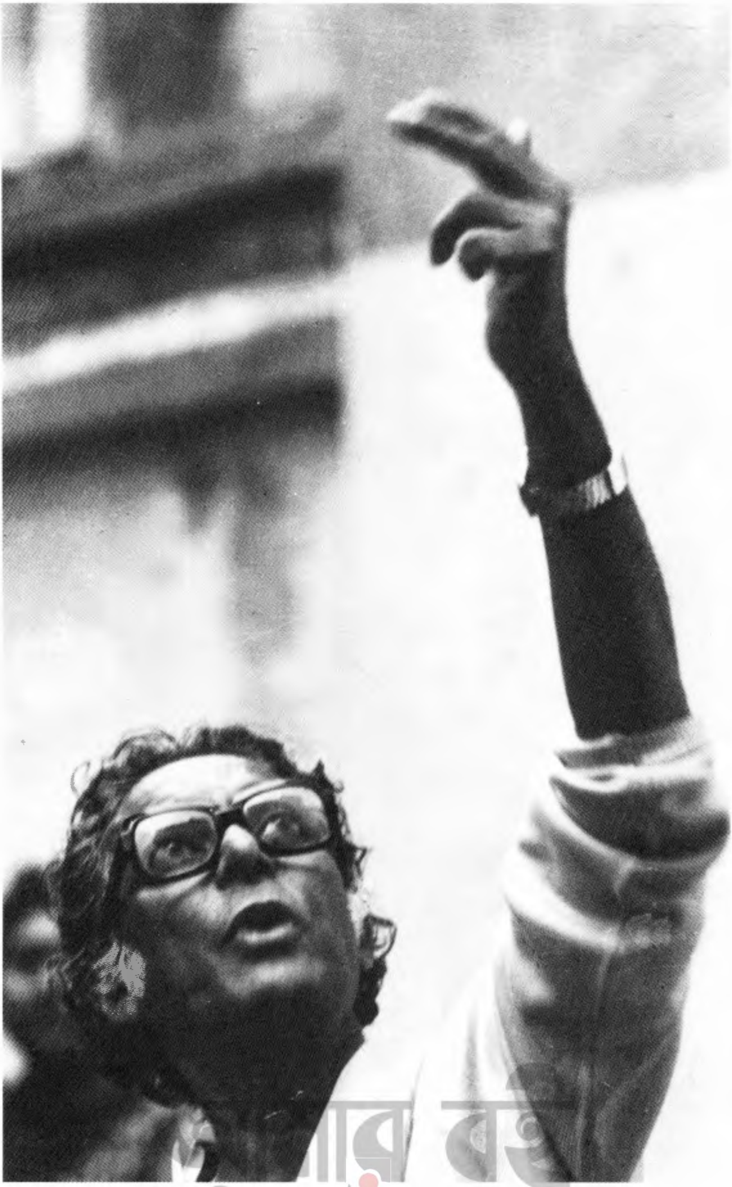

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'নীল আকাশের নীচে': মঞ্জু দে ও কালী বন্দ্যোপাধ্যায়

'বাইশে শ্রাবণ'-এ মাধবী

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

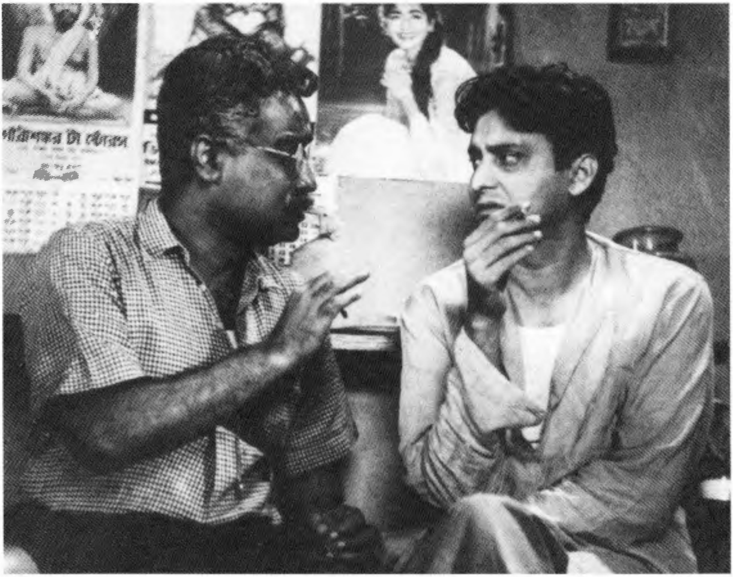

'আকাশকুসুম'-এ জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

'ভুবন সোম'-এ উৎপল দত্ত ও সুহাসিনী মুলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

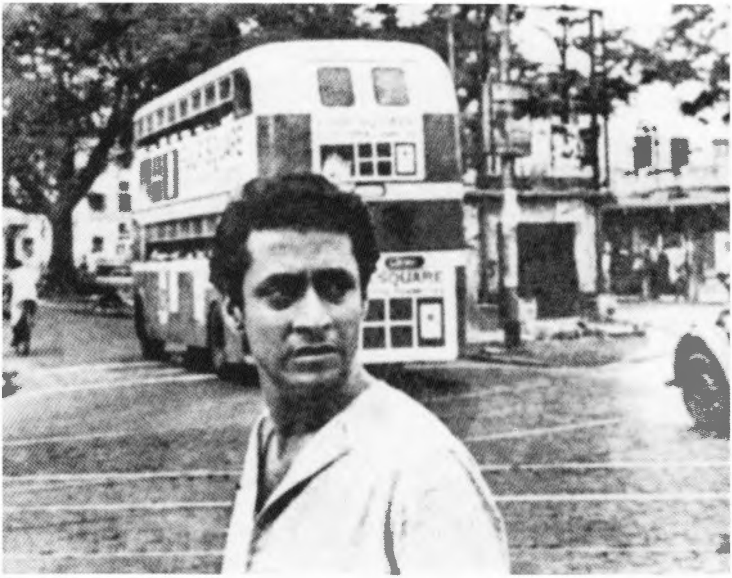

'ইন্টারভিউ': রঞ্জিত মল্লিক

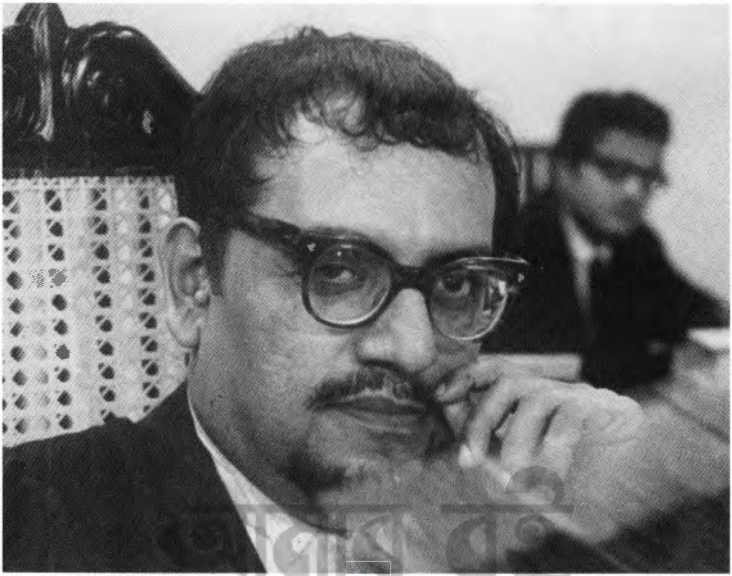

'কলকাতা ৭১': উৎপল দত্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

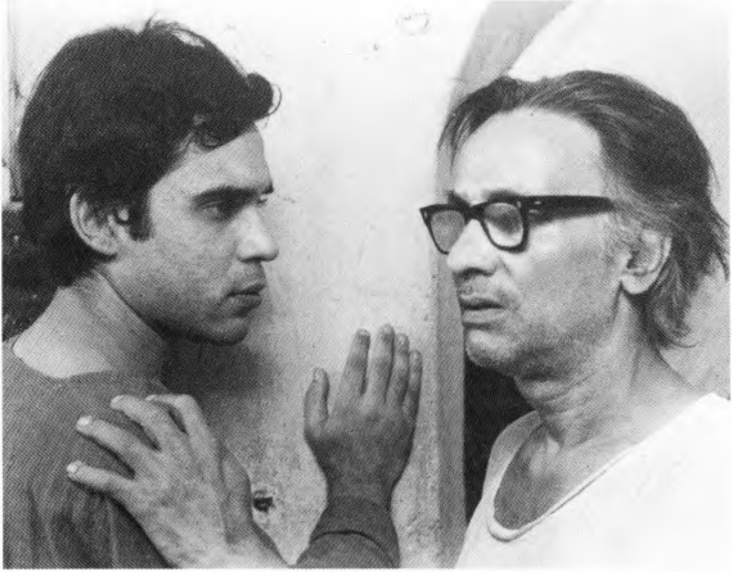

'পদাতিক'-এ ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায় ও বিজন ভট্টাচার্য

'কোরাস'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'মৃগয়া': সাঁওতাল দম্পতি: মিঠুন চক্রবর্তী ও মমতাশংকর

'মৃগয়া'-য় মিঠুন চক্রবর্তী

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

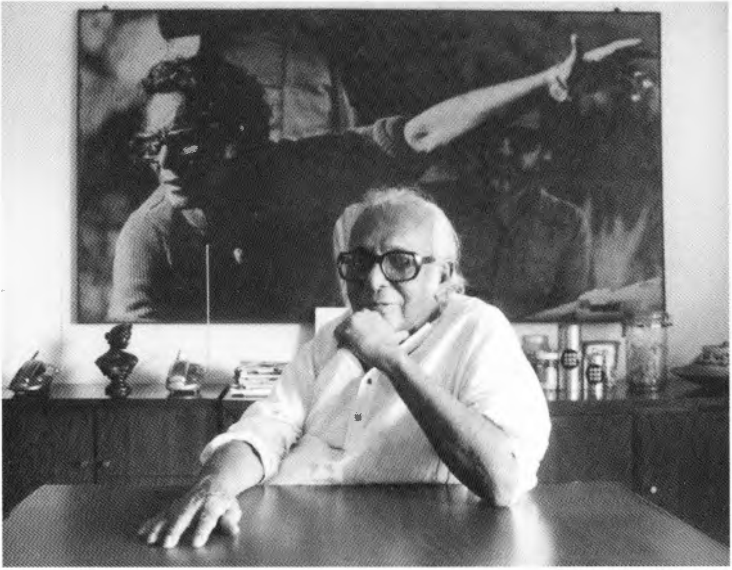

২০০৯। বসে আছি নিজেরই স্থিরচিত্রের সামনে: ’৭৫-এ ‘মৃগয়া’র শুটিং

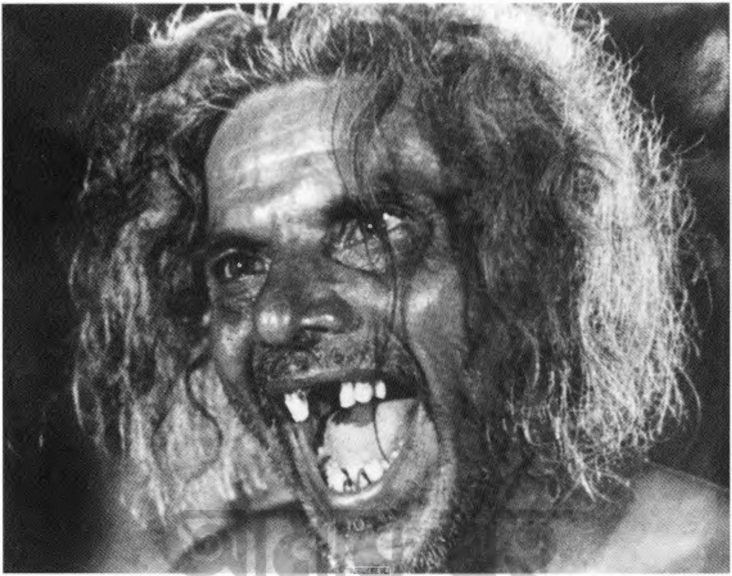

‘ওকা উড়ি কথা’-য় বাসুদেব রাও

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

‘একদিন প্রতিদিন’-এ গীতা সেন ও কৌশিক সেন

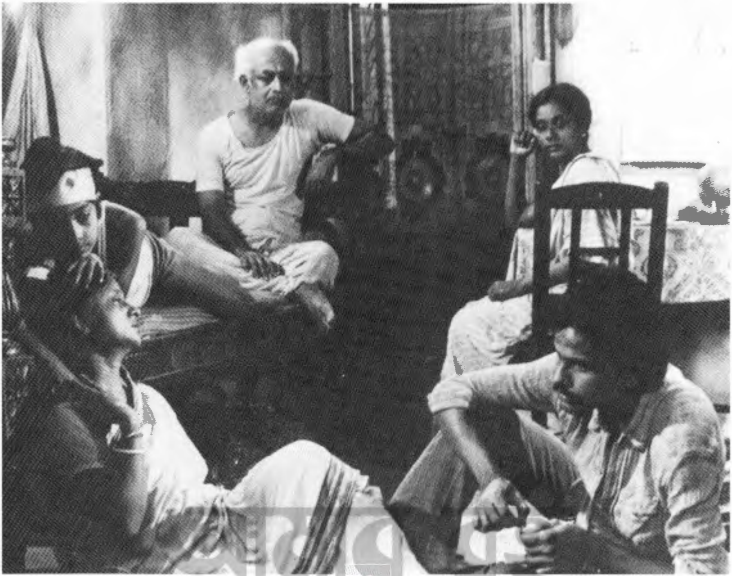

‘একদিন প্রতিদিন’-এ গীতা সেন, কৌশিক সেন, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীলা মজুমদার প্রমুখ

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

‘আকালের সন্ধানে’-র লোকেশন-এ শুটিং দেখতে এসেছেন চিলি-র বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার মিগেল লিতিন

ছবি তৈরির ছবি ‘আকালের সন্ধানে’: নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত, স্মিতা পাটিল, দীপঙ্কর দে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'আকালের সন্ধানে': গীতা সেন, স্মিতা পাটিল, শ্রীলা মজুমদার

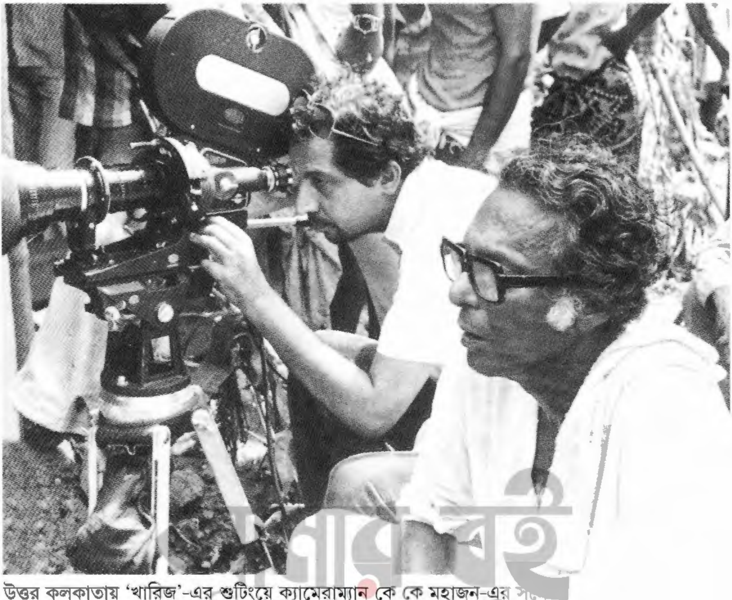

উত্তর কলকাতায় 'খারিজ'-এর শুটিংয়ে ক্যামেরাম্যান কে কে মহাজন-এর সঙ্গে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'খারিজ'-এ শ্রীলা মজুমদার ও মমতাশংকর

'খারিজ'-এ শিশুশিল্পীরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কলকাতায় 'খারিজ'-এর শুটিংয়ে এসেছেন জিন মাসকোভিচ, এড্রিয়েন মানসিয়া, এলিয়ান... বিদেশের সংস্কৃতি জগতের বন্ধুবান্ধব

ধ্বংসস্তূপে জীবনের ছবি: 'খণ্ডহর'। শাবানা আজমি, গীতা সেন, পঙ্কজ কপূর, নাসিরুদ্দিন শাহ। ২০১০-এর কান উৎসবে ধ্রুপদী বিভাগে দেখানো হয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'খণ্ডহর': ইউনিটের ছেলেরা ছিটিয়ে ছড়িয়ে নতুন শট্-এর প্রস্তুতি নিতে ব্যস্ত। অপেক্ষারত শাবানা-র সঙ্গে

রাজস্থান। 'জেনেসিস'-এর শুটিংয়ে শাবানা আজমি-র সঙ্গে। সামনে পাকিস্তান

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'জেনেসিস'-এ ওম পুরী, শাবানা আজমি, নাসিরুদ্দিন শাহ

'একদিন অচানক'-এ উত্তরা বাওকার, শাবানা আজমি, রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, অর্জুন চক্রবর্তী

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

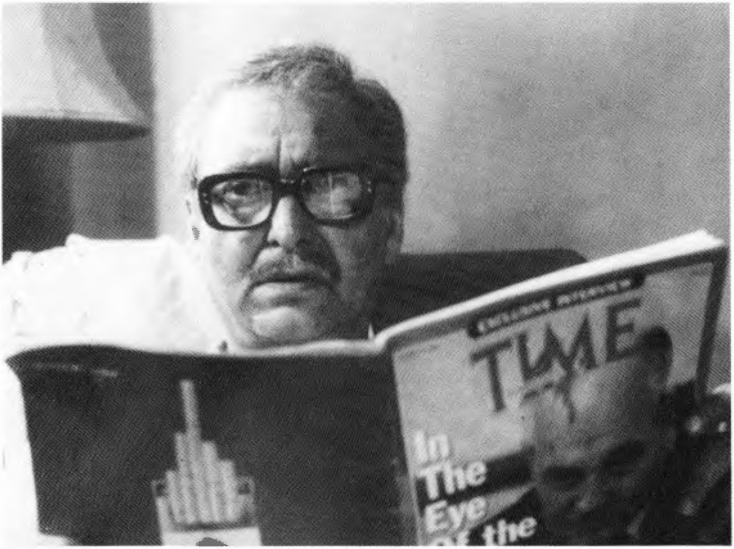

জার্মান প্রাচীর ভেঙে পড়ার পটভূমিতে কলকাতার পারিবারিক সংকটের ছবি 'মহাপৃথিবী': সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

'আমার ভুবন'-এ কৌশিক সেন ও নন্দিতা দাশ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রবিশংকরের সঙ্গে প্যারিস-এ, 'জেনেসিস'-এর আবহসংগীত রেকর্ডিং-এ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

এরপর ছবিতে যে অভিনয়, যে শব্দের ব্যবহার যা ঘটল, যে ভুবন সোমের সেই বিচিত্র অনুভূতি, সেই উপলব্ধি যা ব্যাখ্যা করা যায় না। একটা বিষাদ, একটা চাপা যন্ত্রণা। তিনি বুঝতে পারলেন এতগুলো বছর একটা কর্তব্যপরায়ণ আমলা হয়ে কাজ করে গেছেন একটা জেলখানার কয়েদির মতো। তাঁর জীবন শুধু কাজ আর কাজ, শুধু ফাইল আর ফাইলের পাহাড় আর একটার পর একটা টেলিফোন বেজে ওঠা। সেই জায়গা থেকে পালাতে হয়েছিল ভুবন সোমকে। কী ভয়ংকর!

এডিটিং টেবিলে কোনও অসুবিধে হল না। বিন্দুমাত্র অসুবিধে হল না। কিন্তু সেই স্ক্রিপ্ট-টা বা আট পাতার আউটলাইনের সঙ্গে আমার ছবির শুটিং-এর আক্ষরিক অর্থে কোনও মিল রইল না।

আমি আশ্বস্ত হলাম যে কেউ আমাকে কিছু বলল না। ফিল্ম ফাইনান্স করপোরেশন একটি কথাও বলল না। কিন্তু আইনগত সমস্যা দেখা দিল। কারণ ততদিনে বি কে কারাঞ্জিয়া ফিল্ম ফিনান্সের কর্তা ব্যক্তি হয়েছেন। তাঁর সম্মতি দরকার। বি কে কারাঞ্জিয়ার ছবিটি ভীষণ ভাল লেগেছিল কিন্তু তাঁর সেক্রেটারি একটি প্রশ্ন তুললেন। ছবিটি তৈরির চুক্তিতে একটি কথা ছিল সেটি হল পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবির যে ন্যূনতম দৈর্ঘ্য থাকা দরকার সেটা থাকতে হবে। কিন্তু ভুবন সোম ছবিটি বেশ ছোট ছবি ছিল যে-কোনও ভারতীয় ছবির তুলনায়। সমস্যাটা মিটে গেল কারাঞ্জিয়ার একটি ছোট্ট কথায়। তিনি বললেন, 'আমাদের কী দরকার! ভালো ছবি, না দীর্ঘ ছবি?'

কিছু কিছু বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও দর্শককে ছবিটি আলাদা আলাদা করে গোপনে দেখানো হল। সে-সব দর্শকরা ভূয়সী প্রশংসা করলেন। যাকে বলা হয় ইনস্‌পায়ার্ড ননসেন্স, সেই ইনস্‌পায়ার্ড ননসেন্স-কে বুকে করে নিলেন। আমাদের এই শহরেও ছবিটি দেখানোর ব্যবস্থা সহজেই হয়ে গেল। ছবিটি যাতে ব্যবসা করতে পারে সে চেষ্টাও হল। প্রথম দিন প্রথম শো-তে তেমন দর্শক টানা গেল না। হলের ম্যানেজার দারুওয়ালা ছবির ব্যবসায়িক ভাগ্য সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না। আমরা আশা ছেড়ে দিলাম। তবুও আশায় আশায় রইলাম যদি একটা কিছু হয়। শো যেই শেষ হল দর্শকরা ছুটে এলেন। আমরা হলের বাইরে অপেক্ষা করছিলাম। দর্শকরা আমার দিকে দৌড়ে এসে ঘিরে ধরলেন আমাকে। সমস্ত দর্শকরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে লাগলেন ভুবন সোম ছবিটির। প্রশংসা, স্তুতি সব মিলিয়ে মিশিয়ে ভয়ংকর অবস্থা। এতো ভিড়

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

হয়ে গেল যে ভিড় আর সামলানো যাচ্ছিল না। উন্মাদনা দর্শকদের ভেতর। চিৎকার চেঁচামেচি। আমি বিস্ময়ে হতবাক। আমার এই ছবির পরিবেশক অসীম দত্ত আমাকে একরকম জোর করে ভিড় থেকে বের করে নিয়ে চলে এলেন বিখ্যাত কফি হাউসে। সেই সিনেমা হল থেকে কফি হাউসটি একদম কাছে। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল একের পর এক। দীর্ঘ দু'বছর কী গেছে আমার। অরুণ কউলের সেই মুম্বাই-এর অফিসের কথা যেখানে আমি অফিসঘরে বন্দি হয়ে স্ক্রিপ্ট তৈরি করেছিলাম। আবার সেই ছবির জন্যই এরকম দর্শকদের ভয়ংকর ভালবাসা। অসীম দত্ত আমাকে বাঁচালেন সে পরিস্থিতি থেকে। এ যেন স্বপ্ন!

ছবিটি ভীষণভাবে সাড়া দিল। নানা আলোচনা নানা জায়গায় বিশেষত বড় বড় শহরে। যদিও একেক জন একেক রকম ব্যাখ্যা করেছেন। ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন মতামত আমাকে উৎসাহ দিচ্ছিল। আমি আমাকে আবিষ্কার করতে পারছিলাম বারবার নতুনভাবে।

এবারে যখন ভেনিস গেল 'ভুবন সোম' তখন সঙ্গে আমি।

কলকাতায় যখন ফিরলাম একদিন বিকেলে দু'জন ভদ্রলোক আমার কাছে এলেন একজন আমার বন্ধু আর একজন বহুদিনের ফরাসি দেশে বসবাসকারী লোকনাথ ভট্টাচার্য। ইনি 'পথের পাঁচালী' ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করেছেন। অনুবাদে সাহায্য করেছেন লোকনাথ ভট্টাচার্যের ফরাসি স্ত্রী এবং আর একজন মহিলা নাতালি সারৎ।

নাতালি লেখিকা, নতুন উপন্যাসের স্রষ্টা। নাটকও লিখেছেন। নাতালি কলকাতায় এলেন তাঁর উকিল স্বামীকে নিয়ে। এদের সবাইকে 'ভুবন সোম' দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন আমার এক বন্ধু। এরা সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে আমার বাড়ি চলে এলেন। শুধু এলেন না উকিল ভদ্রলোক। উনি হোটেলে চলে গেলেন।

সেই ভদ্রমহিলা দু'মিনিট ফরাসিতে কথা বলেই বুঝতে পারলেন যে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইংরেজিতে কথা বলতে শুরু করলেন। লজ্জিত হয়ে ক্ষমা চাইলেন ফরাসিতে কথা বলবার জন্য। সত্যি কথা বলতে কী, ভুবন সোম ওর ভাল লেগেছিল। প্রতিক্রিয়া জানালেন এত সহজে, ভাবাই যায় না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বললেন, একটি মিষ্টি সহজ গ্রাম্য মেয়ের এক আমলার সঙ্গে কথাবার্তা। যে কথাবার্তার মধ্যে কোনও নোংরামি নেই। বরং কত সহজ সরল সুন্দর করেই না এক ডাকসাইটে আমলাকে হারিয়ে দিল মেয়েটি। কতই না স্বাচ্ছন্দ্যে! একটি মনোমুগ্ধকর কাহিনি এবং ভীষণ মানবিক কাহিনি। ব্যস, ওই পর্যন্তই।

সত্যজিৎবাবু একটি লম্বা রচনা লিখলেন। ভুবন সোম ছবিটি সম্পর্কে একটি মন্তব্য করলেন। হয়তো এ মন্তব্য পুরোপুরি মেনে নেওয়া যায় না তবুও তিনি লিখেছিলেন তো...।

সত্যজিৎ রায়ের কথায়, ভুবন সোম অন্য স্বাদের ছবি। বেশি দর্শকের দরবারে পৌঁছোতে পারেনি, যতটুকু পেরেছে ওইটুকুই। এবং চালু কনভেনশনের ওপর নির্ভর করে ছবিটি তৈরি হয়েছে। সবই আছে ছবিতে: মিষ্টি মধুর এক নায়িকা, জমজমাট আবহ-সংগীত, কিছু বা রমণীয় দৃশ্য। দৃষ্টিনন্দন এবং সব কিছু ছাপিয়ে ইচ্ছাপূরণের খেলা। সাফল্যের মন্ত্রগুপ্তি। এই সব বলে সত্যজিৎ টেনে আনলেন সাত-শব্দের সংক্ষিপ্তসার: 'বিগ ব্যাড বুরোক্র্যাট রিফর্মড বাই রাসটিক বেল'। বাক্যটি সত্যজিৎ রায়ের নিজস্ব কিনা আমার জানা নেই। হলেই ভাল, কিন্তু আমরা শুনেছি যে এক কালে হলিউডে গল্প-প্রসঙ্গে ওই কথাটাই নাকি ব্যবহার করত: 'Big Bad Bureaucrat Reformed by Rustic Belle.'

এসব নিয়ে আমি কোনও তর্কে অবশ্যই যাব না, কিন্তু শুধু একটিই কথা। আমাদের এই ডাকসাইটে আমলাটিকে আমি সংশোধন করব না, করার প্রয়োজন দেখি না, কারণ এই মহাশয় ব্যক্তিটির মধ্যে আমি খুঁজে পেয়েছি এক বিশিষ্টকে। তিনি রাগী ও কটুভাষী অথচ আড়ালে-আবডালে নিঃসঙ্গ ও দুঃখী।

ক্যারিকেচার অথবা বারলেস্ক, যাই বলি না কেন, যা কিনা ছবিটির সর্বাঙ্গে লেপটে রয়েছে, তাঁকে, এই ভদ্রলোকটিকে, কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায় ভাবি, উৎপল দত্তর শেষ দৃশ্যের কথা ভাবি, ভাবি ঝাঁসি হোটেলের ঘরে নিজেকে বিবস্ত্র করে কেন ওই পাগলামি, ভাবি কেনই বা ওই ট্র্যাজিক উল্লাসে মেতে উঠেছিল ভুবন সোম, ভাবি নিজের কথা-ও, ওখানে, ঝাঁসির হোটেলে। যাই হোক না কেন, সত্যজিৎ রায় কথিত Wish-fulfilling screen story জাতের হালকা মন্তব্য মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

একবার মুম্বাই-এ প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার রাস্তায় ট্যাক্সিতে যাওয়ার পথে কথায় কথায় এক ট্যাক্সি ড্রাইভার সবাইকে গালমন্দ করছিল। অনর্গল বকে চলেছে... মুখ্যমন্ত্রী গুণ্ডা বদমায়েশ সবাইকে। সময়টা ছিল অফিস টাইম। এক সময় আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কী ভুবন সোম ছবিটা যেটা এখন চলছে সেটা কি দেখেছ!

ওই একটা মেয়ের কাহিনি তো! আমি দেখেছি। হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে বলল, সুন্দর ছবি। তারপর গাড়িটাকে থামিয়ে বলল, 'আপনি কি মৃণাল সেন?'

আমি মাথা নাড়লাম। সে আমাকে হাতটা বাড়িয়ে করমর্দন করল। করেই চলল। ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে আছে। অফিস টাইম। অন্য গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে গেছে। গাড়িগুলো চনমন করছে, শোরগোল তুলে দিয়েছে।

আবার ট্যাক্সি চলতে শুরু করল। দশ মিনিটের মধ্যে আমি গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেলাম। আর একটি কথাও সে বলল না। অবাক করা ঘটনা ঘটে গেল, শুধু ট্যাক্সি থেকে নামবার পর ভাড়াটা সে প্রত্যাখ্যান করল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সপ্তম অধ্যায়

গীতা খুব খুশি হয়েছিল। গীতা বলত, দুই সোম আমাকে ভরাডুবি থেকে বাঁচিয়েছে। বাপের বাড়িতে গীতার পদবি ছিল সোম। আর অন্যটি ভুবন সোম। কুণালের জন্মদিনে ফিল্ম ফাইনান্স করপোরেশনের সঙ্গে চুক্তি হল, সেই নতুন ছবির ব্যাপারে—'ভুবন সোম'। ব্যাপারটা কিছুতেই ভুললে চলবে না, সাবধান করে দিয়েছিল কুণাল। আমি দুটোই মেনে নিয়েছিলাম। শুধু তাই নয় আমার পরিচিত মহলে বন্ধুবান্ধবদের কাছে ছবির বাণিজ্যিক সফলতা সম্পর্কে আমার কদর বেড়ে গেল। যদিও এ ব্যাপারে আমি আজও নিশ্চিত নই। কিন্তু প্রায়ই, আমার কাছে প্রযোজকদের প্রস্তাব আসত, বিশেষত মুম্বাই থেকে। দু'জন প্রযোজক মুম্বাই থেকে আমার কাছে এসেছিলেন। এঁরা খুবই উৎসাহী ছিলেন ছবি করার ব্যাপারে। তৃতীয়জন কোলিয়ারির মালিক, যিনি আমাকে দিয়ে ছবি করাতে চেয়েছিলেন।

সবাই আমাকে লোভনীয় প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু দুটো শর্ত ছিল। যে ধারা চলছে ছবি তৈরির, সে ধারাকে লঙ্ঘন করা যাবে না। দ্বিতীয়ত অল্প বাজেটের ছবি। উপরন্তু ছবি হিন্দিতে তৈরি করতে হবে। ঠিক 'ভুবন সোম'-এর মতো। এদের যুক্তি ছিল ব্যবসায়িক সাফল্যের কাছে আর কোনও সাফল্যই কিছু নয়। স্বাভাবিক কারণে আমার অবস্থা ভাল হল না ও খারাপও হল না। আমি সেই তিমিরেই রয়ে গেলাম। সুতরাং লড়াই চলতেই লাগল।

রাজনৈতিক সংগ্রামে ১৯৬৭ সালের সেই সময়টা উত্তরবঙ্গের সেই অভূতপূর্ব অগ্নিঝড় সমগ্র দেশে ছড়িয়ে গেল। কৃষি উৎপাদনের জায়গায় চাষি, ভাগচাষির যেখানে অর্থের সংস্থান হয়, সেখানে শুরু হয়ে গেল নকশাল আন্দোলন।

১৯৩০ সালে মাও সে তুং বলেছিলেন, একটি আগুনের ঝলকানি বিশাল

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে দিতে পারে। এই শ্লোগানটি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল নকশালবাড়ি আন্দোলনের কর্মী ও সমর্থকদের কাছে। শহর ও গ্রামেগঞ্জে দেওয়ালে দেওয়ালে শ্লোগানটি লেখা থাকত। ঠিক বা বেঠিক যাই হোক না কেন এ আন্দোলন শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়ে গেল। অর্থাৎ অর্থাৎ চারিত্র্যটা তার নাগরিকই রয়ে গেল। শহর মানে কলকাতা শুধু নয়, ভারতের অন্যান্য শহরেও এ-আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল। আন্দোলনের ব্যাপারটা সারা পৃথিবীর মানুষজনও জেনে ফেলল।

এদিকে লাতিন আমেরিকাতে শান্তির জন্য লড়াই করতে গিয়ে মানুষ কলোনিয়াল সিস্টেমকে অনবরত আঘাত করতে শুরু করল। ফার্নান্দো সোলানাসের তথ্যচিত্র *The Hour of the Furnaces* দেখে আর্জেন্টিনার মানুষেরা বলল, আমরা যুদ্ধের চাইতে শান্তিকে বেশি ভয় পাই।

সেই দশক ছিল প্রতিবাদের দশক। প্রতিবাদের ভাষা ছিল হিংসা।

অন্যদিকে ইউরোপে এই প্রতিবাদের ধরনটা বেশিদিন টিকল না, কারণ তার চেহারাটাই ছিল রোমান্টিক। বরং পৃথিবীজুড়ে পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারটাই বেশি প্রচার পেল। প্রতিবাদ ও হিংসার আগুন জ্বলতেই লাগল। পুলিশের একচেটিয়া অত্যাচারে মানুষের মধ্যে উন্মাদনার সৃষ্টি হল। এই শহরের বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের যুবকদের একটি বড় অংশ এই ঝড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল। কুণাল তখন স্কুলে। স্কুল থেকে কুণাল একদিন একটা গোপন লিফলেট নিয়ে এল। এনে লুকিয়ে রাখল। কুণালের অবর্তমানে আমি লিফলেটটা একদিন চুপিচুপি পড়লাম। আবার নিঃশব্দে কুণালের ড্রয়ারে রেখে দিলাম।

একটু দুশ্চিন্তায় পড়লাম। গীতার বাস্তববোধ বেশি, তাই গীতা বলল, এ নিয়ে কোনও কিছু না বলতে। এ নিয়ে চুপ করে থাকাই ভাল।

নকশাল আন্দোলনের সময় একটা শ্লোগান কলকাতার আকাশে বাতাসে ঘুরে বেড়াত। শুধু কলকাতা বললে ভুল হবে, বৃহত্তর কলকাতা, গ্রামাঞ্চল, মফস্‌সল সর্বত্র একটাই শ্লোগান শোনা যেত। সেটা হল: 'সত্তরের দশক মুক্তির দশক।'

অধুনা বাংলাদেশের ভারতীয় যুবকরা যারা এ আন্দোলনে জড়িয়ে ছিল তাদের শ্লোগান ছিল: 'ভাত দে হারামজাদা।' যদিও এটা পরে এসেছে কারণ তখন বাংলাদেশের মানুষেরা পাকিস্তানের নাগপাশ থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করছে। ভারত সরকারও তখন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। নতুন সার্বভৌম রাষ্ট্র তৈরি হল।

আমার এই ছবি তৈরির ছোট রাজত্বে তখন আমার ইউনিটের কর্মীরা ছবি করতে চাইছে। টাকা থাকুক না থাকুক। ব্যাপারটা এমন দাঁড়াল যে, অল্প টাকাতেও ছবি হোক।

কে কে মহাজন যে ক্যামেরার কাজ করেছিল 'ভুবন সোম'-এ পাখি আর সমুদ্র নিয়ে, সে একটা চিঠি লিখল।

জানতে চাইল: কবে কখন কোথায় শুরু হচ্ছে নতুন ছবির কাজ। আমি জানালাম শিগগিরিই।

'কত তাড়াতাড়ি?' বলল কুণাল।

'তাড়াহুড়ো করবে না। তুমি আগে দেখ যে পুরো চিত্রনাট্যটা শেষ হয়েছে কি না,' বলল গীতা। শুটিং লোকেশনে বা স্পটে গিয়ে ঠিক করতাম কখন কী করব। কীভাবে করব, শুধু লোকেশনে আমি যা যা বলতাম মহাজন ঠিক ঠিক তাই করে ফেলত। নীরবে সেরে ফেলত সমস্ত টুকিটাকি কাজ।

একজন চিত্রপরিচালক ও ক্যামেরাম্যানের মধ্যে ঠান্ডা লড়াই সাধারণত চলে। আমাদের দু'জনের মধ্যে সেসব কিছু ছিল না বললেই চলে শুধু দু'-একটি সময় ছাড়া।

'ভুবন সোম' করবার সময় মহাজন সব কাজ ঠিক ঠিক করেছে। অতি সহজেই সেসব কাজ উতরে গেছে। তারপর থেকে যতগুলো ছবি করেছে সেটা ওর প্রথম ছবি হলেও। আমার সঙ্গে '৮৯ সাল পর্যন্ত আমরা কাজ করে খুবই আনন্দ পেয়েছি। মজার ব্যাপার হল লোকেশনে মহাজনের আগে আগে আমি হাঁটতাম।

বেশ তাড়াতাড়ি হাঁটতাম। শুধু তাই নয় ইউনিটের সবার আগে আগে হাঁটতাম। পরবর্তীকালে মহাজন এবং ইউনিটের সবাই একমত হল যে আমি সবার চাইতে বয়সে ছোট। কাজ করা এবং আমার হেঁটে চলা কুড়ি বছরের যুবকের মতো। সুতরাং আমি কুড়ি বছরের যুবক। অনেকে আমাকে জিজ্ঞেসও করত: এ জন্যেই বুঝি আপনার 'কলকাতা ৭১'-এ যুবকটির 'কুড়ি' বছর বয়সটা ঘুরে ফিরে এসেছে? পরবর্তীকালে কাজ করতে গিয়ে মহাজনের কণ্ঠনালিতে সমস্যা হল কিন্তু তবুও সে সিগারেটের নেশা ছাড়তে পারল না। তার কণ্ঠস্বর

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চিরকালের জন্য হারাল। সময় ছিল ২০০১। তাই নিয়েই আরও ছ' বছর চালিয়ে গেছে। সে এক সর্বনাশের দিন আমার।

যাই হোক, আশিস বর্মনের লেখা একটি গল্পের ভাবনা নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি একটি ছবির চিত্রনাট্য তৈরি করলাম। কিছু কিছু জায়গায় ফাঁকা ফাঁকা অংশ রেখে গেলাম চিত্রনাট্যের স্বার্থে। যেমন মাছের বাজার, সেলুন, দোকান, ট্রাম, বাস, পুলিশথানা, বহুজাতিক কোম্পানির কনফারেন্স রুম।

ওসব ফাঁকা অংশ পরে ভরা হবে আঁকাড়া বাস্তব থেকে। সত্যিকারের পুলিশ, বড় অফিসার, সাধারণ মানুষরাই অভিনয় করবে। এঁদের ব্যবহার করা হবে ছবিতে কাজ করার জন্য। ততটা অভিনয় না হলেও চলবে। নিজেদের কথা এঁরা নিজেরাই বলবে।

সাধারণ মানুষের পাশাপাশি সমাজের মাতব্বরেরাও ছবিতে সবসময়ই হাঁটাচলা করবে। নিউজরিলের কিছু কিছু অংশও থাকবে, যেসব অংশে রাজনৈতিক ডামাডোলের ব্যাপারগুলো থাকে। এগুলো আমি ক্যামেরায় বন্দি করে রাখি। তেমন কোনও চিন্তা ভাবনাও তখন থাকে না। পরে ব্যবহার করি আমার ছবিতে। সমস্ত ব্যাপারটা এডিটিং টেবিলে গিয়ে একটা চেহারা নেয়। ছবিটা দাঁড়িয়ে যায়।

একটি গল্প। কয়েক লাইনের গল্প। একটি যুবক মোটামুটি মাইনে পায় মাস গেলে। সে যুবকটি একটি বহুজাতিক কোম্পানিতে ইন্টারভিউ পেল।

সেই বহুজাতিক কোম্পানিতে নায়কের ইন্টারভিউ হয়ে যাওয়ার পর ছবির চারিদিকেই যেন আরও একটা ইন্টারভিউ। একজন, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নায়ককে তাড়া করে ফিরছে, যার গলাই শুধু শোনা যাচ্ছে, যাকে দেখা যাচ্ছে না, সেই মানুষটিই ছবির শেষে ইন্টারভিউ করে নায়ককে। শেষ পর্যন্ত ছবিটা ভয়ংকর একটা মোড় নেয়, যাকে এককথায় বলা যায়: ফ্যাক্ট-ফিকশন-ফ্যান্টাসি। অ্যালবার্ট জনসন, ক্যালিফোর্নিয়ার সিনেমার অধ্যাপক, কৃষ্ণাঙ্গ, ছবিটি দেখে বললেন: 'That was a novel way of understanding the times and history.'

দু'-আড়াই মাস সময় নিল 'ইন্টারভিউ' ছবিটি তৈরি হতে। সমস্ত শুটিং হল এই শহরেই, নায়ক সহ সব চরিত্রই নতুন, আনকোরা, এই প্রথম ক্যামেরার সামনে এল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সেটা ছিল গরমের সময়। ঘাম ঝরছে। পাগলের মতো কাজ করছি। এডিটিং, মিক্সিং, সব কিছু। কারণ ছবি খুব তাড়াতাড়ি সিনেমাহলগুলিতে রিলিজ হওয়ার কথা ছিল।

ছোট করে বলতে হয় এ ছবির শুরুর কাহিনি। ছবি তৈরির মাসখানেক আগে টাকা পয়সার ব্যাপারটা অনিশ্চিত ছিল। অথচ আমরা সবাই তৈরি। এর মধ্যে হঠাৎই দুটি কোলিয়ারির এক মালিক আমার কাছে এলেন এবং জানতে চাইলেন আমি কী করতে চাইছি। কী আমার প্ল্যান! আমি তখন সবে স্ক্রিপ্টটা শেষ করে আনছি, আমি তাঁকে গল্পটি বললাম না। শুধু একটি দৃশ্য বললাম। পুরোটা বলার সাহসও ছিল না।

> 'ইন্টারভিউ' ছবির নায়ক রঞ্জিত মল্লিক কোনও একদিন একটি চলন্ত ট্রামে ওঠে। যাত্রী ভর্তি। কোনও সিট খালি নেই, একটি মেয়ে একটি ফিল্ম ম্যাগাজিনে চোখ বোলাচ্ছে। রঞ্জিত মল্লিক মেয়েটির পাশে দাঁড়িয়ে আছে। রঞ্জিতের চোখ ম্যাগাজিনটার ভেতরে চলে যায়। রঞ্জিত দেখে তার ছবি এবং হেডলাইনটি হল, 'মৃণাল সেনের নতুন আবিষ্কার— রঞ্জিত মল্লিক।' রঞ্জিতের বেশ বড় ছবি।
>
> মেয়েটি ঘাড় ঘুরিয়ে রঞ্জিতকে দেখে। মেয়েটি ম্যাগাজিনের ছবিটি আর রঞ্জিতের মুখটা বারবার দেখতে থাকে। মেলাতে চেষ্টা করে। রঞ্জিত নিজের মুখ লুকোনোর চেষ্টা করে। আবার দেখতেও চায়। দু'জনের মধ্যে ছেলেমানুষির খেলা শুরু হয়ে যায়। একজন বয়স্ক যাত্রী রেগে যায় এসব দেখে।
>
> সময় নষ্ট না করে রঞ্জিত এগিয়ে এসে দর্শকদের দিকে তাকিয়ে বলে, 'এটা আমারই দোষ। আমি স্বীকার করছি এটা আমারই ফটো। কিন্তু আমি অভিনেতা নই। আমি কোনও স্টার নই।
>
> আমার নাম রঞ্জিত মল্লিক। আমি ভবানীপুরে থাকি। একটি সাপ্তাহিকে কাজ করি। আমি প্রেসে যাই, প্রুফ দেখি এবং কিছু বিচিত্র কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকি। তেমন বিশেষ কোনও ঘটনা আমার জীবনে নেই। যে কোনও কারণেই হোক মৃণাল সেনের আমাকে পছন্দ হয়েছে। উনি বলেছিলেন, ভোর থেকে সন্ধে পর্যন্ত উনি আমার পেছনে ছুটবেন। আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবেন। একটা দিনের জন্য। দেখুন ওদিকে কে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কে মহাজন তাঁর ক্যামেরা নিয়ে দাঁড়িয়ে। বলুন তো এসবের কোনও মানে হয়!'

বিস্ময়ে সমস্ত যাত্রীরা রঞ্জিতের দিকে তাকায়। মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। মৃণাল সেনের নতুন আবিষ্কার ভিড়ের মধ্যে চোখে পড়ছে।

'মৃণাল সেন বলেছিলেন, আমাকে কিছু করতে হবে না। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকলেও চলবে না।' বলে রঞ্জিত।

'আমি তাঁকে বললাম, আজ আমাকে ইন্টারভিউ বোর্ডের সামনে ইন্টারভিউ দিতে হবে। এমন ঘটনাকে চেপে রাখা যায় না।'

উনি শুনে বললেন, 'চমৎকার! এটা একটা নাটকীয় ব্যাপার হবে।'

ট্রাম এসে থামে একটা জায়গায়। অল্প সময়ের জন্য। কে কে মহাজন ক্যামেরা নিয়ে ট্রাম থেকে নেমে পড়ে। ওর পেছন পেছন আরও দু'জন নেমে পড়ে।

রঞ্জিত আবার বলতে শুরু করে। 'দেখছেন কীরকম ভাবে আমার পেছন পেছন এঁরা ছুটছেন। কিন্তু এগুলো যা দেখলেন কোনওটাই সত্যি নয়।

আমি বাস্তব, জীবন্ত। আপনারাও বাস্তব। আপনারাও জীবন্ত। ট্রামের সেই যুবতিটিও বাস্তব চরিত্র।

কিন্তু যে ভদ্রমহিলাকে মায়ের চরিত্রে দেখেছেন তিনি অভিনেত্রী। তিনি বাস্তব নন। তিনি বাস্তবে আমার মা নন।'

'পথের পাঁচালী'র একটি দৃশ্য ভাবুন। করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বজয়ার অভিনয় করছেন। তিনি কান্নায় ভেঙে পড়লেন যখন দুর্গার মৃত্যুসংবাদ আর বুকের ভেতর চেপে রাখতে পারলেন না। কয়েকটা মুহূর্তের ঘটনা।

চলন্ত ট্রামগাড়িতে আবার ফিরে আসা যাক। রঞ্জিত বলে চলেছে। 'ওই সর্বজয়া, অর্থাৎ করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ই আমার মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করছেন। ঠিক একই ভাবে ওইরকম মূহূর্তে আমার নিজের মা একই ভাবে কান্নায় ভেঙে পড়তেন।'

রঞ্জিত নিজের হাতঘড়িতে সময়টা দেখে ট্রাম থেকে নেমে পড়ল। রঞ্জিতের দেরি হয়ে গিয়েছিল। সে তাড়াতাড়ি প্রেসের দিকে হাঁটা দিল।

এতটা বলে আমি সেই কোলিয়ারির মালিকের দিকে তাকালাম। আমি বুঝতে পারলাম, আর ফিরে যাওয়ার রাস্তা নেই কারণ উনি মুগ্ধ।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

'আমি টাকা দেব। পুরো টাকাটাই দেব।' বললেন তিনি।

এরপর উনি বললেন, আমার একটা জরুরি কাজ আছে। একজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। আমি উঠছি। আমি ক'দিনের জন্য রাজস্থান যাচ্ছি। একটি বিয়েতে হাজির হওয়ার জন্য। এক সপ্তাহ বাদে ফিরে এসে ব্যাপারটা ঠিক করে নেব। কিন্তু যেহেতু উনি বুঝেছিলেন যে আমার ইউনিট ও আমি তৈরি ছবিটি করবার জন্য, সেহেতু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর একটি হাত ব্যাগ থেকে নগদ দেড়লাখ টাকা বের করে আমার হাতে দিলেন। বাকি টাকা যেটা লাগবে সেটা উনি রাজস্থান থেকে ফিরে এসে আমাকে দেবেন। এই বলে উনি সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন।

ভাবাই যায় না। ছবির ব্যবসা নিয়ে কোনও কথা বললেন না, অতগুলো টাকার জন্য কোনও রসিদ চাইলেন না, বাকি টাকা কত দিতে হবে সেটাও একবার জিজ্ঞেস করলেন না। শুধু তাই নয় ছবিটির প্রযোজক কে হবে, কোন ভাষাতে হবে, কিছুই জানতে চাইলেন না। তড়িঘড়ি করে বেরিয়ে গেলেন।

গীতা রান্নাঘরে ছিল। কুণাল বাড়ি ছিল না। গীতাকে টাকার বাণ্ডিলটা দিলাম এবং পুরো কাহিনিটা বললাম। গীতা অবাক!

সেই ভদ্রলোক অর্থাৎ সুলতানিয়া ফিরে এলেন এবং যথারীতি বাকি টাকা দিলেন। দু' জনের মধ্যে চুক্তি হল, একেবারে ভদ্রলোকের চুক্তি। আমি প্রযোজক হব, উনি হবেন পরিবেশক।

অল্প বাজেটের ছবি। টাকাটা লগ্নি করলেন সুলতানিয়া। সমস্ত চরিত্রগুলো নিজের নামেই ছিল। তারপরেই রঞ্জিত মল্লিকের ট্রামে ওঠা এবং কিছু কথা বলা।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রমাণস্বরূপ ছবিটিতে একটি ছোট্ট জাম্পকাট হল পথের পাঁচালীর একটি করুণ দৃশ্য এবং সেখান থেকে আবার চলন্ত ট্রামগাড়িতে রঞ্জিতের উপস্থিতি।

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এরকম অনেক জাম্পকাট আছে। খুব সতর্কতার সঙ্গে ছবিটা সাজিয়েছিলাম। যাতে ছবিটির গতি বা ছন্দ নষ্ট না হয়। এডিটিং টেবিলে বুঝলাম যে ব্যাপারটা একদম ঠিক আছে।

সমস্ত দৃশ্যেই অভিনেতা অভিনেত্রীদের কিছু কথা বাদ দিয়েছিলাম। আবার এমন পর্যায়ে চলে গিয়েছিলাম যে যারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে শুটিং দেখছিল তাদের ছবিও ছবির ভেতরে রেখেছি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

এভাবেই ব্যাপারটা ঘটেছিল। একদিন আমি আমার ইউনিট নিয়ে বহুজাতিক কোম্পানি আই বি এম-এ গেলাম শুটিং করবার জন্য। ইন্টারভিউয়ের দৃশ্যটি ক্যামেরায় বন্দি করবার জন্য। অবশ্যই আমার সঙ্গে রঞ্জিত মল্লিক। রঞ্জিতের পরনে সাদা ধুতি আর কুর্তা। রঞ্জিতকে মনে হচ্ছে ধোপদুরস্ত নিপাট বাঙালি। কারণ ওই ইন্টারভিউয়ের পোশাক পরিচ্ছদের ব্যাপারে রঞ্জিতের কিছু করার ছিল না। হঠাৎ স্ট্রাইকে সমস্ত লন্ড্রিগুলো বন্ধ ছিল। স্বভাবতই ইন্টারভিউ দিতে যাওয়ার স্যুটটা মেলেনি।

এক বন্ধুর কাছ থেকে এক জোড়া জামা ও প্যান্ট জোগাড় করলেও সে জামাকাপড় রঞ্জিতের হারিয়ে যায় একটি পাবলিক বাসে একটি পকেটমারকে ধরতে গিয়ে। থানা পুলিশ করতে গিয়ে বাসেই জামাকাপড়ের প্যাকেট ফেলে রেখে চলে আসে। অগত্যা তাকে ধুতি আর কুর্তা পড়তে হয়।

যাই হোক, বড় বড় অফিসার এবং তাঁদের মধ্যমণি এক বিদেশি সাহেব রঞ্জিত বা বাঙালিবাবুর ইন্টারভিউ নিলেন।

ইন্টারভিউ যাঁরা নিলেন তাঁরা নিজেদের মতো প্রশ্ন করলেন। রঞ্জিতও নিজের মতো করে ধারালো উত্তর দিল। ইতিমধ্যে যিনি আমাকে একধারে নিয়ে গিয়ে একটি বিশেষ কথা, বিশেষ খবর বললেন, তিনি হলেন নিমাই ঘোষ। সত্যজিৎবাবুর কাছের লোক, ক্যামেরা দিয়ে লেখেন, কলম দিয়ে নয়, তিনি বললেন গত সপ্তাহে সত্যজিৎ রায়ের 'প্রতিদ্বন্দ্বী' ছবির শুটিং-এর সময় স্টুডিয়োতে একটা ইন্টারভিউয়ের দৃশ্য দেখেছেন।

তাঁর ভারী ভাল লেগেছিল দৃশ্যটা। ইন্টারভিউতে কঠিন প্রশ্ন করা হয়েছিল আবার উত্তরটাও খুব সাহসী ছিল। নিমাই-এর মুখে সব শোনা গেল। ইন্টারভিউ যিনি নিচ্ছিলেন তিনি জিজ্ঞেস করলেন এই দশকের সব চাইতে বড় ঘটনা কী!

কর্মপ্রার্থী— 'ভিয়েতনামের যুদ্ধ।'

নিমাই বললেন, 'কী অসাধারণ তাই না। বলুন।'

আমি নিমাই ঘোষের কাছে কৃতজ্ঞ এই খবরটার জন্য। নকলের দায় থেকে অব্যাহতি পেয়ে আমি সঙ্গে সঙ্গে আমারও শেষ প্রশ্ন শেষ উত্তর ঠিক করে নিলাম। বিদেশি ভদ্রলোক 'প্রতিদ্বন্দ্বী'র মতো প্রায় একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন।

'আজকের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কী?'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রঞ্জিতের উত্তর এল, 'আমার ইন্টারভিউ স্যার।'

দৃশ্যটি শেষ হল উচ্চ হাসিতে এবং করমর্দনে।

রঞ্জিত খুব খুশি হল এবং ভাবল চাকরিটা সে পাবে। কিন্তু না। চাকরিটা সে পেল না।

সেই অ্যালবার্ট জনসন একজন জুনিয়র অফিসারকে নিয়ে ছবিটা ম্যাটিনি শোয়ে দেখেছিলেন। তাঁর অনেক প্রশ্ন ছিল। অনেক কথা বলবার ছিল। তিনি মাঝরাতে আমার কাছে এলেন সম্পূর্ণ একা।

প্রশ্ন ছিল রঞ্জিত কি কোনও মিলিট্যান্ট গ্রুপের সদস্য? নাকি এসব কিছুই নয়।

পরিষ্কার উত্তর হল, না। আমি তাঁর প্রশ্নে আনন্দ পেয়েছিলাম। আসলে তিনি ব্যাপারটিকে মেলাতে চেয়েছিলেন ঘটনা ও কাহিনির বিন্যাসের সঙ্গে। যাই হোক, তাঁর ছবিটি ভাল লেগেছিল।

প্রথম দিনের কর্মকাণ্ডের প্রতিক্রিয়া ছিল অসাধারণ। যুবকদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া ছিল খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। কোনওদিনই এমন ঘটনা দেখিনি যে ক্যামেরাম্যানকে জনতা ঘিরে ধরছেন। মহাজনকে কোনওক্রমে ভিড় থেকে বের করে নিয়ে আসা হল, পর পর দুটো সপ্তাহ ঠিকই চলল। তৃতীয় সপ্তাহে টিকিট বিক্রি কমে যাওয়ায় গ্লোব সিনেমা হল থেকে ছবিটি উঠে গেল, অন্যান্য শহরে বা হলে মোটামুটি চলেছে। মফস্সলে বা ছোট শহরে ভাল চলেনি। সুলতানিয়া ছবির খরচের টাকা এবং কিছু বেশি টাকা পেয়ে গিয়েছিলেন বিদেশে ছবিটি চলার জন্য। পরবর্তীকালে তিনি আবার মনস্থ করলেন ছবি করবেন বলে।

আমি তৃতীয় সপ্তাহের একদিন সেই হলে বসে আছি। কুণাল ঠিক তখনই চলে গিয়েছে। ও সর্বদা সঙ্গ দিত আমাকে। হঠাৎ ছবি শেষ হওয়ার পর কিছু যুবক ও যুবতি যখন হল থেকে বেরোচ্ছে তখন তাদের মধ্যে একজন মহিলা একটি বিশ্রী উক্তি করলেন। উক্তিটি হল ছবিটা কি গুণ্ডা বদমায়েস ক্রিমিনালদের ছবি নয়? তোমরা কী বল?

সবাই কিন্তু চুপচাপই রইল, কথা বলল না।

চুপিচুপি হল থেকে বেরিয়ে এলাম যাতে আমাকে দেখে ওরা লজ্জা না পায়, বিব্রত বোধ না করে।

বাড়ি ফেরার পথে ভাবছিলাম এসব দর্শকদের যদি এ ছবি দেখা থেকে বাদ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

দেওয়া যেত তাহলে কী হত। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে ওরা অন্য ছবি দেখতে এসেছিল, যে ছবি 'ভুবন সোম'-এর মতো ছবি হবে।

আমার বন্ধু অরুণ কউল মুম্বাই থেকে ফোন করে জানাল কার্লোভিভ্যারি চলচ্চিত্র উৎসবের ভাইস প্রেসিডেন্ট, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ছবির খোঁজে এসেছে এবং এখানে এসে পৌঁছেছে প্রাগ যাওয়ার পথে। সুতরাং 'ইন্টারভিউ' ছবির সেই উৎসবে স্থান পাওয়ার জন্য অরুণ চেষ্টা করতে পারে। অরুণের কাছে কপি আছে, সে ইংরেজিতে সাবটাইটেলও করতে পারে। আমি অরুণকে জানালাম যা করবার তুমি করে ফেলো। নির্বাচকরা ইন্টারভিউ ছবিটি দেখে দেরি না করে দিল্লির ডাইরেক্টরেটের আশায় না থেকে প্রাগ চলচ্চিত্র উৎসবের কাছে কূটনৈতিক সাহায্য নিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। অরুণ ইংরেজি সাবটাইটেলটাও দিয়ে দিল যেটি প্রাগের ল্যাবরেটরিতে ঠিকমতো সাজানো হবে। কিছুদিনের মধ্যেই চলচ্চিত্র উৎসবের আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হল আমার কাছে। প্রাগের উৎসবে উপস্থিত থাকার জন্য। জানানো হল আমার এ ছবির অভিনেতাও যেতে পারে। অবশ্য আমি বা রঞ্জিত কেউই যেতে পারিনি। পরে আমার ইউনিটের সবাই খুব আনন্দ পেল জেনে যে রঞ্জিত মল্লিক সেই উৎসবে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে।

মজার ব্যাপার হল যখন 'ইন্টারভিউ' ছবিটা তৈরি করি আমি কখনই ভাবিনি যে এ ছবির পরে কিছু করব, কিন্তু করলাম।

ইন্টারভিউ, কলকাতা ৭১, পদাতিক পর পর তিন বছরে তিনটে ছবি তৈরি হয়।

'কলকাতা ৭১' শুরু হয় একটি কুড়ি বছরের ছেলেকে দিয়ে, আবার 'পদাতিক' শুরু হয় একটি লেখার বিবরণ-সহ।

তিনটে তিন রকম।

'কলকাতা ৭১'-এ একটি কুড়ি বছরের ছেলে যে হাজার বছর ধরে ইতিহাসের পাতার স্বাক্ষরকে বহন করে চলেছে তাকে দিয়ে ছবিটা শুরু হয়। আবার 'পদাতিক' ছবিতে এক বিখ্যাত ইংরেজ সাংবাদিকের লেখা মানে জেমস ক্যামেরনের লেখা দিয়ে ছবিটা শুরু হয়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমার বয়স কুড়ি

কুড়ি বছর বয়স নিয়ে
আমি আজও হেঁটে চলেছি
হাজার বছর ধরে

দারিদ্র্য
মালিন্য
আর
মৃত্যুর ভিড় ঠেলে
আমি পায়ে পায়ে চলেছি
হাজার বছর ধরে

হাজার বছর ধরে
দেখছি
ইতিহাস
দারিদ্র্যের ইতিহাস
বঞ্চনার ইতিহাস
শোষণের ইতিহাস

এইভাবে শুরু হয়েছিল 'কলকাতা ৭১'। বাক্যের পর বাক্য সাজিয়ে। ১৯৭১ সালে যেসব ঘটনা ঘটেছে তাঁরই প্রতিফলন যেন সিনেমার পর্দায়।

একটি বছর কুড়ি বয়সের ছেলে দৌড়চ্ছে। ভয়ংকর দৌড় সেটা। সরু গলি থেকে বড় রাস্তা, ভিড় রাস্তা, গ্রাম থেকে অরণ্যে, সমুদ্রের ধারে, যেখানে পেছনে ঢেউয়ের গর্জন, সেখান থেকে ভোরের কুয়াশায় চাদরে ঢাকা পার্কের ভেতরে। যে পার্কটা এ শহরেরই পার্ক। হঠাৎই কোথাও গুলির শব্দ। এক-দুই-তিন। শুরু হয়ে গেল মানুষ মারার যুদ্ধ। একঝাঁক পাখির গুলির আওয়াজে উড়ে যাওয়ার শব্দ।

সংবাদপাঠকের গম্ভীর কণ্ঠস্বর। 'একটি কুড়ি বছরের ছেলে এই শহরের কেন্দ্রস্থলে একটি পার্কে গুলিবিদ্ধ হয়েছে। সেই ছেলেটির শরীরে তিন তিনটি গুলি পাওয়া গিয়েছে। নিথর ছেলেটির কোনও পরিচয় পাওয়া যায়নি এখনও।'

এরই সঙ্গে তিনটে কাহিনি এসে হাজির, একটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রবোধকুমার সান্যাল, অপরটি সমরেশ বসুর। তিনটে গল্পই একদিনের গল্প। ১৯৩০, ১৯৪০ আর ১৯৫০ সালের অমানবিক ইতিকথার গল্প। প্রত্যেকটি গল্পের শেষে একটি কুড়ি বছরের ছেলে এসে উপস্থিত হচ্ছে। এরপরই কণ্ঠস্বর এবং একটি কুড়ি বছরের ছেলে এবং সেই ভয়ংকর ১৯৭১-এর দৃশ্য। প্রতিটি ছবির মাঝখানে যতিচিহ্নের মতো ওই বাক্যগুলি, ওই যুবকটির স্বগতকথন, যেন প্রতিটি ছবির সঙ্গে পরেরটিকে জুড়ে একটি গ্রন্থিবদ্ধ ছবি করে তুলেছে।

মেট্রো সিনেমায় রিলিজ হওয়ার পর বিশাল দর্শকদের ভিড়। টিকিটের জন্য লম্বা লাইন। অনেকে টিকিট পায়নি। শুধু এখানে নয়, মফস্‌সলেও একই চেহারা।

যারা ভাই বোন সন্তান হারিয়েছে, যারা কোনও বন্ধুকে হারিয়েছে, তারা সবাই কুড়ি বছরের ছেলেটিকে চিনতে পেরেছিল। যারা ছবিটাকে ভালবেসেছিল তাঁরা এই সিস্টেমকে ঘৃণা করেছিল। যে সিস্টেম নিচুতলার মানুষদের আশা-নিরাশাকে ভেঙে চুরমার করে দেয়।

যারা অন্য বক্তব্য রেখেছিল তাদের প্রশ্ন ছিল এ ছবির রাজনৈতিক দায় সম্পর্কে, শৈল্পিক মূল্য সম্পর্কে। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে বড় সাধারণভাবে ব্যাপারটাকে ভাবা হয়েছে। কেউ বলেছে রোমান্টিক ছবি। কেউ কেউ বলেছে গিমিক। সবকথা শুনে আমি আবিষ্কার করলাম নিজের খুঁত, নিজের ত্রুটি, নিজের ভুলভ্রান্তি, আবার নিজের ভাল লাগাও।

যদি কোনও ছবি নিয়ে বিতর্ক হয় বুঝতে হবে ছবিটির ভেতরে অন্য এক শক্তি লুকিয়ে আছে। হল থেকে ছবি দেখে বেরিয়ে এসে বহু লোক বহু কথা বলছে। সব কথা হয়তো ঠিক নয়। আবার কিছু আলোচনা হয়তো ঠিক। আমার মনে পড়ল সেই অ্যালবার্ট জনসনের কথা— ‘সময়কে ধরতে হবে, বুঝতে হবে। ইতিহাসকে বুঝতে হবে, ধরতে হবে।’

দুটি অল্পবয়সি ছেলে অভিভূত হয়ে ছবিটি দেখে বেরিয়ে এল। একজন বলল, ছবিটির শুটিং কবে হয়েছে? আমি বললাম, ‘এই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১...’

ছেলেটি রেগে চেঁচিয়ে উঠে বলল, ‘মিথ্যে কথা।’

আমি ঘাবড়ে গেলাম, এ ভাবে ছেলেটি অত্যন্ত অভদ্র ভাবে একথা বলতে পারে দেখে!

সঙ্গে অন্য যে ছেলেটি এই উত্তেজিত ছেলেটিকে শান্ত করার চেষ্টা করছিল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তার কাছে এ-উত্তেজনার কারণ জানতে চাইলে সে তখন বলল আমাদের এক বন্ধু একদিন এভাবে এসপ্ল্যানেড ইস্ট-এ বক্তৃতা দিচ্ছিল। সেদিনই সন্ধেবেলা সি আর পির গুলিতে মারা যায়। ঠিক এই অবস্থায় যেভাবে ছবিটিতে দৃশ্যটি এসেছে।

'ছেলেটি মারা যায়!' বললাম আমি।

'হ্যাঁ, গুলি খেয়ে মারা যায়।'

সঙ্গে সঙ্গে সেই ছেলে দুটির কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইলাম।

আমি বললাম, কয়েকবছর ধরে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে অনেক দৃশ্য ক্যামেরায় বন্দি করেছি। এ প্রক্রিয়া চলেছে ১৯৬৯ সাল থেকে। লুই মাল এসেছিলেন সেই সময় কলকাতার জনজীবনের ওপর ছবি করতে। হয়তো সেই সময় আমার ক্যামেরাম্যান সেই ছেলেটির ছবিটি তুলে নিয়েছে। তখনও পর্যন্ত জানতাম না ছেলেটি কে! নানা রকম কাহিনি শুনেছি। এক মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক বললেন তিনি তাঁর চাকরিটি খুইয়েছেন কারণ তার অফিসের মালিকের এক দালাল একটি বড় জনতার ভিড়ের মধ্যে, মিছিলের মধ্যে তাঁকে শনাক্ত করেছে।

ইনকামট্যাক্সের এক বড় অফিসার বললেন: আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে গাড়ি করে সিনেমা হলে এসেছি এবং গাড়ি করে বাড়ি ফিরছি। আমার এ ছবি দেখার পর তিনি লজ্জিত হলেন যেহেতু তিনি গাড়ির মালিক। আমি বললাম, 'চিন্তার কিছু নেই। আমারও গাড়ি আছে।'

অক্টোবর, ১৯৭২ সালে সুইজারল্যান্ডে যখন আমি ছোট্ট একটি চলচ্চিত্র উৎসবের বিচারক, চেয়ারম্যান, সেখানে শেষ দিনটা ছিল ভারতীয়দের দিন। সেখানে উৎসবের ডিরেক্টর 'কলকাতা ৭১'-এর একটি ভাল প্রিন্ট ভেনিস থেকে জোগাড় করে পুরস্কার বিতরণীর পর ছবিটি দেখানোর ব্যবস্থা করলেন এবং ভারতীয় রাষ্ট্রদূত অর্জুন সিংকে কিছু বলতে বললেন।

অর্জুন সিং ছিলেন এক সময়ের এয়ার চিফ মার্শাল। উনি ছোট অথচ সুন্দর বক্তৃতা দিলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ছবি শুরু হল। পুরো থিয়েটার হল কানায় কানায় ভরতি। কিছু দর্শক এসেছেন জেনেভা থেকে। তাঁরা বেশিরভাগই আফ্রিকান এবং লাতিন আমেরিকান মানুষজন।

ছবির শেষে আমাকে মানুষজন ঘিরে ধরল। একটি তরুণী দৌড়ে এসে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমার সঙ্গে করমর্দন করে বলল, অর্জুন সিং এ ছবি দেখে ক্ষুব্ধ ও হতাশ। তাঁর ভাল লাগেনি। কথাটা বলেই সে তাড়াতাড়ি চলে গেল। সে ফার্স্ট সেক্রেটারির মেয়ে। সরবোনে পড়াশুনো করছে। ছুটিতে সুইজারল্যান্ড এসেছে।

অর্জুন সিং চুপচাপ চলে গেলেন। একবারও দাঁড়ালেন না। যাওয়ার আগে আমাকে একবার হ্যালো পর্যন্ত বললেন না।

ছবির পরে বিরাট ব্যাঙ্কোয়েট হলে বিরাট জনতার ভিড় যাঁরা রাষ্ট্রদূত অর্জুন সিংয়ের ভাষণ শুনবেন তাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন। তখন ডিনার পর্ব। অর্জুন সিং বললেন এবং খুবই তিক্তভাবে বললেন, এ ছবি সত্য বলেনি। ভারতের সত্যিকারের চিত্র তুলে ধরেনি। ভারতের অর্থনীতির কথা, অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদন ও ভারতের জেট প্লেনের গতির কথা বলা হয়নি।

এই বক্তৃতার পর বেড়ালের মতো মিউ মিউ আওয়াজ শুরু হল হলে, বক্রোক্তি ঠাট্টায় ভরে গেল চারপাশ।

বেসিল রাইট আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। দেখে বোঝা গেল রাইট রেগে গিয়েছেন।

কলকাতায় ফিরে আসার কিছুদিন বাদে তাঁর একটি সুন্দর চিঠি পেলাম। তখনও 'কলকাতা ৭১' চলছে রমরমিয়ে। বেসিল রাইট ব্রিটিশ ডকুমেন্টারি আন্দোলনের প্রধান। তখন রিটায়ার করেছেন। 'রাষ্ট্রদূতের কথাটা তেমনভাবে নিও না। সরকার এবং সরকারের পৃষ্ঠপোষকরা এসব বোঝে না। ছবিটবি বোঝে না। একটি ছবিতে একটি দেশের কথা বলা হচ্ছে অন্যভাবে, সরকারি আমলারা ভয়ে মরছেন।'

এঁরা হচ্ছেন ভয়ংকর ধরনের আমলা। এঁরা টেলিস্কোপের উলটো দিক দিয়ে সব দেখেন। যাঁরা ওখানে ছিলেন তারা ব্যাপারটাকে পাত্তাই দেননি।

রাইটের চিঠি পেয়েই ইন্দিরা গাঁধীকে এ চিঠির কপি পাঠিয়ে দিই। সঙ্গে কিছু কথা। আমার অভিজ্ঞতা, একটু তিক্ত অভিজ্ঞতা, সেটাও লিখি। এর ফলে আমার পাসপোর্টের কোনও ক্ষতি হয়নি। আমি আবার যেখানে ইচ্ছে সেখানে যেতে পারছিলাম। এই সব ভয়ংকর আমলাদের কথা লিখতে গিয়ে রাইট নিজের দেশের আমলাদেরও ছাড়েননি।

এবার নতুন ছবি করবার সময়। ইন্টারভিউ ও কলকাতা ৭১-এর পর আমি অনেক কিছু শিখলাম আবার কিছু শিখলাম না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমার মনে হল এমন ছবি দরকার যেখানে একটি যুবক নিজেকে প্রশ্ন করবে। সে যুবকটি স্রোতের বিরুদ্ধে যাবে!

আমি ও আশিস বর্মন একটি চিন্তাভাবনা খাড়া করলাম, নতুন ছবি 'পদাতিক'-এর আউট লাইন তৈরি হল।

এই ছবিটি দেখে এই শহরের এক বিশিষ্ট কবি ও বামপন্থী সাংবাদিক বললেন, এ ছবিটা 'একটি পুলিশের রিপোর্ট'। সত্তর দশকের নকশাল আন্দোলনের সক্রিয় সমর্থক ছিলেন তিনি।

বললেন, সম্ভবত এ জন্যেই যে, এ-ছবিতে আত্মসমালোচনার একটা পর্ব ছিল। বিপ্লবী রাজনীতির কর্তৃত্ববাদী মানসিকতাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল।

আবার জেমস ক্যামেরনের কথায় আসি। যিনি বলেছিলেন, 'যতবারই কলকাতায় আসি ততবারই মনে হয় এখানে কিছু পাওয়ার নেই। এ শহরের শিয়রে সংক্রান্তি।' একটি যুবক তিন তিনটে গুলি খেয়ে ছুটতে ছুটতে একটার পর একটা গলি পেরিয়ে পালাতে পালাতে বিরাট পর্দায় তাঁর মুখ দেখা যায়। গুলির শব্দ। মুখটা জ্বলে গিয়েছে। তখনই টাইটেল ভেসে ওঠে।

গল্প শুরু হয়। ছবির আরম্ভ, মধ্যভাগ এবং শেষ। ছেলেটি পালাচ্ছে পুলিশের প্রিজন ভ্যান থেকে। ছেলেটি পার্টির হোল-টাইমার সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী, ছেলেটি বেশ কিছুকাল গা ঢাকা দিয়েছিল। পুলিশ তাকে খুঁজে বের করে নিয়ে যাচ্ছিল। ছেলেটি পালিয়ে বেড়াচ্ছিল একটার পর একটা জায়গায়। নিত্যনতুন লুকিয়ে থাকার জায়গায়। শেষ পর্যন্ত সেই পলাতক ছেলেটি যেখানে ছিল সেটি একটি অভিজাত এলাকা। যে বাড়িতে ছিল সে বাড়িটির মালিক এক ভদ্রমহিলা। ভদ্রমহিলা সেই যুবকটির সমবয়সি। ভদ্রমহিলা তাঁর বাবার কাছ থেকে বাড়িটি পেয়েছেন। এটি তাঁর মৃত বাবার সম্পত্তি। তিনি একটা সময়ে এক ব্যবসাদারকে বিয়ে করেছিলেন। ভদ্রলোকটি অসৎ মানুষ ছিলেন। এখন ভদ্রমহিলা একাকী। তাঁর দশ বছরের ছেলে একটা পাহাড়ি এলাকায় বোর্ডিংয়ে থেকে পড়াশুনা করে। ভদ্রমহিলা পঞ্জাবি। এ রকম বাসস্থানই তো কোনও পলাতকের থাকার আদর্শ জায়গা। সমস্ত পৃথিবীর সব ব্যাপার থেকে বিচ্ছিন্ন। রাজনৈতিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। শুধু একমাত্র বিশ্বস্ত এক পার্টি কর্মীর সঙ্গে পলাতকের যোগাযোগ। সে একদিন অন্তর এ বাড়িতে আসত। একটা ডুপ্লিকেট চাবি থাকত তাঁর কাছে। ছেলেটি চাবি খুলে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এসে দেখা করত। কারণ সেই পলাতক কর্মীটি বাইরে যেতে পারত না, নিষেধাজ্ঞা ছিল।

যেদিন পলাতক ছেলেটি এ বাড়িতে এল, সঙ্গে নিয়ে এল সেই পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী। সেদিন সেই ভদ্রমহিলা, মানে বাড়ির মালিক, কলকাতার বাইরে ছিলেন। একটা ম্যাগাজিন পড়ে ছিল সোফার ওপর।

'ফ্রন্টিয়ার'। সে ম্যাগাজিনটা তুলে নিয়ে চোখ বোলাল। সম্পাদক সমর সেন। অবাক হয়ে সেই পলাতক ছেলেটি একটি রহস্যময় চাউনি দিল। সেই ভদ্রমহিলা পার্টির সমর্থক। কিছু দিন থেকেই সমর্থক, কারণ তাঁর ছোট ভাই পুলিশের গুলিতে পঞ্জাবের রোপারে নিহত হয়। রোপার তখন জ্বলছে রাজনৈতিক ডামাডোলে।

তারপর একদিন সেই ভদ্রমহিলার সঙ্গে পলাতক যুবকটির পরিচয় হল।

একই ছাদের তলায় দুজনে প্রথমে চুপচাপ ছিল, যতক্ষণ না একে অপরের খোলস থেকে বেরিয়ে এল। ভদ্রমহিলার দুঃখ হল ছেলেটির বাবা ও মায়ের কথা ভেবে। মা অসুস্থ, শয্যাশায়ী। বাবা একটি ছোট প্রতিষ্ঠানে সাধারণ কেরানি। এখনও তিনি লড়াই করে যাচ্ছেন নিজের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে। ছোট ভাই ফুটবল খেলে বেড়ায়। কোনও চাকরি পায়নি ছেলেটি। বাবা তাঁর ছেলেটিকে বুঝতে পারেন না। পার্টিকেও বুঝতে পারেন না।

বাবা ছেলের সঙ্গে তাঁর পার্টি নিয়ে তর্ক করতেন। রেগে যেতেন। কারণ তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন।

যখনই সেই পলাতক ছেলেটি সেই অ্যাপার্টমেন্টে একা একা থাকত তখনই সে নিজেকে প্রশ্ন করত। নিজের পার্টি, পার্টির নেতা, যেসব মানুষদের জন্য লড়াই করছে তাদের কথা সবই সে ভাবত, প্রশ্ন করত নিজেকে। শুধু তাই নয়, কারা বন্ধু কারা শত্রু তাদের কথাও ভাবত। ভাবত কী করে বড় একটি ফ্রন্ট তৈরি করা যায়। বারবার প্রশ্ন করত। কিন্তু উত্তর দেওয়ার কেউ ছিল না।

বাধ্য হয়ে লম্বা একটা চিঠি লিখল। সে চিঠির ভাষা বেশ কঠিন ও ঝাঁজালো। চিঠিটা পাঠাল নেতাদের কাছে সেই বিশ্বস্ত কর্মী মারফত, যে কর্মীটিকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল কোনও কিছু না জানতে। শুধু সব কিছু নির্বিকার মেনে নিয়ে চলাই ছিল তাঁর একমাত্র কর্তব্য।

উত্তর এল কঠিন ও ধারালো। বিশ্বস্ত কর্মীটিকে বলা হল, ও বাড়িতে তুমি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আর যাবে না। বাড়ির চাবিটি ফেরত দিয়ে দেওয়া হল সেই ভদ্রমহিলার অফিসের বিশ্বস্ত কর্মীকে।

যদিও তার বাড়ির বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল তবুও একদিন সন্ধেবেলা সে বাড়িটার বাইরে এল। শুধু যাওয়ার আগে বলে গেল মা খুব অসুস্থ। মা তাকে দেখতে চায়।

যখন সে বাড়িতে এল তখন তাঁর মা মারা গিয়েছেন। পাড়াপড়শি কাউকে কিছু না জানিয়ে ছেলেটির বাবা ছেলেটিকে (পলাতক) দেওয়ালের পেছনে লুকিয়ে নিয়ে একটি গোপন কথা বললেন যে কথাটি দু' সপ্তাহ ধরে তিনি বুকের মধ্যে চেপে রেখেছিলেন। সেই গোপন কথাটি হল, বাবার অফিসে সমস্ত পুরনো কর্মচারীদের একটি কাগজে দস্তখত করতে হয়েছে যে, এই অফিসে কোনওদিন হরতাল যেন না হয়। ইউনিয়নবাজি করা চলবে না। কিন্তু পলাতক ছেলেটির বাবা সেই কাগজে সই করেননি। একটি ফ্রিজ শট। পলাতক আনন্দে হতবাক হয়ে গেল। বাবার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকাল। ড্রাম বেজে উঠল। রাতের নীরবতার মধ্যে পুলিশ ভ্যানের আগমন। বাবা তাঁর পলাতক ছেলেটিকে পালানোয় সাহায্য করতে-করতে বললেন: 'বি ব্রেভ।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অষ্টম অধ্যায়

তিন বছরে তিনটে ছবি তৈরি হয়েছিল। ১৯৭০, ১৯৭২, এবং ১৯৭৩ সালে। তিনটেই কলকাতার ছবি। জেমস ক্যামেরনের ভাষায় (প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য), তিন বছরে এবং প্রতি বছরেই কলকাতাটা পালটে যাচ্ছে খালি খালি। প্রতিবার। ভয়ংকর, আরও ভয়ংকর, আরও আরও। যেন কলকাতার শিয়রে সংক্রান্তি। তবু যতবার তিনি এসেছেন ততবারই আঁকড়ে ধরে রেখেছেন—ভালবাসা দিয়ে, ঘৃণা দিয়ে। আমাকেও আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে— আতঙ্কে, ভয়ে, ভালবাসায়। পরিস্থিতিকে সম্বল করে কখনও শহরটাকে দেখেছি একভাবে, কখনও অন্যভাবে। ভয়ে, নির্ভয়ে।

'পদাতিক' ছবিটিতে পালিয়ে-যাওয়া-নায়কের মাথায় নানা প্রশ্ন, এমন কী বিশেষ পরিস্থিতিতে স্রোতের বিরুদ্ধেও। নেতাদের কথা: প্রশ্ন নয়, মেনে চল। নয়তো অপসারণ। একদিকে পুলিশ, অন্যদিকে নেতাকে অমান্য করা। জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ। তবু পলাতক মানতে চায় না সে হেরে গিয়েছে যুদ্ধে। কিন্তু পিতা-পুত্র যখন মুখোমুখি দাঁড়ায়, তখন সেই মুহূর্তে?

এরকম ধরনের কঠিন মুহূর্তকে তৈরি করা আমার কাছে বেশ কঠিন কাজ। আমার কেন, অনেকেরই। ছবির অভিনেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে সহস্র কথা বলে এই মুহূর্ত, এই পরিস্থিতি তৈরি করা যায় না। এটা ভেতরকার অনুভূতির ব্যাপার। এখানে কোনও যুক্তি তর্ক খাড়া হতে পারে না। সেজন্য ছবির বাবা ও ছেলের চরিত্রের দুই অভিনেতার সঙ্গে বসলাম এবং ওদের একটি গল্প বললাম। গল্পগাছা নয়, বাস্তব অভিজ্ঞতা, যা কিনা শিল্পের মুখোমুখি হওয়ার সাহস জোগায়! সে গল্পটা হল আমার আগের ছবির ক্যামেরাম্যান [illegible] চট্টোপাধ্যায়ের কথা।

উত্তরবঙ্গের এক সিভিল সার্জেনের ছেলে পরাধীন ভারতে সন্ত্রাসবাদীদের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দলে নাম লিখিয়েছিল যখন বয়স মাত্র ষোলো। ছেলেটির বাবা এসব কাণ্ডকারখানার জন্য ছেলেটিকে বহুবার বকাবকি করেছেন। নানা রকমভাবে ভয় দেখিয়েছেন। একদিন ভয়ংকর অশান্তির মুহূর্তে ছেলেটিকে তাড়িয়ে দিলেন। মাঝরাতে তাঁর সন্ত্রাসবাদী দলের লোকজন তাঁকে ডেকে পাঠাল কোনও একটি জায়গা আক্রমণের জন্য। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হল না। সবাই ধরা পড়ল পুলিশের হাতে। পুলিশ তাঁদের বেদম প্রহার করল। সবাইকে ধরে জেলে পুরে দিল।

পরের দিন সকালবেলা জেলা হাসপাতাল পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ। জেনারেল ওয়ার্ডের সব রোগীদের সরিয়ে নিয়ে ওইসব ছেলেদের রাখা হল সেখানে।

সন্ত্রাসবাদী দলের ছেলেরা তখন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। চোখে দেখা যায় না।

সেই ছেলেটির বাবা অর্থাৎ সেই সিভিল সার্জেন হাসপাতালের সিঁড়ি ভেঙে ধীরে ধীরে উঠলেন এবং দরজা খুলে দাঁড়ালেন। সেদিন তিনি অনেক আগে আগেই এসেছেন। এক শক্ত লড়াকু মানুষ তাঁর কর্তব্য করতে এসেছেন। তাঁর মুখে চোখে কোনও অভিব্যক্তি নেই।

তিনি প্রতিটি আহত ছেলেকে দেখলেন, প্রতিটি শয্যার কাছে গেলেন, প্রতিটি ডাক্তার ও নার্সকে নির্দেশ দিলেন কী করতে হবে। সবাই তখন নীরবে তাঁর কথা শুনছে। টু শব্দটি নেই সেখানে। এক অখণ্ড নীরবতা। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তিনি যখন বেরিয়ে এলেন তখন সমস্ত পুলিশ কর্মচারী, সমস্ত অধস্তন কর্মচারী সেই সিভিল সার্জেনের পেছন পেছন এল। যেন মনে হচ্ছিল পুলিশ কর্মচারীরাও সেই সিভিল সার্জেনের অনুসরণকারী।

মুহূর্তের জন্য সেই ডাক্তার, সেই সিভিল সার্জেন, একটু পা চালিয়ে এগিয়ে গেলেন, দু' তিনটে জায়গায় থামলেন যেন মাটিতে কোনও হারিয়ে যাওয়া জিনিস তিনি খুঁজছেন। কিছুক্ষণ বাদেই তিনি নিজের ছেলের শয্যার সামনে এলেন এবং অস্ফুট স্বরে দু' তিনটে কথা বললেন। বললেন, 'আমি আর এ চাকরি করব না।' কথাটা বলেই তিনি তড়িঘড়ি বেরিয়ে গেলেন।

হয়তো চাকরিটা শেষ পর্যন্ত ছেড়েই দিলেন। হয়তো বা দেননি। ওসব নিয়ে আমি ভাবিনি। 'আমি-আর-এ-চাকরি-করব-না' এই কথাটুকুই আমাদের পক্ষে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যথেষ্ট। এবং ওখানেই আমার কথার শেষ। অভিনেতা বাবা চুপ করে রইলেন। ছেলেও। শুধু দুজনের চোখে চোখ রাখা, চেয়ে থাকা। অদ্ভুত চাউনি।...তারপর ক্যামেরা চলল যতটা চলার। যা চেয়েছিলাম তাই পেলাম। অসামান্য অভিনয়। বিপত্নীক পিতা বললেন, 'যাও, বি ব্রেভ!' পলাতক পুত্র তখনও দাঁড়িয়ে, স্থির।

এবার নতুন ছবির পরিকল্পনা। সাত পাঁচ ভাবা। আমি তো ভাবছিই। গীতা আর কুণালও ভাবছে। হ্যাঁ, নতুন কিছু। ভাবি, বই খুঁজি, যখন যেমন পাই। ভাবি নানারকম গল্প, নানারকম ছবির কাঠামো। কুলকিনারা পাই না। সহজলভ্য নয় বলেই।

চার্লি চ্যাপলিনের কথা মনে পড়ে। প্রায় অথর্ব। তবু বলে চলেন, 'ideas just keep popping into my head.' একদিন গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'How do ideas come to you?' জবাবের প্রত্যাশা না-করেই বললেন, 'Image comes to me first.' আর একদিন, তখন আমি কান চলচ্চিত্র উৎসবে, হাঙ্গেরির ইস্তভান জাবো বললেন, 'গল্প তো মাঠেঘাটে, বাড়ির আনাচে কানাচে, যে মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আছি সেখানেই।' আমি বলি, 'মাটি খুঁড়ে বড় জোর মানুষের হাড়গোড় পেতে পারি।'

এরকম অবস্থাতেই হঠাৎই একটি গল্প মাথায় এসে গেল। যে গল্প একবার আমার মাথায় এসেছিল। গল্পটা হারিয়েও গিয়েছিল। ১৯৭৪ সালের শুরুর দিকে রিজার্ভ ব্যাংকে একটি কাজে যাওয়ার সময় এ গল্পটা বা এ খেয়ালটা মাথায় আসে। একটি আশ্চর্য ঘটনা। তখন অফিসটাইমের সকাল। রাস্তায় লম্বা লাইন। সবরকম বয়সের মানুষ ধৈর্য ধরে লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষারত, যুবক মাঝবয়সি সবরকম। এত বড় লাইন দেখে অবাক হয়ে সে লাইনটায় আমিও দাঁড়িয়ে গেলাম। ভুলে গেলাম রিজার্ভ ব্যাংক যাওয়ার সেই নির্দিষ্ট সময়টা। লাইনে দাঁড়িয়ে অসংখ্য মানুষ একে অপরের সঙ্গে কথা বলছে। আমি তাঁদের কথা শুনছিলাম। ওরা ওই লাইনে দাঁড়িয়েছে চাকরির জন্য ফর্ম জোগাড় করতে অথচ সেই চাকরির জন্য সামান্য কয়েকটি পোস্ট খালি আছে।

আমি অন্যান্য কাজ ফেলে রেখে ছুটলাম আমার বন্ধু মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। মোহিত একটি কলেজের অধ্যাপক এবং পরীক্ষামূলক নতুন ধরনের নাটকের রচয়িতা। যথেষ্ট নামী নাট্যকার। মোহিতকে অনুরোধ করলাম যে এই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ঘটনাটিকে যদি আমার ছবির আগামী চিত্রনাট্যতে কোনওভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। এ লম্বা লাইনটা হতে পারে তিরিশ হাজার, ষাট হাজার অথবা আরও বেশি মানুষের লম্বা লাইন যারা এসেছে দীর্ঘ প্রতীক্ষা করে শুধু অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম সংগ্রহ করতে। নানা জেলা, নানা জায়গা থেকে এরা এসেছে। ফর্ম কিনে সেটাকে আবার জমা দিয়ে তবে নিষ্কৃতি। পুলিশ দাঁড়িয়ে ব্যবস্থা দেখছে, লাইন ও ভিড় সামলাচ্ছে। যখন তখন লাইনে দাঁড়ানো মানুষগুলো রাগে হতাশায় হিংস্র হয়ে উঠতে পারে।

বিশাল প্রাসাদটি যেখান থেকে হাজারে হাজারে ফর্ম বিলোনো হচ্ছে, সবই অবশ্য দাম দিয়ে কেনা হচ্ছে, সেই প্রাসাদের প্রধানকে বলা হচ্ছে 'চেয়ারম্যান'। খবর এল নিয়মকানুন মানছে না কেউই, ভাঙচুর চলছে, এবং খবর পেয়ে আরও হাজার হাজার মানুষ ছুটে আসছে গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে, শহর নগর থেকে। প্রাসাদটাকে দখল করার মতলব কি এদের? তবে কি এমার্জেন্সি জারি হবে! নইলে সর্বনাশ।

এই হল অবশ্য মোটামুটি চিত্রনাট্যের খসড়া।

আমি আর মোহিত এই ধারণার ওপর চিত্রনাট্য তৈরি করতে শুরু করলাম। ছবির নাম দিলাম 'কোরাস।' যে কোনও কারণেই হোক প্রেসিডেন্টের স্বর্ণপদক পেল ছবিটি। এমনকী বিদেশি পুরস্কারও কিছু কিছু পকেটস্থ হল। মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে দ্বিতীয় পুরস্কার। উপরন্তু 'হাইয়েস্ট ডিপ্লোমা অফ দি ইয়ার ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ ফিল্ম ক্রিটিকস অ্যাসোসিয়েশন' পুরস্কারও পেল। আরও পেল Fipresci-র সম্মানীয় আন্তর্জাতিক স্তরের পুরস্কার। কিন্তু ব্যবসা করতে পারল না ছবিটি অন্তত এদেশে বা এ-শহর কলকাতাতে। একদিন একদল যুবক বেশ ক্ষিপ্ত হয়ে আমাকে চেপে ধরল।

ছেলেরা বলল, এ ছবির সাবটাইটেল দরকার। ছবিটি তাদের বোধগম্য হচ্ছে না। এটা একটা ফ্যান্টাসি যেটা ওদের মাথার ওপর দিয়ে চলে গেছে। ফ্যান্টাসি তো বটেই! যদিও উলটো পালটা প্রতিক্রিয়া আমার কাছে নতুন নয়। এ ধরনের তর্কাতর্কি এবং আমার ছবি নিয়ে নানারকম ঠাট্টা তামাশা শুনে শুনে আমি অভ্যস্ত। কিন্তু আমি মনে রেখেছিলাম একটি সুন্দর লাইন যে লাইনটির বক্তা লিন্ডসে অ্যান্ডারসন। অসাধারণ একটি ছবি তৈরি করেছিলেন লিন্ডসে অ্যান্ডারসন। ছবিটি তাঁর সবচাইতে সফল ছবি। নাম *If*...। বললেন, 'আজকের ফ্যান্টাসি, কালকের বাস্তব। রিভোল্ট অব দ্য অ্যাডোলেসেন্টস।' ঘোষণা হল ২৬

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জুন, ১৯৭৫ সালে। অন্ধকারের দিনগুলো এগিয়ে এল। সংবাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ হল। সমস্ত কাগজে খবর কাটাছেঁড়া হতে লাগল। প্রচুর রাজনৈতিক কর্মী গা ঢাকা দিল, লুকিয়ে পড়ল অন্তরালে। ভয় ও উত্তেজনায় শিহরন শুরু হয়ে গেল। কেউ প্রতিবাদ করলেই এমার্জেন্সির কর্তাব্যক্তিরা খড়্গহস্ত হতে দ্বিধা করত না। এমনকী রবীন্দ্রনাথকেও সন্দেহের তালিকায় রাখা হল। যেমন:

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,...

জরুরি অবস্থা কুৎসিত দাঁতগুলো বের করে ফেলল। বিভিন্ন মানুষের জীবনে বিভিন্ন ভাবে ছন্দপতন ঘটল।

সেদিন গভীর রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে আছে, এমনকী আমিও ঘুমিয়ে পড়েছি, যখন সকালে ঘুম থেকে উঠলাম, তখনই খবরটা পেলাম। ভয়ংকর সংবাদ।

খবরের কাগজের হেডলাইন। আমার মনে পড়ে গেল ১৯৪৭ সালের কথা। যে ভদ্রমহিলা এখন প্রধানমন্ত্রী সেই মহিলার পিতা জওহরলাল বললেন, 'Long years ago we made a tryst with destiny,... At the stroke of the midnight hour,... India will wake to life and freedom...'

জওহরলাল তখন একটি বিশাল আলোড়ন তুলেছিলেন ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে যেখানে তাঁরই কন্যা নিয়ে এলেন এক কুৎসিত ইতিহাসের পদক্ষেপ। সেটাও স্বাধীনতার আঠাশ বছর পরে।

এরই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সারাটা দিন ফোনের পর ফোন আসতে লাগল, আমিও ফোনের পর ফোন করতে লাগলাম। সেসব ফোনের কথাবার্তার নীট ফল শূন্য। কয়েক দিন বাদে আমি আমার ঠান্ডা মাথার ঔপন্যাসিক বন্ধু 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদকের কাছে গেলাম। তিনি দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি তাঁর একঘরের অফিসে ভাঙা চেয়ারে বসে তাঁকে যখন সব কথা জিজ্ঞেস করলাম, জানতে চেষ্টা করলাম কেন এমন হল, সে সঙ্গে সঙ্গে এই এমার্জেন্সি বা জরুরি অবস্থার সপক্ষে যুক্তি সাজাল। আমি অবাক হয়ে গেলাম, আমি ভীষণ রেগে গেলাম। দীপেন কিন্তু আগের মতোই ঠান্ডা মাথায় আমার সঙ্গে কথা বলছিল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

একবার ভাবলাম ওর সঙ্গে তর্কযুদ্ধ করব, এমার্জেন্সির সঙ্গে যুদ্ধ করব। তারপর ভাবলাম, বৃথা এই চেষ্টা। চলে এলাম পরিচয়ের অফিস ছেড়ে। প্রতিজ্ঞা করলাম কোনওদিন আর এখানে আসব না।

বছরখানেক বাদে দীপেন একদিন হঠাৎই আমার বাড়ি এল। সে তখন রাগে কাঁপছে। তাঁর গম্ভীর মুখ, ভেঙে পড়া মুখ আমাকে বিস্মিত করল। ওঁকে দেখে মনে হচ্ছিল ও প্রতারিত, ওঁকে কেউ ঠকিয়েছে, কেউ ভুল বুঝিয়েছে। দীপেন ক্ষমা চাইল। এক ধরনের স্বীকারোক্তি। আমি বুঝলাম দীর্ঘ এক বছর সে নিজের সঙ্গে ভেতরে ভেতরে কতটা লড়াই করেছে, দুঃখ পেয়েছে। কয়েক বছর বাদে জরুরি অবস্থার অবসানের পর দীপেন চলে গেল অল্পবয়সে। দীপেন্দ্রনাথ এক মহৎ মানুষ ও এক মহৎ সাহিত্যস্রষ্টা ছিলেন।

একসময়ে বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসব হত জুন বা জুলাই মাসে। আমার ছবি 'কোরাস' ভাল কি খারাপ জানি না কিন্তু ছবিটি প্রেসিডেন্টের গোল্ডেন লোটাস পেল। এ ছবিটি নতুন ধরনের সিনেমা এবং তাই নিউ সিনেমাতে জায়গা পেল প্রদর্শনের জন্য। জায়গা পেল এদেশের এমার্জেন্সির ঠিক এক সপ্তাহ পরে। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক বাদে অর্থাৎ ছবি শেষ হয়ে গেলে যখন পর্দা উঠল তখন উলরিশ গ্রেগর আমাকে মঞ্চে নিয়ে গেল। আমি তখন তৈরি হচ্ছি প্রশ্নোত্তর পর্বের জন্য। এক সুন্দরী যুবতি উত্তেজিত হয়ে দ্রুত নিজের চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সুন্দর সাজানো ইংরেজিতে বললেন, 'আমার মনে হয় ঠিকই বলছি। ব্যঙ্গ বিদ্রুপের পেছনে আপনার ছবি একটি সাহসী লড়াকু ছবি। এখন মৃণাল সেন আপনিই বলুন এবং খোলাখুলি বলুন, আপনার এই ছবিটির মূল বক্তব্য কী! এ ছবিকে কি আপনি আপনার দেশের এমার্জেন্সির বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে চাইছেন?'

সত্যি কথা বলতে কি আমার খুব অস্বস্তি হয়েছিল এবং গ্রেগরও রীতিমতো ঘাবড়ে গিয়েছিল। আমি বাধ্য হয়েই গ্রেগরকে বললাম ফরাসি ও জার্মানভাষায় তর্জমা করো এবং কিছুটা সময় নাও। আমিও ততক্ষণে নিজেকে গুছিয়ে নেবো।

আমি নিজে ভেতরে ভেতরে তৈরি হয়ে বললাম, 'আমি খুশি। যে আপনারা সবাই আমার এই ছবিটিকে লড়াকু ছবি বলে আখ্যা দিয়েছেন। এটা ঠিক যে আমার দেশে বহু মানুষের অসুবিধে করে এমার্জেন্সি ঘোষণা হয়েছে ক'দিন আগে। কিন্তু সত্যি বলতে কী, এমার্জেন্সির আইনগত দিকটা বা আইনগত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বৈধতার দিকটা আমি ঠিক জানি না। সেজন্য বলতে পারছি না ঠিক কখন কোন জায়গায় আমি এমার্জেন্সির সীমারেখা ছাড়িয়েছি। এ অবস্থায় আমি একটি কথারও উত্তর দিতে পারছি না। আমি চুপ করে থাকাটাই শ্রেয় মনে করছি।'

সবাই বুঝল এর চাইতে ভাল জবাব সম্ভব নয়। আমার বুদ্ধির তারিফ করল সবাই। গোলমেলে কথা এড়িয়ে সত্যি কথাই বলেছি আমি। আমি খুশি, গ্রেগরও খুশি। যা হোক, কথাবার্তা আর বেশি দূর এগাল না। প্রশ্নোত্তর পর্বটি ভালয় ভালয় কাটল।

সত্যজিৎ রায়ের *Our Films, Their Films* বইটি সেই সময় প্রকাশ পায়। আমি বইটির সমালোচনা করি 'সানডে' সাপ্তাহিকে। রেনোয়া সম্পর্কে একটা বড় প্রবন্ধ ছিল বইটিকে, আলাপচারিতায়। 'দ্য রিভার' ছবিটি করার আগে বার তিনেক তিনি কলকাতায় এসেছিলেন। বারবার এসেছিলেন বলেই কলকাতা শহরটাকে তিনি চিনেছিলেন ভাল করে। তারই সঙ্গে আমেরিকা সম্পর্কেও মজার মজার বেশ কিছু কথা বলেছিলেন। কথাবার্তা জমেছিল ভালই। দু'জনের কেউই কম যাননি। কথাবার্তায়, হাসিমস্করায়, ব্যঙ্গবিদ্রুপে। হলিউডের সিনথেটিক পরিবেশ তিনি বরদাস্ত করতে পারেননি। আর নিয়মানুবর্তিতা, অসহ্য! সবই নিয়মে চলে, এমন কি ট্রেন আসে যায় ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে। ভাবা যায় না। এখানে? কলকাতায়? এদেশে? কোনও নিয়মকানুন নেই কোনও ব্যাপারে। ট্রেনের চলাফেরায় সবই যেমন খুশি, যেমন ইচ্ছে। নিয়মকানুনের বালাই নেই। দারুণ!

আমি যখন বইটির সমালোচনা করি তখন এমার্জেন্সি চলছে। স্বাভাবিকভাবে এবং কিঞ্চিৎ মজা করে সমালোচনাটি করি। যদি সেই ফরাসি মানুষটি এখন আসতেন উনি কি সেই একই স্বাধীনতা পেতেন কারণ ২৬ জুন ১৯৭৫ সালের পর রেলগাড়ি ঠিক সময়ে চলছিল। কাঁটায় কাঁটায়।

আমার লেখাটি ছাপাখানায় যাওয়ার আগে তৎকালীন সম্পাদক (সানডে) এম জে আকবর আমাকে বললেন শেষ লাইনটি না-ছাপলে ভাল হয়। অবশ্য বাকি সমালোচনা বেশ ভাল হয়েছে। আমি আপত্তি করিনি কারণ সম্পাদকও কাজ করছেন এমার্জেন্সির আওতায়।

আর একবার এই এমার্জেন্সির কুঠার আমার মাথায় এসে পড়েছিল। সেটা হল পণ্ডিত নেহরুর একটি কথা যেটা আমি ব্যবহার করেছিলাম একটি লেখাতে। সে কথাটি বাদ দিয়ে দেওয়া হয় সতর্কভাবে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

নেহরু সেই কথাটি লিখেছিলেন যখন ভারত স্বাধীন হয়নি তখন। যেটা আমি আগেও বলেছি যে কোনও সত্য একেক জনের কাছে একেক রকম। নেহরু কী লিখেছিলেন এবং আমি কথাটা কী ব্যবহার করেছিলাম। তিনি লিখেছিলেন: '...When 'Law' is but the will of the dominant faction and Order is the reflex of an all-pervading fear."

এমার্জেন্সি উঠে গেল বছর দেড়েক বাদে বা একটু পরে। প্রাথমিক ভাবে ইন্দিরা গাঁধী ধাক্কা খেলেন। নির্বাচনে হেরে গেলেন, একরাত্রি জেল খাটলেন। আবার তিনি ক্ষমতায় ফিরে এলেন। ক্ষমতায় থেকেই তিনি গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেলেন। নির্দয়ভাবে, নির্মমভাবে। তাঁর ক্ষমতায় থাকার পাঁচটি বছরও শেষ হল না। কদর্য ঘটনা।

সেই শাসনব্যবস্থাই চলতে লাগল। তাঁর সন্তান প্রধানমন্ত্রী হলেন। তিনিও নিহত হলেন। ভাবাই যায় না। সমগ্র দেশটা বিষাক্ত হয়ে গিয়েছে ঘৃণা ও সন্দেহে।

সেই ক্যানিব্যাল টাইম! নরখাদকদের সময়!

ঋত্বিক ঘটক মারা যায় এমার্জেন্সির সময়ে। নিষ্ঠুর মৃত্যু। এর জন্য এমার্জেন্সি দায়ী নয়। দায়ী সে নিজে। সেই সময় আমি 'মৃগয়া' ছবিটি করছিলাম। সত্যজিৎ রায় করছিলেন মুন্সি প্রেমচাঁদের একটি শক্তিশালী গল্পের ওপর নির্ভর করে 'শতরঞ্জ কী খিলাড়ি'।

বেশ কিছুদিন ধরেই আর্ট ডিরেক্টর বংশী চন্দ্রগুপ্ত সত্যজিৎবাবুকে বলছিল 'শতরঞ্জ কী খিলাড়ি' গল্পটার কথা, আর আমাকে বলছিল 'কফন' গল্পটার কথা। দুটি গল্পেরই লেখক মুন্সি প্রেমচাঁদ।

'শতরঞ্জ কী খিলাড়ি' সত্যজিৎ রায়ের প্রথম হিন্দি ছবি। সময়টা হল ১৯৭৬-'৭৭ সাল। অভিনয়ে ছিল ভাল ভাল অভিনেতা। সঞ্জীবকুমার, সৈয়দ জাফরী, শাবানা আজমি, টম অলটার এবং আরও অনেকে। সঙ্গে অসাধারণ অভিনেতা রিচার্ড অ্যাটেনবরো। বংশী চন্দ্রগুপ্ত খুব নিখুঁতভাবে সেই সময় সেই কালকে ধরবার জন্য জামাকাপড় সাজসজ্জার জিনিসপত্র জোগাড় করে।

১৯৭৫-'৭৬ সালে মৃগয়া তৈরি হয়। একটি ওড়িয়া কাহিনি। একটি সাঁওতাল যুবকের সঙ্গে এক বয়স্ক ইংরেজ আমলার ঘটনা। দু'জনের মধ্যে যখন দেখা হয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তখন দু'জনেরই কোনওরকম মিল ছিল না। কিন্তু দুজনের একটা শখ ছিল, একই শখ। ইচ্ছে ছিল যা সেটি হল শিকার করা। সে এক বিরাট খেলা।

সাঁওতাল যুবক ভাল শিকারি, ভাল স্বামী। প্রেমিক স্বামী একদিন ভীষণ রেগে গেল যেদিন তার জমিজায়গার মালিক তার বউকে অপহরণ করল। সে ক্ষেপে গিয়ে আদিম যুগের শিকারির মতো হয়ে উঠল। সে মালিককে খুন করল ঠিক যেভাবে বন্য শুয়োরকে খুন করা হয়। যেমন ভাবে বাঘ শিশুকে মেরে ফেলে। এই জঙ্গলে সবচাইতে হিংস্র খেলায় সে জিতল। পুরস্কার পেয়ে সে ট্রফি জিতে নিয়ে এল। যাঁর কাছে নিয়ে এল সে একজন সত্যিকারের শিকার বোদ্ধা। রাজার রাজা। ইংরেজ রাজা। সেখানে তার বিচার হল। সে পুরস্কারস্বরূপ পেল ফাঁসির হুকুম। সেই সাঁওতালের ফাঁসি হল।

ছবিতে ফাঁসিটা দেখানো হয়েছে চিরাচরিত প্রথাতে। একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। কিন্তু মৃগয়া ছবিতে এটাই সব নয়। আরও কিছু। ফাঁসি হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছবি চলে যায় একটি বিশাল পাহাড়ের ওপর যেখানে কোনও গাছপালা নেই, শুধু কতগুলো বোল্ডার পড়ে আছে। বিশাল বিশাল বোল্ডার। ধীরে ধীরে ভোরের আলো ফুটছে। চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে সাঁওতাল যুবকেরা, সাঁওতাল রমণীকুল আর আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই। দাঁড়িয়ে আছে নীরবে সেই শেষ, সেই অন্তিম লগ্নের জন্য।

আমার কাছে এটি একধরনের পুজোপাঠ, রিচুয়াল। আমরা যারা ছবি তৈরি করি এটা তাদের সংযোজন। ঠিক সাঁওতালি কোনও জীবনগাথা নয়।

মোটামুটি সবাই নতুন। সবাই নতুন মুখ। মিঠুন চক্রবর্তী, মমতাশংকর, বব রাইট ও তাঁর স্ত্রী আর আমার অনেকদিনের বন্ধু সেই গণনাট্য সংঘের সজল রায়চৌধুরী। প্রত্যেকে সুন্দর অভিনয় করেছেন। চরিত্রের দাবি অনুযায়ী অভিনয় করেছেন সবাই।

২৪ ডিসেম্বর, ১৯৭৫। আমি আমার ইউনিট নিয়ে যখন তৈরি হচ্ছি পরের দিন ভোরবেলা লোকেশনে যাওয়ার জন্য ঠিক সেদিনই ঋত্বিক ঘটক আমার বাড়িতে এসে হাজির। সঙ্গে একটি যুবক, বোধহয় সাহায্যকারী। বোধহয় হাসপাতাল থেকে ঋত্বিক ছাড়া পেয়েছে অথবা জোর করে হাসপাতাল থেকে এসেছে নিজের দায়িত্বে। আমরা আর আমার বাড়ির সবাই খেয়াল করলাম ঋত্বিক হাঁ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

করে নিশ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করছে। কথা বলছে, হাসছে। ঋত্বিক বোধহয় গীতাকে খুঁজছিল। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'গীতা'।

গীতা ঋত্বিককে দেখে ভয় পেয়ে গেল। ঋত্বিক ভীষণ রোগা হয়ে গিয়েছে। লিকলিকে রোগা। জীবনীশক্তি যেন আর নেই। ঋত্বিক বলল 'আমার খিদে পেয়েছে।' গীতা রান্নাঘর থেকে কিছু একটা নিয়ে এল ওর খাওয়ার জন্য। ঋত্বিক অনেকটা খেল। বলল, 'আর মদ খাব না।'

একটা ঢেঁকুর তুলে বলল, 'আমি আর বেশিদিন বাঁচব না।' গীতাকে পাশে বসতে বলল। গীতা পাশে বসল। তখন ঋত্বিক আবার বলল, 'আমি আর বেশি দিন বাঁচব না।'

'মদ না ছাড়লে কী করে বাঁচবেন আপনি।' বলল গীতা।

'আমি আর মদ খাব না।' তারপর আমার দিকে উদাসদৃষ্টিতে তাকিয়ে গীতাকে দেখল।

'গীতা, মৃণাল খুব ভালমানুষ। কিন্তু ওর 'ভুবন সোম', ফুঃ!'

সেই ভয়ংকর ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৬-এর রাত এল। আমরা দু'দিন আগে লোকেশন থেকে ফিরেছি। তৈরি হচ্ছি সেই ফাঁসির দৃশ্য করবার জন্য মৃগয়া ছবিতে। সন্ধেবেলা ঋত্বিকের মেয়ে ফোন করল। নিষ্ঠুর টেলিফোন।

'কোথা থেকে কথা বলছ?' বললাম আমি। বিপদের গন্ধ পেলাম।

'হাসপাতাল থেকে।' ওপাশ থেকে উত্তর এল।

আমি বুঝলাম ঋত্বিক খুব তাড়াতাড়ি অন্তিম লগ্নের দিকে এগিয়ে চলেছে।

আমি গীতাকে বললাম সত্যজিৎকে ফোন করতে।

আমি দৌড়ে চলে গেলাম হাসপাতালে।

হাসপাতালের সুপার আমাকে বললেন দোতলায় চলে যান ওই ঘরটায়। ঋত্বিক ঘটক অন্তিমশয়নে। আমি ঋত্বিকের পাশেই ছিলাম। তাঁর মেয়ে এবং একজন পারিবারিক বন্ধু অপেক্ষা করছিল।

ঋত্বিক আমাকে আর দেখতে পায়নি। কিন্তু আমি ওর পাশেই ছিলাম। শেষ সময়ে দুটি অল্পবয়েসি ডাক্তার অনেক চেষ্টা করেছিল যদি বাঁচানো যায়। একটার পর একটা ডাক্তার জোর করে মুখের ভেতর নিঃশ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করেছিল যদি মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানো যায় অন্তত কিছুদিনের জন্য, অন্তত কিছুক্ষণের জন্য।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ঋত্বিক বাঁচল না। রাত্রি এগারোটা পাঁচ মিনিটে সব শেষ হয়ে গেল। বোধহয় মরে গিয়ে ঋত্বিক বেঁচে গেল। মৃত্যুর কয়েকবছর আগের সময়গুলো ছিল ভয়ংকর।

অনেকগুলো বছর কেটে গেল কিন্তু তবুও প্যারাডাইস কাফের সেই সব ছবি, সেই সব মুহূর্ত ভেসে আসে। আমার চিন্তাভাবনায় জীবনের চেয়েও বড় ঋত্বিক বেঁচে আছে।

অবাধ্য ঋত্বিক, হৃদয়হীন ঋত্বিক, শৃঙ্খলাহীন ঋত্বিক আবার সবার ওপরে সম্মাননীয় ঋত্বিক! এখনও সেভাবেই বেঁচে আছে।

স্ত্রী, পুত্র ভোরবেলা প্রথম ট্রেনে চলে এসেছিল। লক্ষ্মী ঋত্বিকের স্ত্রী তখন কলকাতা থেকে একশো পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে একটা স্কুলে পড়ায়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নবম অধ্যায়

'যেখানেই আমি যাই সেখানেই কোনও-না-কোনও ঘটনা ঘটে।' কে বলেছিল এই কথাটি! এরকম ধরনের কথা।—বলেছিলেন পাবলো নেরুদা। কবিতার একটি লাইন। লাইনটি নেরুদার ছোট্ট এক কবিতার বই থেকে—'রেসিডেন্স অন আর্থ।'

আমি বলি, জিজ্ঞেস যদি করো কোথায় তুমি এতদিন ছিলে, আমি বলব, যেখানেই আমি যাই সেখানেই কোনও-না-কোনও ঘটনা ঘটে।

এবার সেটা ঘটল হায়দরাবাদ থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরে তেলেঙ্গানায়। হায়দরাবাদে নিজামের শাসনকাল। কোনও একটি গ্রামে একটি মহিলা শ্রমিককে তাঁর সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্য আধঘণ্টা ছুটির আবেদন করতে হয়েছিল। সেই মহিলাটি ছিল এক কৃষি শ্রমিক। মহিলাটিকে নিজের বুকে হাত দিয়ে স্তন বের করে চেপে ধরে দেখাতে হয়েছিল সেই কৃষিজীবী মালিককে, সেই জোতদারকে। আমি সেই গ্রামটি খুঁজে পেলাম। সেই গ্রামের মানুষজন আর প্রযোজক আমাকে বলল, এই আপনার জমি, এখানেই আপনার ছবি করুন। তবে হ্যাঁ, একটি মাত্র শর্ত, ছবিটি করতে হবে তেলুগু-তে।

এই ছবির চিত্রনাট্য আমার বন্ধু মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে বসে আমাকে করতে হয়েছিল। গল্পের নাম 'কফন'। প্রেমচাঁদের মৃত্যুর আগে শেষ গল্প। সেই ১৯৩৬ সালের ঠিক আগে।

প্রেমচাঁদের গল্পের শুরু শীতের রাত, একটি ছোট্ট গ্রাম। যেখানে তখন একটি যুবকের গর্ভবতী স্ত্রী সন্তান প্রসবের সময় অজ্ঞান হয়ে গেল। কখনও জ্ঞান ফিরে আসে, আবার অজ্ঞান, তারই মাঝে চিৎকার, অসহ। চলে সূর্য ওঠার ভোর পর্যন্ত। এ ব্যাপারটা অবশ্য চিত্রনাট্যের শেষের দিকে এসেছে। ছবিটির শুরু এবং মাঝখানের অংশটা একটা সময়কে আমরা ধরেছি আমাদের মতো করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

অবশ্যই মূল কাহিনির ওপর ভিত্তি করে। ছবিটির নাম দিলাম 'ওকা উড়ি কথা'। 'একটি গ্রামের গল্প'। ছবিটিতে তিনটে মূল চরিত্র। বাবা, ছেলে এবং তার স্ত্রী। ছেলেটির অল্পবয়সি যুবতি স্ত্রী। মেয়েটি খাটত, সংসারের ওই একজনই। এখানে ওখানে কাজ করে কিছু অন্ন জোগাত।

চিত্রনাট্য লিখতে গিয়ে প্রাথমিক অবস্থায় বেশ বেগ পেতে হয়েছে আমাদের। ছবিটির শুটিং করতে গিয়েও একই অবস্থার সামনাসামনি আসতে হয়েছে। বেশি ছাড়া কম নয়। প্রেমচাঁদের গল্পের অবস্থান ছিল উত্তরপ্রদেশের একটি গ্রাম। অসহ্য শীত। যখন চিত্রনাট্য তৈরি করতে শুরু করি তখন বাংলার গ্রামের দৃশ্যাবলি চোখের সামনে ভাসে। তখন সহনীয় শীত, কখনও বা তাও নয়।

আমরা অনেকগুলো জায়গা ঘুরে বেড়ালাম। উত্তরপ্রদেশ থেকে অন্ধ্রপ্রদেশ, এমনকী, পশ্চিমবাংলায়ও। অবশেষে সেই দক্ষিণ ভারতের তেলেঙ্গানাতেই ছবিটি তৈরি হবে সিদ্ধান্ত হল। শীতের ছিটেফোঁটাও নেই, গরম, অসহ্য গরম। জানতে হল অনেক কিছু—এ অঞ্চলের পোশাকপরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, স্থানীয় গ্রামীণ প্রথা, পূজাপার্বণ, মানুষের নানা অভিব্যক্তি এবং কতই না খুঁটিনাটি। আর ভাষা—তেলুগু। অভ্যস্ত হওয়ার ব্যাপার-স্যাপার যতটা বলা সহজ ততটা বাস্তবে নয়। বড় কঠিন। ওদের সবকিছুই ভালবেসে ফেললাম সেসবও খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়। যতক্ষণ না আমরা একটা ভালবাসার সম্পর্ক তৈরি করতে পারছি এবং যে পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে চরিত্রগুলো বড় হয়ে উঠছে, সংযোগ গড়ে তুলছে, কখনও বা সম্পর্ক ভেস্তে যাচ্ছে সেসব ব্যাপারেও যতক্ষণ না সড়গড় হতে পারছি ততক্ষণ দূরত্ব থাকবেই। এখানেই বলা যেতে পারে একটা বড়মাপের কথা। জওহরলাল নেহরুর আমলে প্রথম, হয়তো প্রথমই, জাতীয় অধ্যাপক সুনীতি চট্টোপাধ্যায় যে কোনও সেমিনারে শুরুতেই বলতেন, 'আপনারা তো আপনাদের পেপার সাবমিট করবেন ইংরেজি ভাষায়। কিন্তু শুরুর আগে আপনাদের সবাইকেই দু'-তিন মিনিটে বলতে হবে নিজ নিজ ভাষায়। তারপর, যেমন বলার, ইংরেজিতে। কারণ, ওই দু'-তিন মিনিট অন্য ভাষাভাষীরা অপরিচিত ভাষার সংগীত শুনবেন।' চমৎকার, সবাইকে কাছে টেনে আনার এক অপূর্ব ব্যবস্থা। অর্থাৎ সবকিছুতেই দূরত্ব ভাঙতে হবে। এমনকী, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষার ক্ষেত্রেও। ছবি যদি হয় দারিদ্র্য আর শোষণের, তা কি ঋতু-নির্ভর?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ছবির কথায় ফিরে আসি, ফিরে আসি দারিদ্র্য আর শোষণের কথায়। যা ছড়িয়ে রয়েছে সর্বত্র—গ্রামেগঞ্জে দেশদেশান্তে। আমাদের ছবির গ্রামে তো বটেই। সেবার ছবিটি দেখানো হল কান চলচ্চিত্র উৎসবে, ডিরেক্টরস ফোর্টনাইট বিভাগে। আর্জেন্টিনা-র ফার্নান্দো সোলানাস তখন পালিয়ে বেড়াচ্ছেন এদেশে-ওদেশে, দেশে ফেরার পথ নেই। কান চলচ্চিত্র উৎসবে আমাদের ছবিটি দেখলেন, খুঁজে বার করলেন আমাকে, বললেন, 'আপনার ছবি বারবার আমার দেশের দারিদ্র্য ও শোষণের কথা মনে করিয়ে দেয়। কোনও তফাৎ দেখি না আমার আর আপনার দেশের মধ্যে। ঘটনার হেরফের অবশ্যই আছে, তবু...।'

পাবলো নেরুদার কথাটা আবার মনে পড়ল: যেখানেই আমি যাই না কেন সেখানেই কোনও-না-কোনও ঘটনা ঘটে।

আর দশটা গ্রামে যা হয়, এখানেও তাই। সবাই গরিব, ভাতকাপড় জোটে না। অথচ কাজের অভাব নেই এই গ্রামে। কাজের জন্য কাউকেই ছোটাছুটি করতে হত না। যদিও মালিকের পায়ে পড়ে দু'-চার ফোঁটা চোখের জল ফেলতে হত। নিয়মের দাস বলেই হয়তো। দুটো পয়সার লোভে চুটিয়ে কাজ করে যেত, কিন্তু কাজের শেষে হাত পাতলেই লবডঙ্কা। না মেলে খোরাক, না খোরাকি। লোকগুলো কান্নাকাটি করে, কিন্তু ছবির বাপবেটা দেখে শোনে আর খ্যাক খ্যাক করে হাসে। বলে, খেতে পায় না, কাজ করতে যায় কেন। গোবরগণেশ!

আর এরা! বাপবেটা। কাজকর্মের ধারে কাছে নেই। দু'জনেই নিপাট কামচোর। একদিন কাজ করে তো তিনদিন গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ায়। কোনও কোনও দিন রাতের বেলায় মালিকের খেতখামারে গিয়ে আলুটা মূলোটা গাজর শিম বেগুন যখন যা জোটে থলে আর কোঁচড়ে পুরে অন্ধকারে চম্পট। ধরা পড়লে বেদম প্রহার। হাজতবাসের ভয় দেখায় না এমনও নয়। কিছুতেই কিছু হয় না। যখন জোটে না কিছুই, খালি পেটে শুয়ে পড়ে, বাপবেটায় গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে। এক-আধবার নাকি স্বপ্নও দেখেছে।

গ্রামের লোকজন ওদের কাণ্ডকারখানা দেখে আর বলে, 'লোকদুটো কী! মানুষ, না কী!' আর সবাই ভাবে, কি ঘরের, না, বাইরের, কী বলা যায় এদের: বাবা আর বাবার মন্ত্রশিষ্য ছেলে, দুজনেই বাস্তবের বেড়া ডিঙিয়ে এক আসুরিক

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ফ্যান্টাসির দুটো নির্মোহ চরিত্র, আর ছেলেটির গর্ভবতী স্ত্রী যেন বাস্তবের কঠিন সংগ্রামের নিষ্ঠুর নিদর্শন।

বাবার চরিত্রে অভিনয় করতে ডাকা হল বাসুদেব রাওকে। বেঁটেখাটো শক্তপোক্ত একজন। খাটিয়ে মানুষ। দেখেই আমার মনে হল যেন এক প্রাগৈতিহাসিক গুহার মানুষ। আমার ডাক শুনে বেরিয়ে এসেছে খোলা আকাশের নীচে। আশ্চর্য মানুষ, আশ্চর্য অভিনয়।

একদিন শুটিং হচ্ছিল। তখন রাত বারোটা হবে, বাপবেটা উঠোনে বসে কথা বলছিল, আর পুত্রবধূ ঘরের মধ্যে যন্ত্রণায় ছটফট করছিল, কখন যে কী হবে বলা যাচ্ছে না। বাইরে উঠোনে বাবা বলল, 'আজ রাত্তিরে কিছু হবে না, যা, ঘুমিয়ে পড়।' কথাটা বলে বাবা হাই তুলল। ঠিক জমল না। আবার হাই তুলল। একেবারেই ঠিক হচ্ছে না। আমি কিছুতেই বাসুদেবকে বাগে আনতে পারছি না। তখন প্রায় সাত-আটবার হাই তুলেছে বাবা। শেষ পর্যন্ত কিছুতেই কিছু করতে না পেরে বলল, 'সারাজীবন আমি কাজই করেছি, হাই তুলিনি।'

বাসুদেব রাও জন্মেছিল অত্যন্ত গরিব পরিবারে। গরিবের তস্য গরিব। হতদরিদ্র পরিবারের সন্তান। বাসুদেবের কোনওরকম কেতাবি শিক্ষা নেই বললেই চলে। স্কুলের গণ্ডীতে কোনওদিন পা মাড়ায়নি বাসুদেব রাও, এমনকী প্রাথমিক বিদ্যালয়ও নয়। স্কুলে পাঠাতে না পেরে বাসুদেবের বাবা বাসুদেবকে গ্রামেরই একটি যাত্রাদলে পাঠিয়েছিল। সে যাত্রাদলের নাম ছিল গুপ্পা কোম্পানি। সেখানে ওকে গান গাইতে হত, নাচতে হত কখনও কখনও।

অসহায় বাসুদেব তার পরিবার ও বাড়ি ছেড়ে এই যাত্রাদলে যোগদান করবার আগে সে মাঠে গিয়ে মাথা উঁচু করে উচ্চস্বরে কাঁদত। কেবলই কাঁদত। বাসুদেবের বাবা বললেন, সবরকম কষ্টকে মোকাবিলা করতে হবে। ভয় পেলে চলবে না। ঘাবড়ালে চলবে না, চিন্তা করিসনি। 'পরোয়া নেহি।'

একটি কথাই জানত যে বাঁচতে হবে। পরোয়া নেহি। সে কোনওদিনই ভাবেনি যে বাবার এই উপদেশ তার জীবনে পাথেয় হয়ে দাঁড়াবে। এ উপদেশটিই তার জীবনের মানে। কাজ করতে হবে। অবসর বিশ্রামের অবকাশ নেই এ জীবনে। হাই তোলা তো বিশ্রাম, অবসর। তাই শটটা দিতে গিয়ে সামান্য হাই তুলতে বারবার বাসুদেব হোঁচট খাচ্ছিল। শটটা ঠিক হচ্ছিল না। আমি আমার জীবনে কখনও এইরকম অভিনেতা দেখিনি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

কৃষ্ণমূর্তি আমাদের ইউনিটে আর একটি ভালবাসার পাত্র। লম্বা, ছিপছিপে কালো এবং আমার সমবয়সি। আমি তাকে চিনতাম না, জানতাম না। কমিউনিস্ট নেতা পি সুন্দরায়া কৃষ্ণমূর্তিকে আমাদের ক্যাম্পে পাঠান। আমি পি সুন্দরায়াকে বলেছিলাম যদি তেমন কেউ থাকে যে এখানকার এই অঞ্চলের রীতিনীতি আচার ব্যবহার ভাষা কৃষ্টি সব জানে এমন কোনও মানুষকে আপনি আমার কাছে পাঠাতে পারেন। আমাদের ইউনিটে থাকবে কাজ করবে যতদিন আমরা এখানে থাকব।

প্রথমদিন কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গে আমার দেখা হল। সে আমাকে বলল যে, সে আমাদের সঙ্গে কাজ করবে। সে কাজ ভালবাসে। আর কিছু নয়। কৃষ্ণমূর্তিও কোনওদিন স্কুলে যায়নি। যা কিছু শিখেছে সবই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। স্কুলের শিক্ষা তার নেই। রয়েছে যেটা সেটা হল অভিজ্ঞতা। বলল, 'তিনবার জেল খেটেছি, তিনবারই পালিয়েছি। লড়াই করেছি সারাজীবন।'

কৃষ্ণমূর্তি আমাদের সবাইকার কাছের মানুষ হয়ে দাঁড়াল। বিশেষ করে মমতাশংকরের কাছে। সারা রাত বারবার অজ্ঞান থেকে ভোরবেলা সেই গর্ভবতী নারী মৃত্যুর কাছে হেরে গেল। অনেক যত্ন ও ভালবাসা নিয়ে সে মমতাশংকরকে শিখিয়েছিল কী করে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে হয়, কী করে রাঁধতে হয়, কী করে জামাকাপড়, থালাগেলাস ধুতে হয়, কী করে উঠোন পরিষ্কার করতে হয়, কী করে কুয়ো থেকে জল তুলতে হয়, কী করে পাথুরে মাটি ব্যবহার করতে হয়। মমতাশংকরকে হাত ধরে ধানের খেতে নিয়ে গিয়ে দেখাল এখানকার মেয়েরা কীভাবে শাড়ি পড়ে। সমস্ত কিছু একেবারে নিখুঁতভাবে সে শেখাল মমতাশংকরকে। এর একটাই কারণ যে সে অন্যান্য অনেক ছবিতে দেখেছে ছবির অভিনেত্রীরা এমনভাবে সাজে বা এমনভাবে অভিনয় করে যে সবকিছু মনে হয় নকল, মেকি। বাস্তববর্জিত সাজপোশাক, আচার ব্যবহার। এসব কারণে মমতাশংকর কৃষ্ণমূর্তির ওপর ভীষণ নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল।

একদিন শুটিং চলাকালীন কৃষ্ণমূর্তি একটি দৃশ্যে দেখল একজন অভিনেতা এমনভাবে একটি বাক্য ব্যবহার করছে যে বাক্যটি সুপ্রযুক্ত নয়। সে অভিনেতাটি একটি চাষির ভূমিকায় অভিনয় করছিল। চাষির মুখে এ ধরনের বাক্য আসতে পারে না। সে প্রতিবাদ করল এ ব্যাপারটাকে কেন্দ্র করে।

'কী হল,' আমি অবাক হলাম।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'আপনারা একটা চাষির মুখে ভুল বাক্য, ভুল শব্দ বসিয়ে দিয়েছেন।'

আমি একটু অনুসন্ধিৎসার চোখে তাকালাম ওর দিকে। সে বলল, 'এটা তো সেই বুড়ো লোকটার ব্যাপার। সেই বাপটা। যার সম্পর্কে বলা হল: সে পান চিবোয়, খায় আর ঘুমোয়, ঠিক জলে থাকা মোষের মতো।'

'ঠিকই। ঠিকই বলেছ তুমি। আমি বলতে চাই সে অলস। কাজ করতে চায় না।'

'অলস!' কৃষ্ণমূর্তি অবাক হল। একটু দুঃখ পেল কথাটা শুনে। 'আপনারা শহরের লোক। আপনারা এসব বুঝবেন না। জলে যে মোষগুলো থাকে ওগুলো অলস নয়, ওগুলো রীতিমতো শ্রম দেয়, খাটে। আমরাও ওদের মতো, ওই মোষগুলোর মতো খাটি, পরিশ্রম করি। ওই মোষগুলোই আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে।'

ছবির অভিনেত্রী সবসময় নকল আর মেকি সেজে সবকিছু যেমন গোলমাল করে দেয়, ওই চাষিটার মুখে এই কথাটাও তেমনি সবকিছু গোলমাল করে দিল। বাস্তববর্জিত কথা! সম্পূর্ণ বাজে ও মেকি!

মোহিত আর আমি বুঝতে পারলাম আমরা ভেবেছি ভুল। কৃষ্ণমূর্তি ঠিক বলছে। শহরের আবহাওয়ায় বড় হয়ে মানুষ হয়ে আমরা ঠিক নই আমাদের কাজের জায়গায়। সুখের বিষয় আমরা ওই দৃশ্যটি বাদ দিতে পেরেছিলাম। দৃশ্যটি অন্যভাবে ভাবা হল।

উনিশ দিন বাদে একটি ভাল ছবির কাজ শেষ করে চলে এলাম। কত কী শিখলাম, কত কী জানলাম। কত কী না-শেখা, না-জানা রয়ে গেল। আরও সতর্ক হলাম কাজের ব্যাপারে। আরও যত্ন নিলাম সচেতনভাবে।

কলকাতায় ফিরে এসে দেখলাম বাড়ির দোড়গোড়ায় আমার ছেলে কুণাল লাফাচ্ছে। বামপন্থী সরকার নির্বাচিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে বিপুলভোটে জয়লাভ করে। সেসব কিছু নয়। কুণাল নিশাকে ভালবাসে। ওঁরা দু'জনে একটা দিন আনন্দ করবে। এক সপ্তাহ আগে ব্যাপারটা সবাই জেনেছে। গীতা সব ব্যবস্থা করেছে। আমি জানলাম কলকাতায় এসে। সুখবর, ভাল খবর। সুতরাং ঘটনা ঘটছে। যেখানেই যাই কোনও-না-কোনও ঘটনা ঘটছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শুটিং-এর পর বাকি কাজ প্রায় চার সপ্তাহের। তারপরই প্যারিস থেকে আলজেরিয়া চলে যেতে হল। আমাকে একদিনের জন্য প্যারিসে থাকতে হল পরের দিন সকালের বিমান ধরবার জন্য।

প্যারিসে আমার দেখা করার কথা ছিল এক বন্ধুর সঙ্গে সেই সিনেমাথেক ফ্রাঁসে! সিনেমাথেক যদিও সবচাইতে বড় নয় তবুও সার্থকনামা জায়গা এটি। সেখানে একটি সুন্দর আর্কাইভ আছে এবং একটি বিরাট চত্বর আছে যেখানে সিনেমা-সংক্রান্ত সমস্ত আলোচনা কাজকর্ম চলে। এবার ওই জায়গায় আমার দ্বিতীয়বার যাওয়া হল। সময়টা ১৯৭৭ সাল। প্রথম গিয়েছিলাম ১৯৬৯ সালে। অসাধারণ একটি ভ্রমণসূচি ছিল সেটি।

১৯৬৯ সালে আমি আমার ছবি 'ভুবন সোম'-এর জন্য ভেনিসে যাই। ভুবন সোমের প্রথম প্রদর্শনীর দিন আমি খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। সেখানে চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য দর্শকদের ভিড়, বিশিষ্ট মানুষদের উপস্থিতি—সব মিলিয়ে একটা ভয় ভয় ভাব, একটা অস্বস্তি আমাকে তাড়া করছিল।

পরের দিন সকালে হোটেলে একটা টেলিফোন আসে। প্যারিস থেকে টেলিফোন এবং টেলিফোনের ও-প্রান্ত থেকে কথা বলছেন আঁরি লংলোয়া। ইনি সিনেমাথেকের সর্বেসর্বা। স্মরণীয় মানুষ। তাঁর মতো মানুষের টেলিফোন, তাঁর মতো মানুষের কণ্ঠস্বর আমাকে অবাক ও মুগ্ধ করেছিল। কেন অবাক হব না। অতবড় মাপের মানুষ যিনি পৃথিবীর সমস্ত সিনেমাসমাজের 'রক্ষাকর্তা' তিনি আমাকে টেলিফোন করছেন এটাই তো অনেক বড় ব্যাপার। যিনি কারও কাছে কোনও জবাবদিহি করার জন্য বসে নেই। আন্দ্রে মালরো-র কাছেও নয়।

টেলিফোনে নিজের পরিচয় দিলেন। তিনি সরাসরি বললেন ভারতে ফেরবার আগে প্যারিসে ভুবন সোম ছবিটি নিয়ে আসতে পারি কি না। যদি অন্য কোনও পরিকল্পনা বা অন্য কোথায়ও যাওয়ার ব্যাপার থাকে তাহলে সেটি পরিবর্তন করে এখানে এলে আমি খুবই বাধিত হব। আপনাকে কথা দিতে হবে। প্রায় আদেশের সুরে উনি কথাটা বললেন।

ব্যাপারটা হল লংলোয়া এভাবেই কথা বলে থাকেন। সেটা আমি পরে জানতে পেরেছি। আমি পরে শুনেছিলাম উনি অল্প কথার মানুষ। আমি অবাক হয়ে গেলাম। ভাবলাম কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কী আশ্চর্য ঘটনা ঘটল ভেনিস আর প্যারিসের যাত্রাপথে আমার অজানা অচেনা ভুবন সোম ছবিটিকে নিয়ে। এবং

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আমাকে নিয়ে। কোনও বন্ধুবান্ধব অবশ্যই ভেনিসে ভুবন সোম ছবিটি দেখেছেন, আমার সঙ্গে কথা বলেছেন এবং তাঁরাই ওঁকে সংবাদটা এবং আমার পরিচিতি জানিয়েছেন। আমি ভাবছিলাম কারা হতে পারেন। দুই ভদ্রমহিলার মধ্যে কোনও একজন, কেননা তাঁরাই আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন, আমার হোটেলের নাম জেনে নিয়েছিলেন, ফোন নাম্বারও টুকে নিয়েছিলেন। একজন মাদাম কাওয়াকিতা, বয়স্কা, বিখ্যাত মহিলা। জাপানি। যিনি কখনই একটা চলচ্চিত্র উৎসব থেকে আর একটি উৎসবে যেতে এই বয়সেও ক্লান্ত হন না। ইনিই সেই মহিলা যিনি জাপানি চলচ্চিত্রকে ইউরোপ আমেরিকায় পৌঁছে দিতে পেরেছেন। আর একজন মহিলা যিনি প্রায় মাদাম কাওয়াকিতার সমবয়েসি লোটে আইসনার। তিনি বিখ্যাত কম্পোজার হান্স আইসনারের স্ত্রী। হান্স আইসনার আবার জাত কমিউনিস্ট। যাকে আমেরিকার সক্রিয় কর্মীদের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে একটা সময়ে।

ভেনিস থেকে আমি প্যারিসে চলে এলাম। অন্য পথে ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসব কমিটি মারফত 'ভুবন সোম' চলে গেল লংলোয়ার কাছে। নির্ধারিত দিনে ঠিক সময়ে পৌঁছে গেলাম সিনেমাথেকের অফিসে এবং এটাই প্রথমবার। আমার কয়েক মিনিট দেরি হয়েছিল। এক বিশাল চেহারার লম্বা ভদ্রমহিলা সিঁড়ির নীচে অপেক্ষা করছিলেন আমার জন্য। বললেন, 'আমার মনে হয় আপনিই মৃণাল সেন। লংলোয়া আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।' ভদ্রমহিলা আমাকে প্রায় পুরুষের মতো ধাক্কা দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। আমি সিঁড়িতে ধাক্কা খেয়ে প্রায় পড়েই যাচ্ছিলাম। যাইহোক ভূতলে ধরাশায়ী হলাম না। বেঁচে গেলাম। যখন লংলোয়ার ঘরে ঢুকলাম তখন আমি বুঝলাম আমি নিরাপদ। বেশ সহজ, সাবলীল। অনেকক্ষণ কথা বললাম। আমি জানতাম লংলোয়া অল্প কথার লোক, তাই আমি খুব সতর্ক ছিলাম। আমি বুঝলাম তিনি আমার সঙ্গে কথা বলে খুশি।

লুই মালের কাছে এক গল্প শুনেছিলাম। গল্প মানে গল্পেরই মতো। লংলোয়া জড়িয়ে আছেন সেই গল্পে।

সেই সময়ে সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রের রেট্রোস্পেক্টিভ সবে শেষ হয়েছে। 'সিনেমাথেক'-এর এক বিশেষ সাফল্য। তখন লংলোয়া ঠিক করলেন একমাস ধরে তাঁর সিনেমা হলে ভারতীয় ছবির প্রদর্শন হবে এবং সেই ব্যাপারে বিভিন্ন পরিচালকের ছবির প্রিন্ট জোগাড় করার কাজ চলতে লাগল। প্রত্যেকটি ছবি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নিজে দেখে নিলেন। একটি ছবিও বাদ দিলেন না। যত্ন করে মনোযোগ দিয়ে লংলোয়া প্রতিটি ছবি দেখলেন।

আমাদের এক বিশেষ বন্ধু এবং চলচ্চিত্রকার বি ডি গর্গ বহুদিন প্যারিসে ছিলেন এবং ফরাসি ভাষা জানতেন। গর্গ-কে পাশে বসিয়ে লংলোয়া প্রায় সমস্ত ভারতীয় ছবি দেখে নিয়েছেন। গভীর উৎসাহ নিয়ে দেখেছেন। এটাই লংলোয়ার শিক্ষা। কোন ছবি কীরকম, কোনটা বাতিল করে দেবেন, কোনটা রাখবেন সবই লংলোয়ার পছন্দসই হওয়া চাই। হলও তাই। ১৯৬০ সালের 'বাইশে শ্রাবণ' দিয়েই মাসাধিককালের ছবির প্রদর্শনী শুরু করতে চান তিনি। কিন্তু মুশকিল ছবির শেষ রিল নিয়ে, দশ মিনিটের। খোঁজাখুঁজি চলল এবং শেষপর্যন্ত জানা গেল যাতায়াতের পথে রিলটি উধাও। যা উধাও তা তো আর গড়িয়ে নেওয়া সম্ভব হবে না। শেষ রিল ছাড়া ছবিটিই দেখাতে হবে এবং মাসাধিককালের উৎসব এভাবেই হবে। ছবির আগে ব্যাপারটা বলে দিলেই হবে। লংলোয়া তাই চান এবং বলার দায়িত্ব পড়ল লুই মালের ওপর। এই হল লংলোয়া!

একদিন প্যারিসে থেকে আমি আলজিয়ার্স-এ পৌঁছোই পরের দিন। ওইদিনই কাজের বাইরে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল ইথিওপিয়া-র হেইলে জেরিমার সঙ্গে। বয়স হয়তো চল্লিশ ছুঁই ছুঁই করছে। অথবা তারও দু'-তিন বছর আগে। আমার সঙ্গে আগে কোনওদিন দেখা হয়নি, কিন্তু চিনেছি ওর একটা ছবি দেখে, তাও কয়েক বছর আগে, পুনার ফিল্ম ইন্সটিটিউটে, একবার নয়, দুবার, একই দিনে, একা একা। অসাধারণ ছবি, প্রায় ঘণ্টা তিনেকের 'হারভেস্ট ৩০০০ ইয়ারস'। ওই একটাই, দ্বিতীয়বার আর ছবি করতে পারেনি, ছবি করতে দেওয়া হয়নি। দেশ ছেড়ে জেরিমাকে চলে যেতে হল আমেরিকায়, ইস্ট কোস্ট-এ, ছাত্র পড়াতে। বিষয়, সিনেমা। আবার একবার দেখা হল, সেবার নিউইয়র্ক-এ, একটা সেমিনারে। তখনও দ্বিতীয় ছবি করতে পারেনি, তখনও পড়াচ্ছে। জানি না কোথায় এখন, কী করছে।

সেদিনই, আলজিয়ার্স-এ দেখা হল মেড হোন্ডো-র সঙ্গে, মৌরাতানিয়ার মেড হোন্ডো, আফ্রিকায়। ওর একটাই ছবি দেখেছিলাম, 'সোলেই হো!' ছবিটি ভাল, বেশ ভাল। বাংলায় হয়তো 'সূর্য তর্পণ' বলা চলে। অনেক কথা হল দু'জনে। পরের দিন সকালে আমাকে বলল যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাকি একটা কবিতা আছে, 'আফ্রিকা' ইংরেজি তর্জমা করে ওকে পাঠিয়ে দেওয়া নিশ্চয়ই অসম্ভব

দুনিয়ার পাঠক এক হও

নয়। অবশ্যই সম্ভব, আমি বললাম। কিন্তু চিরকেলে অভ্যাস, পাঠাইনি। দেখাও হয়নি।

টুকরোটাকরা কাজ সেরে কখনও সখনও দেশ বেড়ানোর মেজাজে এদিকে ওদিকে ঘোরাফেরা করতাম। সঙ্গে স্থানীয় বন্ধু কেউ থাকত। একদিন শহরের বাইরে আলব্যের কামু-র বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম। তখন তিনি বেঁচে নেই। শোনা যায় তিনি নাকি বলতেন কোনও মৃত্যুরই কোনও অর্থ হয় না যদি না সেই মৃত্যু কোনও গাড়ির অ্যাকসিডেন্টে হয়। আশ্চর্য, কামু-র মৃত্যু এইরকমই হয়েছিল—গাড়ির অ্যাকসিডেন্টে।

কামু-র মৃত্যু এই কলকাতারই এক বিশিষ্ট শক্তিশালী কবি জীবনানন্দ দাশের কথা মনে করিয়ে দেয়। সবাই জানে, তিনি ট্রামে চাপা পড়ে মারা যান।

কখন যে কার কী হয় বলা যায় না। বড় কঠিন।

সব সময় যে কাজ নিয়ে পড়ে থাকি তা ঠিক নয়, ভাবি বিশ্রাম দরকার। বাড়ির কথা মনে পড়ে, কলকাতার কথা মনে পড়ে। বুঝি না কেন ডাক পড়লেই দৌড়ে যাই। ভবিষ্যতে আমাকে এ-ব্যাপারে পছন্দ অপছন্দের বিষয়টাও ভাবতে হবে। কলকাতায় ফিরে আসার পথে এ কথাটাই মনে হতে লাগল। কিন্তু বেশি দিন গেল না, আবার ছোটাছুটি। কখনও একা, কখনও বা গীতাকে নিয়ে।

দিল্লি থেকে খবর এল, চেকোস্লোভাকিয়ায় যেতে হবে, কার্লোভিভ্যারিতে, তেলেঙ্গানার ওপর ছবি নিয়ে। অর্থাৎ 'ওকা উড়ি কথা' নিয়ে। খবর শুকতে-না-শুকতেই তলব এল তেহেরান থেকে, শাহ-র রাজত্বে, রানীর পরিচালনায়। কিন্তু যে সমন এড়ানোর উপায় নেই, আমি উত্তেজিত, গীতাও খুশিতে ডগমগ তা হল চিন পর্যটন। চিনের নিমন্ত্রণ ছবি দেখা নয়, দেশটাকে ঘুরে ফিরে দেখানো।

তখন ১৯৭৮-এর জুলাই। ভারত-চিনের সম্পর্ক ক্রমেই সহজ হয়ে আসছে। কিন্তু সীমান্ত পারাপার তখনও বোধকরি শুরু হয়নি। হয়তো আমরাই প্রথম। আর ভ্রমণসূচি, একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত, দৌড়োদৌড়ির শেষ নেই। আর আমরা চারজন— আমি ও গীতা, একজন দোভাষী এবং এক বয়স্কা মহিলা। ভদ্রমহিলার দায়িত্ব ছিল নানা প্রশ্নের জবাব দেওয়া।

কতই না দেখলাম, কতই না শুনলাম, আর নতুন নতুন কত প্রশ্ন মাথায় এল, জানা অজানা কত। ভাবা যায় না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আমাদের যাত্রা শুরু হল বেজিং থেকে মাও সে তুং-এর স্মৃতিমন্দির দিয়ে, বিশাল, অপেক্ষমান দর্শকের বিরাট লম্বা লাইন, সবাই চিনের মানুষ, অধিকাংশই সৈনিক, আর মাত্র দুইজন ভারতীয়— গীতা, পরনে শাড়ি, আর আমি, পরনে চুড়িদার পাঞ্জাবি, সাদা। স্মৃতিসৌধের মাঝখানে শুয়ে আছেন মাও, শান্ত সমাহিত। দৃশ্যটি ভোলবার নয়।

চিনের প্রাচীর দিয়ে যাত্রা শেষ। অপার বিস্ময়!

চিন সফর শেষ করে আমরা ফিরে এলাম হংকং-এ। হংকং থেকে গীতা দেশে ফিরে এল, আর আমি টোকিও হয়ে প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়ে লস অ্যাঞ্জেলেস-এ এলাম। এলাম এক সপ্তাহের আলোচনাসভায় যোগ দেওয়ার জন্য। ব্যবস্থাপনায় ছিল আমেরিকান ফিল্ম ইনস্টিটিউট ও আন্তর্জাতিক আর্কাইভ কমিশন।

সর্বসাকুল্যে দলে আমরা সাতজন ছিলাম। সাতজনই বলতে কইতে পারতাম। বিষয় ছিল 'সিনেমা অ্যান্ড সোসাইটি'। আমরা সাতজন ছাড়া প্রতিদিনই দু'-একজন স্থানীয় বক্তা থাকতেন। আমাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন গ্রিসের মাইকেল কাকোয়ানিস, আমাদের সকলেরই প্রিয়। আর ছিলেন লিন্ডসে অ্যান্ডারসন (ইংল্যান্ড), অ্যানিয়েস ভার্দা (ফ্রান্স), ওসমান সেমবেন (সেনেগল), ইউসুফ শাহিন (মিশর), সুসুমো হানি (জাপান)। গল্পে-তর্কে সময় কেটে যেত ভালই। লিন্ডসে ছিলেন সবচেয়ে মজার মানুষ। গল্প জমাতে ওস্তাদ। কিং ভিডর একদিন এসেছিলেন, হলিউডের মস্ত পরিচালক, রিটায়ার করেছেন অনেক আগেই, কিন্তু রিটায়ারমেন্টের মেজাজ একেবারেই ছিল না। একদিনের জন্য এসেছিলেন, কিন্তু সমানে সমানে লড়াই চালিয়েছিলেন আমাদের সঙ্গে। সহজ সরল অকপট। সেদিক থেকে একেবারেই বিপরীত চরিত্রের মানুষ টনি রিচার্ডসন, ইংল্যান্ডের তিন লড়াকু চরিত্রের একজন। লিন্ডসে অ্যান্ডারসন, ক্যারেল রাইস আর টনি রিচার্ডসন। লিন্ডসে ঘুরে বেড়ান সর্বত্র, হার মানতে চান না, ক্যারেল মোটামুটি, কিন্তু টনি নিঃসঙ্গ। 'দ্য লোনলিনেস অব দ্য লং ডিসট্যানস রানার' আর 'টম জোনস' দিয়ে ব্রিটিশ চলচ্চিত্রে ঝড় তুলেছিলেন টনি, কিন্তু আর পেরে উঠলেন না। হলিউডে এলেন যদি কিছু করা যায়। কিছুই হল না। ফলে, এখন প্রায় নির্বান্ধব। আমাদের সাতদিনের আড্ডাতেও আসেননি। আমার সঙ্গে দেখা হল হলিউডের এক সান্ধ্য পার্টিতে। পার্টি যখন হইহুল্লোড়ে ভাসছে, আমি দেখলাম ভিড়ের বাইরে একা টনি রিচার্ডসন। আমি এগিয়ে গেলাম, ভাবলাম কিছু কথা বলি। না, বলিনি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দশম অধ্যায়

একটা সময় ছিল যখন আমি ক্রমাগত ঘুরে বেড়াচ্ছি এদেশে-ওদেশে, যদিও এগুলো সুখের ভ্রমণ, বা আনন্দের ভ্রমণ নয়। ফিরে এলাম নিজের দেশে। ভাবলাম দেশের মধ্যেই ঘুরে বেড়াব।

১৯৭৭ সালের জুন মাসে আমি এবং আমার ছবির ইউনিট তেলেঙ্গানাতে। 'ওকা উড়ি কথা'র শুটিং করছি। সেই সময়ে পশ্চিমবঙ্গে নতুন বামপন্থী সরকার গঠিত হয়েছে। আশা বেড়ে গেছে, প্রত্যাশা বেড়ে গেছে। সে এক উন্মাদনা। কিন্তু সরকারে যাঁরা এলেন তাঁরা এমন কোনও ম্যাজিক করতে পারলেন না যে রাতারাতি সবকিছু বদলে যাবে। সুতরাং দায়-দায়িত্ব রয়েই গেল। যেসব প্রত্যাশা পূরণের কথা বলা হয়েছিল সেসব প্রত্যাশা পুরোপুরি পূরণ হল না। সুতরাং উত্তেজনা উন্মাদনা হ্রাস পেতে লাগল। অন্যদিকে বেশ কিছু গভীর সমস্যার সমাধান হল। আবার নতুন সমস্যার সৃষ্টিও হল। যাঁরা স্বপ্ন দেখেছিল তাঁদের সব স্বপ্ন সত্যি হল না।

ইতিমধ্যে আমার এক বন্ধু শুভেন্দু মুখোপাধ্যায় একটি সাইক্লোস্টাইল করা বড় কাগজের পাণ্ডুলিপি একটি ফাইলে করে আমাকে দিলেন, যেটি কলকাতার রাস্তায় যাঁরা বাস করে তাঁদের ইতিহাস। তাঁদের জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি ইত্যাদি। এ ফাইলটি তিনি পেয়েছিলেন তাঁর অ্যানথ্রোপলজিস্ট ভাই ড. সুধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। এ ফাইলটিতে প্রায় একশোর বেশি কেসহিস্ট্রি আছে এবং এটি একটি সমীক্ষার ফল। এ ফাইলটি পড়লে সমগ্র দেশের কৃষি-অর্থনীতির চেহারাটা ধরা পড়ে। ফাইলটি তৈরি হয় সুধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে। আবার মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের বদান্যতায় জানা গেল যাঁরা এ শহরের ফুটপাতে বাস করে তাঁরা বেশিরভাগই গরিব চাষি। এদের কোনও জোত জমিজায়গা কিছুই নেই। যখন চাষবাস থাকে না, যখন গ্রামেগঞ্জে কোনও

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

কাজ নেই, তখনই তাঁরা এই শহরের ফুটপাতে ভিড় করে। এঁরা ফুটপাতের অন্ধকারে লড়াই করে। বাঁচার লড়াই। এ যেন এক 'শ্যাডো বক্সিং'। এ খেলাতে গ্রাম থেকে আসা মানুষটি একটি ক্ষুদ্র জীব, আর কিছুই নয়।

সেই আমাদের প্রাচীনকালের পুরাণে পাওয়া যায় যে পরশুরাম কাঁধে কুঠার নিয়ে কাঠ কাটতে যাচ্ছে, ছবিতে 'পরশুরাম' গ্রাম থেকে এই শহরে আসছে। সে বলত, সে এই কুঠার দিয়ে বনে বাঘ মেরেছিল। আর একজন রাস্তার বাসিন্দা যে ফুটপাতে বাস করে, সে মজা করে পরশুরাম নামটি দিয়েছিল এই কুঠার বাহককে। এই রাস্তার মানুষটা পুরাণের সে কাহিনিটাও বলেছিল যখন নামটা রাখা হয়। সেই পরশুরাম প্রতিশোধ নিয়েছিল তার কুঠার দিয়ে বিরোধী মানুষদের হত্যা করে। এভাবেই ভেবে নিয়ে ছবির কর্মযজ্ঞ শুরু হয় ফুটপাতের বাসিন্দাদের ওপর। এ ব্যাপারে সুধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সমীক্ষার কাজ হল মূল সূত্র। নতুন বামপন্থী সরকার এ ছবি তৈরির জন্য অনুদান দেয়, সম্পূর্ণ খরচ বহন করে এ ছবিটি তৈরি করবার জন্য। কিন্তু ছবিটি বক্স অফিসের মুখ দেখতে পায় না। ব্যবসা করতে পারে না। স্বাভাবিকভাবেই আমার হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসে কিছুদিনের জন্য।

আবার কিছুদিনের জন্য বিদেশ গেলাম, আবার তাড়াতাড়ি এখানে ফিরে এলাম। এখানে ফিরে এসে এদিক ওদিক দেখছি এবং পিটার বোইসের একটা লাইন বারবার মনে করতে লাগলাম।—'আমি নিজের মাথার চুল ধরে তুলে নিজেকে টেনে নিয়ে আয়নার দিকে তাকাই।' আমিও যেন নিজের ভেতরে নিজেকে খুঁজে পেতে চেষ্টা করলাম। নিজের মনের ভেতরে। আমার ভেতরে যে শত্রু আছে তাকেও ধরবার চেষ্টা করলাম। নিজের দিকে তাকালাম। সৃষ্টি হল 'একদিন প্রতিদিন'। এক নতুন অধ্যায় শুরু হল।

এ ছবিটি অমলেন্দু চক্রবর্তীর ছোট গল্প অবলম্বনে। একটি রাতের কাহিনি। এমনই একটি বাড়ির কাহিনি যে বাড়িতে আরও বেশ কয়েকটি পরিবার বাস করে, পরস্পর নিত্য লড়াই করে। সে বাড়ির দু'কামরার ঘরে জনা সাতেক মানুষ বাস করে। সেই পরিবারের সবার মুখে আহার জোগাড় করে দেয় একটি অল্পবয়সি যুবতি মেয়ে যাঁর বয়স পঁচিশ বা ছাব্বিশ। মেয়েটি একটি রাতে বাড়ি ফেরে না। ভোরবেলা যখন সে বাড়ি ফিরল তখন সে বড় ক্লান্ত। সমগ্র পরিবারের মানুষগুলো দুশ্চিন্তায় দিশেহারা। কেননা মেয়েটি অফিস ছুটির পর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বাড়ি ফিরে আসেনি। চিত্রনাট্যে কাহিনি শুরু হওয়ার দু'-তিন মিনিটের মধ্যে একটি ভয়েস ওভার হয়। একজন ভাষ্যকারের কণ্ঠস্বর যিনি ঐতিহাসিক ঘটনাবলি বলে যাচ্ছেন। একটি পুরনো বিশাল বাড়ি, যে বাড়িটি সিপাহি বিদ্রোহের সময় তৈরি হয়েছে। সময়টা ১৮৫৭ সাল। এই বাড়িটা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নীরব সাক্ষী। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি থেকে রানি ভিক্টোরিয়ার শাসনকাল। পরবর্তীকালে নানা উত্থান-পতনের সাক্ষী এই বাড়িটা। রাজনৈতিক টালমাটাল, সভাসমিতি, মিছিল, দেশবিভাগ, দাঙ্গার রক্তাক্ত ইতিহাস, দুর্ভিক্ষ, লুঠতরাজ, আবার একটি পরিবারের ঘটনাবলি ও সেই বিড়ম্বনার রাতে ভয়ংকর অবস্থা এবং একটি মেয়ের রাতে বাড়ি ফিরে না আসার ঘটনা। এ বাড়িটা এসব ঘটনার সাক্ষী।

ছবি শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ আগে যখনই সেই পরিবারটি বাড়ির একমাত্র উপার্জন করা মেয়েটির ফিরে আসার চিন্তা ছেড়ে দিয়েছে, সব আশা শেষ, ঠিক তখনই বাড়ির দ্বিতীয় কন্যাটি মায়ের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিয়েছে। রাগে দুঃখে বিষণ্ণপ্রায় মা ও মেয়ের ভয়ংকর বিবাদ চলছে। আবার সেই একই কণ্ঠস্বর, একই ভয়েস ওভার সেই বাড়িটির ইতিহাসের কথার পুনরাবৃত্তি। সেটা হয়তো আগামী দিনে এই পরিবারটির কথাই, এরা অন্য আর একটি আরও সস্তার ভাড়া বাড়িতে যাবে। সে বাড়িতে নিঃশ্বাস নেওয়া যায় না। সেখানে হয়তো বাড়ির সেই দ্বিতীয় মেয়েটি পড়াশোনা শেষ করতে পারবে না। পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে মেয়েটি হয়তো কোনও সাজানো গোছানো অফিসে কাজ করবে। আবার একই গল্প, একই বাড়ি না ফিরে আসার ঘটনা তার জীবনেও ঘটবে। এই রাতের ঘটনারই পুনরাবৃত্তি হবে। শেষকালে একটি ভয়ংকর সমাপ্তি ঘটবে।

এসবই 'একদিন প্রতিদিন' ছবিটিতে ছিল। মূল গল্পটাকে সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ইতিহাসের দিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শেষকালে কিছুই ঘটবে না। ছবিটা কেবলই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তিকে স্মরণ করবে। আর কিছুই নয়।

একটি সহজ সাধাসিধে গল্প। এ ছবিটি আমাকে সুযোগ করে দেয় যে কীভাবে ধীরে ধীরে একটি রক্ত-মাংসের মানুষের শরীরে কাঁটা বিঁধিয়ে দেওয়া যায়। পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থার মুখোশ খুলে দেওয়া যায়। আমি আঙুল তুলেছিলাম আমার নিজের ভিতরের শত্রুর দিকে, মধ্যবিত্তের দিকে। যেসব

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চরিত্রগুলো, বিভিন্ন মানুষগুলো যারা ছবির পর্দায় এসেছে তাঁরা সবাই যেন জ্ঞাতসারে, অজ্ঞাতসারে ভুল করে যাচ্ছে।

ব্যাপারটিকে পরিষ্কার করে বলতে হলে মূল চিত্রনাট্যের কিছু অংশ তুলে দেওয়া যাক:

গভীর রাত, সময় ধীরে ধীরে এগোচ্ছে ওদিকে মেয়েটির খোঁজ চলছে। পুলিশ স্টেশনে, থানায় থানায়, হাসপাতাল হাসপাতালে, এমনকী যেখানে শবদেহ রাখা হয় সেসব জায়গাতেও। তপু একটি বছর বিশেকের ছেলে স্কুটারে চেপে তাঁর এক বন্ধুকে নিয়ে জায়গায় জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু সেই মেয়েটি চিনুর কোনও পাত্তা নেই, কোনও খবর নেই। যে চিনু এই পরিবার বা এই সাতজনের সংসারে একমাত্র উপার্জনশীল মানুষ।

রাত বাড়ছে। বিশাল বাড়িটির বিভিন্ন পরিবারে, বিভিন্ন আলোচনা, বিভিন্ন উক্তি। চুপিচুপি আলোচনা। কেউ সত্যিকারের সহানুভূতিশীল মানুষ। কেউ আবার অভিনেতা, ভাবটা যেন কত দরদী, কত ভাবছে।

অবশেষে যখন প্রায় রাত তিনটে তখন সে-বাড়ির ওপরের বাসিন্দা শ্যামল ও তাঁর স্ত্রী ওই পরিবারটিকে ফেলে রেখে ওপরে চলে যায়। যদিও একসময়ে এরা দু'জনে এ বাড়িতে এ পরিবারটার কাছে আশ্রিত ছিল। ব্যাপারটি মন থেকে প্রায় মুছে ফেলে দেয় ওরা দু'জনে।

শ্যামল ও তাঁর স্ত্রী যখন বড় বাড়িটার উঠোন পার হচ্ছে তখন এক বয়স্কা মহিলা সামনে এসে দাঁড়ায়। সে মহিলার সঙ্গে আরও কয়েকজন ছিল।

তোমরা কোথায় গিয়েছিলে? কোনও খবর পেলে? মহিলাটি জিজ্ঞেস করল।

আপনি এত ভাবছেন কেন? ওরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে থাকুক। চলে এসো। আমরা ওপরে যাব।

সেই পরিবারের একটি ঘরে তখন ছ'টি মানুষ। থমথমে পরিবেশ। আট বছরের পল্টু যে সবচাইতে বয়সে ছোট, মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় বালিশ নিয়ে আধশোয়া অবস্থায় রয়েছে। ছবির শুরুতে দেখা গিয়েছে পল্টুর মাথায় আঘাত লেগেছিল। পল্টু ডাক্তারখানায় গিয়ে মাথায় ব্যান্ডেজ করে এসেছে। ডাক্তার কয়েকদিনের পূর্ণ বিশ্রাম ও ঘুমের ওষুধ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

খেতে দিয়েছেন। যাতে ছেলেটি রাত্রিবেলা ভাল করে ঘুমোতে পারে। পরিবারের কর্তাব্যক্তি চিনুর বাবা বিছানার এক প্রান্তে চুপচাপ বসে আছেন। দ্বিতীয় মেয়েটি কাঠের চেয়ারে বসে আছে। সে চেয়ারটি খাটের খুব কাছে। চিনুর মা মাটিতে বসে আছে বিছানায় মাথা হেলিয়ে। ঠিক ঝুনুর বিছানার একপ্রান্তে তপু বসে আছে। ঘরের মেঝেতে এতগুলো রাতজাগা মানুষ বসে আছে। এগারো বছরের ঝুনু বিছানায় শুয়ে আছে শরীরটাকে কুঁকড়ে নিয়ে। কারও মানসিক অবস্থা ঠিক নেই একমাত্র পল্টু আর ঝুনু ছাড়া।

বাবা বলল, ভগবানই জানে কী হয়েছে।

মা বলল, তোকে ...... কিছু বলেছিল অফিস যাওয়ার সময়। বল্ চুপ করে থাকিস না।

মিনু বলল, সত্যি করে বলছি তোমার কাছে কিছুই গোপন রাখব না।

মা বলল, আমি জানি। চিনু আর বাড়ি ফিরবে না।

মিনু—বেশ তো, তুমি যদি জেনেই থাকো তো চুপ করে থাকো।

বাবা—মিনু!

নীরবতা। বিষণ্ণ নীরবতা।

মিনু—দাদা, অমলদা বলল, তুই মর্গ থেকে বেরিয়ে এসে ভেঙে পড়েছিলি।

তপু কোনও কথা বলে না। রাতের দেয়াল ঘড়ি জোরে সশব্দে চলছে।

মিনু—তোর ঘেন্না লাগে না মর্গ দেখে? এ ঘরটা দেখে? এ বাড়িটা দেখে?

কেউ একটি কথাও বলল না। বিষণ্ণ নীরবতা বিরাজ করছে তখন।

মিনু—আমরা একবারও দিদির কথা ভাবছি না। দিদির কথা কোনওদিন ভাবিনি। শুধু নিজেরা এভাবেই চলেছি। স্বার্থপর আমরা। আজ এভাবে দিদি চলে গেল।

মা—হ্যাঁ এভাবে আমাদের...

মিনু—হ্যাঁ। সেটাই আসল প্রয়োজনীয় ব্যাপার। আমরা দিদির দয়াদাক্ষিণ্যে জীবনটা কাটাচ্ছিলাম। একটা মেয়ে এ ঘরের মধ্যে ধুঁকে ধুঁকে কষ্ট পেয়েছে। আজ আমরা তাঁর কথা ভাবছি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমার প্রথম বই 'চ্যাপলিন'-এর প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়। সেই ছবি

১৯৯১। নিভৃত কথোপকথন সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে... ধরা পড়েছিল নিমাই ঘোষের ক্যামেরায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

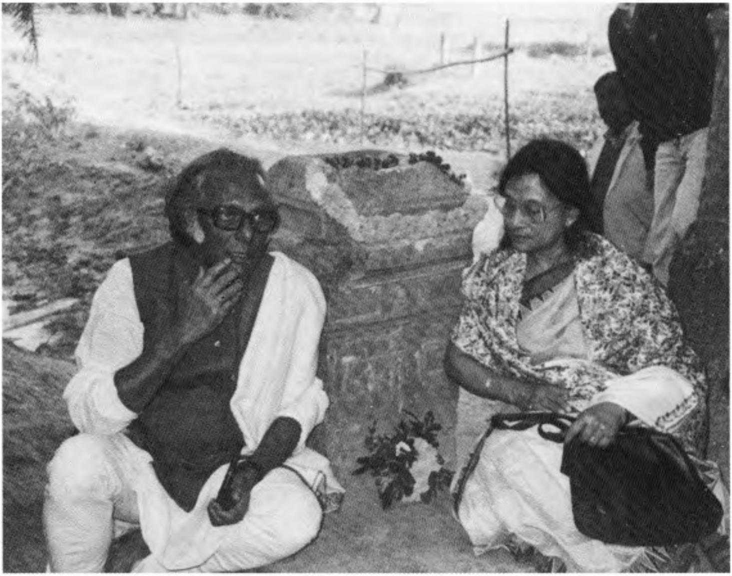

রেবার বেদি-তে গীতার সঙ্গে

চিন-এ মাও মুসোলিয়াম[illegible]লিবারে[illegible]ন আর্মির তরতাজা তরুণরা... দাঁড়িয়ে দেখছে গীতা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৯৮০। কান উৎসব-এ, গীতা-র সঙ্গে

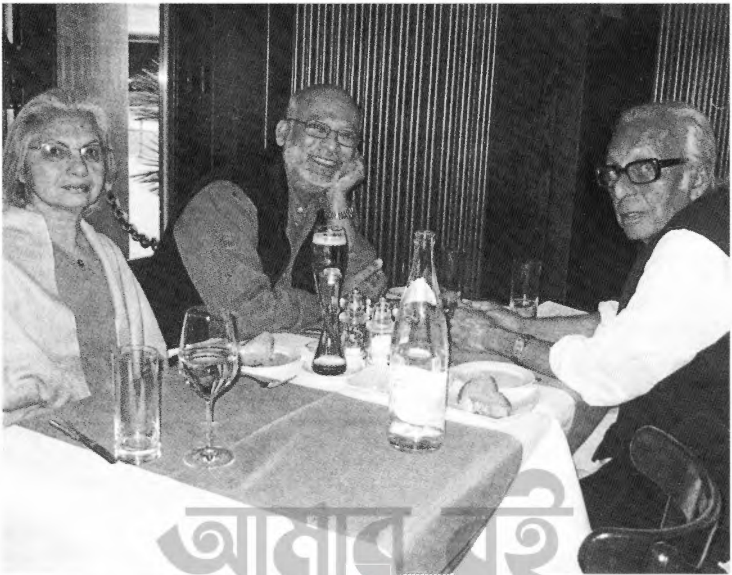

২০১০। ফ্রান্সে। কান ক্লাসিক্স্-এ দেখানো হচ্ছে 'খণ্ডহর'। নিশা ও কুনাল-এর সঙ্গে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমার দীর্ঘদিনের স্থিরচিত্রগ্রাহক সুভাষ নন্দী, আমৃত্যু সে ছিল আমার সঙ্গে,
তার শুরুর দিকের ছবি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বাবা—কী সব বলছিস! এটা কী এসব কথা বলবার সময়।

মা—যা মুখে আসছে তাই বলছে। যা মনে আসছে তাই বলছে। কী বলতে চাস মিনু!

তপু—মা, বন্ধ করো। বন্ধ করো এসব কথা।

মিনু—একবারও দিদির কথা ভেবেছ তোমরা। বলো! সত্যি করে বলো।

মা—আমি ভাবিনি। তুই যা ভেবেছিস।

মিনু—ঠিকই। আমরা দিদির কথা কেউই ভাবিনি। আমরা নিজেদের কথা ভেবেছি। কেউ না। বাবা, মা, দাদা আমি কেউই না।

মা—কখনই না।

মিনু—ঠিকই। একবারও দিদির বিয়ের কথা ভেবেছ তোমরা।

মা—নিশ্চয়ই ভেবেছি। তপুটা দাঁড়িয়ে গেলেই চিনুর বিয়েটা দেব।

মিনু—তাই তো ভাববে। দাদার বিয়ের কথা ভাববে, দাদা একটা চাকরি-বাকরি পেলেই। দিদির বিয়ের কথা কেন ভাববে।

মা—কী ভেবেছিস মিনু! চিনুর বিয়ের গয়না গড়াচ্ছি বছরের পর বছর। কী জন্য? জানিস না।

মিনু—কিন্তু তোমরা সবাই জানতে যে দিদি এসব চায়নি। দিদি শুধু সোমনাথদাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল।

মা—হ্যাঁ। চিনু কত ভাল থাকত জানি, যদি বিয়েটা হত।

মিনু—অন্তত দিদির মনের আশাটা, ভালবাসাটা পূর্ণ হত।

মা—পূর্ণ হত! সারাটা জীবন বিধবা হয়ে কাটাত।

মিনু—সত্যি কথা বল। পুলিশ সোমনাথকে গুলি করে না মারলে তুমি কী দিদির বিয়েটা মেনে নিতে?

মা—সোমনাথের নিজেরই চালচুলো ছিল না। সারাদিন শুধু পার্টির কাজ করত। আর চিনু খেটে মরত।

মিনু—দিদি কিন্তু ঠিক একই রকম। একাই খেটে খেটে সব চালিয়ে যাচ্ছে।

মা—তোরা কী করতি? চিনু চাকরি না করলে।

মিনু—হ্যাঁ, সেটাই। সত্যি বলো। এটাই সত্যি কথা। আমাদের সবারই দিদিকে প্রয়োজন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মিনুর মা এসব কথা কাটাকাটিতে রেগে আগুনের মতো জ্বলে উঠল মিনুর বিশ্রী কথাবার্তায়। মিনুর মা আধশোয়া অবস্থায় রেগে মেগে নিজের হাতের তর্জনী তুলে স্বামীর দিকে তাকাল।

মা—আমাকে কেন এসব বলছিস? ওই লোকটাকে বল। বসে আছে চুপ করে। শুধু চুপ করে থাকতে জানে। সারাটি জীবন চুপ করে থেকেছে। সবকিছু আমার ওপর ছেড়ে দিয়েছে।

মিনুর মা নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারল না। কাঁদতে কাঁদতে নিজের মুখটা খাটের পাশে লুকিয়ে ফেলল।

মিনুর বাবা হাঁ করে বোকার মতো তাকিয়ে থেকে উঠে দাঁড়াল। তারপর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। ঘরের মধ্যে নীরবতা। শুধু মিনুর মা কাঁদছে, ঘামছে।

উঠোনের দৃশ্য

বাবা উঠোনের মাঝখানে একা দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারের মধ্যে। সিঁড়ির ওপর বসে। বেশ দূরে দমকলের ইঞ্জিনের সশব্দ আওয়াজ পাওয়া গেল।

ঘণ্টাখানেক বাদে যখন হঠাৎই একটা ট্যাক্সি এসে থামল বাড়ির সদর দরজায়, ট্যাক্সিটা গর্জন করে উঠল। সমস্ত বাড়িটা যেন প্রাণ ফিরে পেল। জীবন ফিরে এল। ঝুনু দৌড়ে সদর দরজার সামনে চলে গেল। মিনুর মা ছুটে গেল। মিনুর বাবাও। সবাই একসঙ্গে একসময়ে। কারও মুখে সামান্য হাসিটুকুও নেই। যেন মনে হচ্ছে কেউই ব্যাপারটাকে সহজভাবে নিতে পারছিল না।

ঝুনু সদর দরজাটা খুলে দিল। দরজার বাইরে চিনু দাঁড়িয়ে রইল। নিরাপদ নিশ্চিন্ত চিনু। কিছুটা ক্লান্ত। বড় বাড়িটার ওপরতলার ঘরগুলোতে একটার পর একটা আলো জ্বলতে লাগল।

পরিবারে স্বস্তি ফিরে এল। সবাই নিশ্চিন্ত। কিন্তু একটা বিভীষিকাময় রাত কেটে গেল একটি পরিবারে। এক একজন করে সবাই বাড়ির ভেতর চলে এল। চিনুর মা কোনও কথা না বলে নিজের ঘরে এসে চুপ করে বসে রইল। সবাই পাড়াপড়শিকে ভয় পাচ্ছে। নিন্দের ভয় পাচ্ছে। সবাই চিনুর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দিকে আঙুল তুলছে। সারা রাত চিনু কোথায় ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে চিনু ওই বড় উঠোনটায় একা হয়ে গেল। সে একাকী দাঁড়িয়ে উঠোনের মাঝখানে। নিঃসঙ্গ চিনু। বাড়ির মানুষগুলো পাড়াপড়শি সবাইকে মনে হল এঁরা কেউ নয়। এঁদের চিনু চেনে না, জানে না। এরা চিনুর শত্রু।

একটা সময়ে চিনু নিজের ঘরে ঢুকে মিনুকে ঘরে ডেকে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

চিনু—এটা কেমন হল। তোরা কেউ চাসনি আমি বাড়ি ফিরে আসি। তোরা কেউ একবারও ভাবলি না আমার কী হতে পারত। একবারও ভাবলি না আমার জন্য, আমার নিজেরও কিছু বলার আছে। তোরা কেউ একটি কথাও আমায় জিজ্ঞেস করলি না। কেন কোথায় আমি ছিলাম। আমায় একটি কথাও বলতে দিলি না। আমার যদি কিছু হত। যদি আমার অ্যাকসিডেন্ট হত তা হলে! তখন তোদের কিছু বলার থাকত না। তাই তো? এই কয়েক ঘণ্টায় আমি একজন উড়ে আসা পথিক। অন্তত তোদের কাছে। তাই না!

মিনু—দিদি—দিদি—তুই।

হঠাৎ-ই পল্টু এসে ঘরের দরজাটা বাইরে থেকে খুলে চিনুর দিকে তাকায়। হঠাই দেখা গেল উঠোনের একপাশের সিঁড়ি দিয়ে যে বাড়িওয়ালা আসছে। আগে বাড়িওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল। কারণ এই লোকটি সবসময় একটা দুটো ভাড়াটেকে উৎখাত করে নতুন ভাড়াটে বসিয়ে লাভবান হতে চায়। বাড়িওয়ালা নীচে এসে চিনুর বাবাকে ডাকল। এসে বলল যত শীঘ্র সম্ভব এ ঘরগুলো খালি করুন। এ ধরনের কীর্তিকলাপ এ বাড়িতে চলবে না। এ কথাটা শুনে তপু বাড়িওয়ালার দিকে দৌড়ে গিয়ে বলল, কী বললেন আপনি!

বাড়িওয়ালা—এ ধরনের নোংরা ব্যাপার এ বাড়িতে চলবে না।

তপু—নোংরা ব্যাপার বলতে কী বলতে চাইছেন আপনি।

বাড়িওয়ালা—বুঝতে পারছ না। কী বলতে চাইছি।

চিনু দৌড়ে নিজের ঘর থেকে বাইরে চলে আসে। সঙ্গে খুব কাছাকাছি মিনুও।

মিনু—দিদি, কোথায় যাচ্ছিস।

চিনু—বিশ্বাস করুন। আপনি যা ভাবছেন আমি তা নই।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তপু—দিদি, ভেতরে যা।

তপু—(বাড়িওয়ালার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল) আপনি মুখ সামলে কথা বলবেন।

বাড়িওয়ালা—আমাকে ভদ্রতা শেখাচ্ছ। বাড়ির মেয়ে বাইরে রাত কাটাচ্ছে, লজ্জা করে না।

তপু—শুয়োরের বাচ্চা!

তপু বাড়িওয়ালার দিকে তেড়ে গিয়ে গলা চেপে ধরে। দু'জনের মধ্যে কুৎসিত দৃশ্য, কথা কাটাকাটি দেখা যায়। মা ছুটে এসে তপুকে টেনে নিয়ে চলে আসার চেষ্টা করে। তপু সরে আসে। শ্যামল সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে। অন্যান্য ঘরের মানুষজন ভিড় করে দাঁড়ায়।

তপু তখনও রাগে ফসফস করছে।

তপু—এখানেই মারামারি হবে।

বাড়িওয়ালা—তুমি কী করবে!

তপু—তোমার মুখ ভেঙে দেব। দাঁত ভেঙে দেব তোমার মতো ভদ্রলোকের।

তপু কথা বলে ঝড়ের বেগে বাড়ির বাইরে চলে গেল। বাড়িওয়ালাকে দেখা গেল সিঁড়ি বেয়ে ওপরে যাচ্ছে। দেখা গেল সব ভাড়াটে সব ভাড়াটের ঘরে যাচ্ছে-আসছে। কোনও ঘর থেকেই আর চুপিচুপি কথা শোনা গেল না।

ওদিকে ভেতরের ঘরে বাকি ছ'জন বসে আছে। ছ'জন প্রাণীকেই মনে হচ্ছে বিধ্বস্ত।

মা—মিনু, চিনুকে ঘুমোতে দে।

মিনু—দিদি। চল ঘুমোতে যাই।

বাবা চিনুর পেছনে দাঁড়িয়ে। বাবা চিনুর মাথার চুলের ভেতর দিয়ে হাতের আঙুলগুলো দিয়ে স্নেহে, ভালবাসায় আদর করল।

চিনু কান্নায় ভেঙে পড়ল। মা অসহায়ের মতো সজল নয়নে চোখের জল ধরে রাখার চেষ্টা করল।

হঠাৎই একটু উঁচু আকাশছোঁয়া শট কলকাতা শহরটাকে ধরল। ভোরের সকাল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

বেলা শুরু হল। সমস্ত বাড়িটা কাজকর্মে মেতে উঠল। সবাই তখন জড়ো হয়েছে বাড়ির ভেতরে বড় উঠোনটায়। কেউ থালা মাজছে, কেউ মুখ ধুচ্ছে, কেউ কয়লা ভাঙছে উনুন ধরানোর জন্য, কেউ বাইরে স্নান করছে, কেউ কেরোসিনের স্টোভ জ্বালিয়ে কিছু একটা করছে, কেউবা অন্য কিছু করছে। পর্দায় সমস্ত শব্দগুলো বেশ জোরে শোনা যাচ্ছে। শব্দ গমগম করছে। একদিন প্রতিদিনের দিনেরবেলার নিত্যকর্ম পদ্ধতির দৃশ্য।

মা এসে হাজির হল বারান্দার সামনে। আকাশের একটা বিমানের গর্জনে মা আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাল। মা খুব স্বাভাবিক। কাউকে মা ভয় পায় না। অথচ কয়েক ঘণ্টা আগে সে ছিল ভীত, সন্ত্রস্ত। জানলার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল যে মা উনুন ধরাচ্ছে। উনুনে ধোঁয়া উঠছে। মায়ের মুখের কিছুটা দেখা যাচ্ছে। গম্ভীর মুখ অথচ সে নির্ভীক। সে বেপরোয়া।

ছবিটির প্রথম প্রদর্শনের দিন সিনেমাহলটি দর্শকে ঠাসা। মেট্রো সিনেমা। আমি বেরিয়ে এলাম সিনেমাহল থেকে যখন ছবিটি শেষ হল। এক কোনায় মেট্রো সিনেমার একদিকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। দর্শকদের মধ্যে প্রথমেই আমার কাছে ছুটে এসে প্রতিক্রিয়া জানাল আমার কিছু পুরনো বন্ধু। এরা একসময়ের লড়াকু মানুষ আজ তারা সেই লড়াকু মনোভাব থেকে পিছিয়ে এসেছে। যদিও তারা এখনও বিশ্বাস করে যে তাদের বুকের ভেতরে লড়াইয়ের আগুন জ্বলছে। ওদের প্রতিক্রিয়া হল, আমি বুড়ো হয়ে গিয়েছি।

শেষটা এরকম নৈরাশ্যমূলক কেন! কেন এত নিরাশা। আশার আলো কোথায় গেল। মায়ের মুখের অভিব্যক্তিতে পরিষ্কার যে সর্বত্র নৈরাশ্য বিরাজ করছে।

'নৈরাশ্যমূলক! বলছেন!' বললাম আমি।

'আর কী!' একজন বেশ জোরের সঙ্গে বললেন।

মায়ের অভিব্যক্তিতে, বিষাদে ও একাকিত্বে প্রমাণ হয়ে গেল যে ছবিটি তোমার ছবি। এটা সত্য যে যারা দেখেছিল তারা সবকিছুই কিন্তু অনুভব করতে পারেনি। ওঁদেরও দুর্ভাগ্য আমারও দুর্ভাগ্য।

খুব ভোরবেলায় চিনুর মা উনুন ধরাল। সেটা আর একটা দিন। যখন আকাশে বিমান উড়েছিল সেটার অর্থ হল আর একটা দিনের শুরু। সেদিনটাও আর একটা দিনের মতো। যখন উনুন ধরাল, ভুলল না

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পেছনের দরজাটা বন্ধ করতে কারণ ধোঁয়া যাতে অন্য ঘরে না যায়। এটা রোজকার অভ্যেস। একটি সাধারণ দিন। কিন্তু রাতটা ছিল স্বতন্ত্র। মা তখন অন্য এক ভয়ংকর অবস্থার সঙ্গে লড়াই করছে। সে সব আশা ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু মা বাঁচল এবং শক্তভাবেই বাঁচল। তাই তাঁর বেঁচে থাকা। এটাই তাঁর অস্তিত্ব। বেঁচে থাকার তাগিদ। আবার বাড়ির সবাই সংগ্রামে ফিরে এল। কেউ আর পেছনে তাকাল না।

দর্শকদের সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। সেখানে দর্শকরা চরিত্রের মধ্যে নিজেদের খুঁজে পাচ্ছিলেন। দর্শকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা সিনেমা হলের লাউঞ্জে ভালই হচ্ছিল। বহু দর্শকের নানাবিধ প্রশ্ন ছিল। সেই একই প্রশ্ন। মেয়েটির কী হল। কেন সে মেয়েটি বাড়ি আসেনি সেই রাতে। কোথায় সে রাত কাটিয়েছে। মজার ব্যাপার হল, যাঁরা এসব প্রশ্নগুলো করছিলেন তাঁরা বেশিরভাগই চাকুরিজীবী মহিলা। এঁদের ছবিটি ভাল লেগেছিল। কিন্তু তাঁদের প্রশ্ন ছিল। যে প্রশ্নগুলো নেহাতই অনুসন্ধিৎসা। যদিও আমি একেবারে এ ব্যাপারে নিশ্চিত নই তবুও বলছি মহিলাদের অনুসন্ধিৎসার এটাই কারণ।

এমনও হতে পারে যে তাঁরা আমার কাছ থেকে জানতে চেয়েছিল যে মেয়েটি এমন কোনও কাজ করেছে যে কাজটা সমাজের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। নিশ্চয়ই মেয়েটি তেমন কোনও সামাজিক রীতিনীতির বহির্ভূত কাজ বা অনৈতিক কাজ কিছু করেনি। এই সান্ত্বনার সার্টিফিকেট তাঁরা আমার কাছে বোধহয় চেয়েছিল।

একদিন যখন জনতা বা দর্শকরা আমায় ঘিরে ধরেছিলেন যাঁদের মধ্যে বেশিরভাগই মহিলা। তখন এক নিপাট ভদ্র মার্জিত ভদ্রলোক প্রায় আমার সমবয়সি বললেন, 'মি. সেন, এটা খুবই জরুরি বা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে আমরা জানতে চাই যে মেয়েটি কেন সে রাতে বাড়ি ফেরেনি। ঠিক কী তাঁর হয়েছিল।' ভদ্রলোক কথাটি ইংরেজিতে বললেন।

আমি পরিষ্কার বাংলায় বললাম, 'দেখুন মশাই, আমার তো মনে হচ্ছে যে ছবি আমি আপনার মতো দর্শকদের জন্য বানিয়েছি। আপনারা দেখবেন আর যন্ত্রণা পাবেন। কারণ আমার জবাব পাবেন না। এ জন্যই যন্ত্রণা পাবেন।' এবার আমি ইংরেজিতে বললাম, 'আবার যদি জিজ্ঞেস করেন আমার উত্তর হবে আমি নিজেই জানি না। আমি জানতে চাই না।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

অবাক হয়েছিলাম যখন জানতে পারলাম যে সত্যজিৎ রায় তাঁর এক বন্ধুকে ব্যক্তিগত চিঠিতে লিখেছেন আমার উক্তিটি সম্পর্কে যে, আমি নিজেও জানি না, মেয়েটির বাড়ি ফিরতে কেন অত রাত হয়েছিল। তিনি লিখেছিলেন, একজন পরিচালক হিসাবে মৃণালের পক্ষে এটা কি বলা সম্ভব যে, তিনি তার ছবির চরিত্রদের গতিবিধি জানেন না! এরপর তো মৃণাল ওর 'একদিন অচানক' সম্পর্কেও বলবেন যে, তিনি নিজেও জানেন না যে প্রফেসর কেন একদিন বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিলেন বা কোথায় চলে গিয়েছিলেন।

সত্যজিৎ রায়ের সন্দেহকে ফেলে দেওয়া যায় না। সঠিক সন্দেহ। এই প্রতিক্রিয়া হয় যখন আমি 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-এ চিঠিটা পড়ি। মেট্রো সিনেমায় সেই নিপাট ভদ্রলোকের চেহারাটা ভেসে ওঠে চোখের সামনে। উনি আমার চাইতেও বড় মানুষ বা দর্শক।

এই সহজ প্রশ্নের সহজ উত্তর হল, বেকেটের নাটকে অর্থাৎ স্যামুয়েল বেকেটের নাটক দেখার সময়ে কেউ একজন তাঁকে বলল, কেন গোডো একবারও এ নাটকের মঞ্চে আবির্ভূত হল না। আমি 'ওয়েটিং ফর গোডো' নাটকের কথাই বলছি। নাট্যকার উত্তর দিলেন: 'গোডোকে জানলে চিনলে সে এ নাটকেও অভিনয় করত। গোডোকে তো আমি চিনিই না।'

সুখের খবর গীতা এই মায়ের অভিনয়ের কাজটি পেয়েছিল। খুব জটিল অভিনয়। কিন্তু গীতা আমার প্রথম পছন্দ ছিল না। আমার প্রথম পছন্দ ছিল তৃপ্তি মিত্র। আমি গীতাকে তৃপ্তির কথা বললাম। গীতা বলল এগিয়ে যাও। তৃপ্তিকে নাও। অন্য কাউকে ভেব না। তৃপ্তি মিত্র হল ভারতীয় নাটকের এক বিখ্যাত অভিনেত্রী এবং কিংবদন্তি অভিনেতা শম্ভু মিত্র— নাট্যকার ও পরিচালকের স্ত্রী। আমি যখন তৃপ্তির সঙ্গে আলোচনায় বসলাম তৃপ্তি খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠল। প্রাথমিক কথাবার্তা হল। তৃপ্তি বলল এই প্রথম একসঙ্গে আমরা কাজ করব ছবিতে, যদিও তৃপ্তি নাটকে বেশি সপ্রতিভ। তৃপ্তির সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিলাম। খুঁটিনাটি ছবির যত ব্যাপার-স্যাপার ছিল সব ব্যাপারই তৃপ্তিকে খুলে বললাম।

হঠাৎই তৃপ্তি আমায় জিজ্ঞেস করল যে কোন রোলটা সে করবে। মায়ের রোলটা না মেয়ে মিনুর রোলটা— যে মেয়েটি কলেজে পড়ত। দুটো রোলের মধ্যে কোনটা বেশি প্রয়োজনীয় বা আকর্ষণীয় রোল। আমি ভেবেছিলাম তৃপ্তির

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মতো ব্যক্তিত্ব নেহাতই উৎসুক হয়ে ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করছে। পরে বুঝলাম তৃপ্তি যথেষ্ট ভেবে ব্যাপারটা বলেছে। কোনটা শক্ত বা কোনটা বেশি প্রয়োজনীয় রোল।

আমি খুব অস্বস্তিতে পড়লাম। কী বলব কীভাবে বলব ভেবে পেলাম না। পরের দিন টেলিফোনে তৃপ্তিকে বললাম তোমার ব্যাপারটা ভেবেছি। তুমি নিজেই সিদ্ধান্ত নাও যে কোন রোলটা তুমি করবে।

ব্যাপারটা এমন জটিল হয়ে দাঁড়ায় যে তৃপ্তি আমাকে তার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কিছুই জানাল না। কিছুই বলল না। বাধ্য হয়েই আমি মা ও মেয়ের এই অভিনয়ের ব্যাপারে ইতি টেনে দিলাম। যেহেতু মা ও মেয়ে, দু'জনেই একই ছাদের তলায় একই ঘরে ঝগড়া করবে, সংসারটা নরক হয়ে দাঁড়াবে, সন্ধে থেকে সকাল পর্যন্ত ঝগড়াঝাটি কথা কাটাকাটি উত্তেজনা বাড়বে। সুতরাং 'এ অভিনয়টা তুমি না করলেই ভাল হয়' এ-কথাটা তৃপ্তিকে জানালাম। তৃপ্তি আমার কথায় সায় দিল এবং তৃপ্তি বেশ খুশি হল। এখানেই ব্যাপারটা ইতি হল।

গীতাকে রাজি করানো এবং মায়ের অভিনয় করানোর ব্যাপারটা যত সহজ ভাবা হল তত সহজ নয়। গীতা সবসময় চরিত্রটা সম্পর্কে আমায় জিজ্ঞেস করেছে এবং মেয়েলি কিছু কিছু ব্যাপার সম্পর্কে আমাকে অবহিত করেছে।

পরবর্তী পর্যায়ে গীতা ও শ্রীলা মজুমদার অভিনয় করে। দু'জনেই দু'জনকে অভিনয়ের সময় সাহায্য করেছে এবং ছবিতে অভিনয়ের তাগিদে দু'জনে ভয়ংকরভাবে ঝগড়া করেছে।

ছবি রিলিজ হওয়ার পরের দিন গীতা বহু টেলিফোন পেয়েছে। একটি টেলিফোন ছিল তৃপ্তি মিত্রের। সে বলেছিল, 'মায়ের রোলটা আমি করলে আমি একজন অসাধারণ অভিনেত্রীর অভিনয় দেখতে পেতাম না।'

আর কোনও কথা সে বলেনি। টেলিফোনটা ঝট করে রেখে দিয়েছে। গীতাকে কিছু আর বলতেই দেয়নি।

আমি গীতাকে বললাম, 'কিছু না বলে টেলিফোনটা তৃপ্তি রেখে দিল, টেলিফোনের কোনও গোলমাল নয় তো?'

গীতা বলল, 'না। সেসব কিছু নয়।'

গীতা যে অভিনয়টা করেছিল তৃপ্তির মধ্যেও সে ক্ষমতা ছিল। এরকম ধরনের ঘটনা জীবনে সচরাচর ঘটে না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

একাদশ অধ্যায়

১৯৮০ সালের মে মাস। কান চলচ্চিত্র উৎসব। আমার কাছে অবিস্মরণীয়। গীতার কাছেও। কারণ গীতা তখন আমার ছবিটির মূল অভিনেত্রী। তা ছাড়া ছবির বাণিজ্য এবং সেইসব নিয়ে যা কিছু করণীয় সবটাই করে চলেছে একটি নতুন সংস্থা, ক্যাকটাস ফিল্ম। সবাই তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের ছেলেমেয়ে, কেউ বা ডাচ, কেউ সুইস, অফিস জুরিখ-এ। অসীম ভালবাসা দিয়ে দলটাকে গড়ে তুলেছে এরা এবং 'একদিন প্রতিদিন' নিয়েই এদের প্রথম খাতা খোলা। এই দলে বা সংসারে যাই বলা হোক না কেন, লিডার কেউই নয়, সবাই সমান। আমরা এসে পড়তে সংসারে দু'জন বেড়ে গেল— আমি আর গীতা। কান-এ আসার পরে দায়দায়িত্ব নিয়ে যারা চলছে তাদের একজন এলিয়ান স্টুটারহাইম (ডাচ) আর ডোনাট ক্যয়েশ (সুইস)। আর দু'-চারদিন আগে-পরে হলেও ক্যাকটাস ফিল্ম-এ এসে জুটল তুর্কিস্তানের ইলমাজ গুনে। আসলে কুর্দিস্তানের বাসিন্দা হয়েও তুর্কিস্তানের খোলা জেলে ইলমাজকে আটকে রাখা হয়েছিল। ইলমাজ গুনে জানত না যে কবে সে জেল থেকে মুক্তি পাবে। একাধারে ও ছিল অভিনেতা ও পরিচালক।

একদিন দু'জন সঙ্গী নিয়ে গুনে জেল থেকে পালাল। সেখান থেকে এক রাতের মধ্যে দেশের সীমানা ডিঙিয়ে গ্রিসের ওপারে চলে যায়। তারপর নকল পাশপোর্টের ব্যবস্থা করে ঘুরে ঘুরে প্যারিসে আসে। সেখানে আশ্রয় চাইতেই পাশপোর্ট পেয়ে গেল। সেই থেকে গুনে ওখানেই থেকে গেল। নতুন ছবির পোস্ট-প্রোডাকশনের কাজকর্ম করে জুরিখে। সব ব্যবস্থাই করে ক্যাকটাস ফিল্ম।

পালিয়ে আসতে যার সাহায্য ছিল প্রচুর, সে ডোনাট, ক্যাকটাসের ডোনাট। দারুণ এক অ্যাডভেঞ্চার!

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

গীতা এক অসাধারণ চমক দিল সেবারকার কান চলচ্চিত্র উৎসবে। কম্পিটিশন সেকশনে সেবার সব মিলিয়ে একুশটি ছবি ছিল। ভারতের ছবি ওই একটিই, 'একদিন প্রতিদিন'। দর্শকদের উন্মাদনা খুবই আন্তরিক আর গীতার অভিনয়ের জন্য গীতাকে উষ্ণ সংবর্ধনা দেওয়ার ব্যাপারটা অর্থাৎ সব মিলিয়ে মিশিয়ে মনে হল কান উৎসবে সত্যিই একটা ঘটনা ঘটিয়ে দিতে পেরেছিলাম আমরা। মায়ের ভূমিকায় গীতা আর মেয়ে শ্রীলা মজুমদার, দু'জনেই আর কে নয়, সবাই দারুণ জমিয়ে দিয়েছিল। কে ছোট কে বড় এই নিয়ে কোনও দর্শকই ভাবতে রাজি ছিল না। সবাই ভাল, বেশ ভাল, খুব ভাল। গীতা সম্পর্কে আমার বিদেশি বন্ধুরা, এমনকী দর্শকরাও বলত, এতদিন কেন আমি গীতাকে লুকিয়ে রেখেছিলাম, কেন ওকে দিয়ে অভিনয় করাইনি। গীতাকে বলত, 'আপনি এতদিন কী করেছেন, অভিনয় নয় তো বাড়ির গৃহবধূ, শুধু গৃহবধূই?' গীতা হেসে বলত সেই প্রবাদ বাক্যটি। 'গাঁয়ের যোগী ভিখ পায় না। অর্থাৎ ওই, গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না।' মজার ব্যাপার হল, মিষ্টি অথচ বেজায় কালো শ্রীলা মজুমদার ওখানকার দর্শকদের কাছে, বিশেষ করে আফ্রিকার সেনেগল-এ ওদেশের যুবকদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় হয়ে উঠল। বরাবরের মতো সেবারও সেনেগল-এর মানুষজন সমুদ্রের এপারে আসত তাদের নানা রঙের পসরা নিয়ে, সাজিয়ে বসত ফুটপাথের ওপর। ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখত ছোট ছোট পুঁথির মালা, ফুটফুটে কুচির গয়না, নানা রঙে, নানা ধরনের সামুদ্রিক টুকরো টাকরা। সময় পেলেই গীতা এটা ওটা কেনার জন্য দিশি কায়দায় দর কষাকষি করত। দোকানিদের ভেতর কেউ কেউ গীতাকে চিনতে পেরেছিল, কারণ তারা ছবিটা দেখেছিল, জিজ্ঞাসা করত মেয়ে আসেনি কেন! গীতার খারাপ লাগত শ্রীলা আসতে পারেনি বলে। শ্রীলার জন্য ওদের কেউ কেউ কিছু দিতে চেয়েছিল। শ্রীলাকে ওদের ভাল লেগেছিল।

ক্যাকটাস আয়োজিত যে আলোচনাসভা হয়েছিল সেখানে শুধু ছবির আলোচনাই ছিল না। সেখানে ছিল ভারতীয় রাজনীতি, ধর্ম ও জাতপাতের আলোচনা, কাণ্ডজ্ঞানহীন জনসংখ্যা বৃদ্ধির ওপর কথাবার্তা এবং মূলত এই শহর কলকাতার ওপর নানারকম বিরূপ মতামতের দীর্ঘ আলোচনা। এই সময়ে আমার শহরের ভাল দিক, খারাপ দিক সবই বলেছি। কিন্তু এ শহরটাকে পবিত্র গোরু বলিনি। কখনও বলিনি বলেই বলিনি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নকশাল আন্দোলন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কারও কারও মতে আমি নকশালদের সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। সত্যি কথা বলতে এটা পুরোটা সত্যি নয়। আমি বামপন্থী দর্শনে বিশেষজ্ঞ এটা বলাও অতিরিক্ত হয়ে যায়। একজন জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনাদের দেশে তো অনেক মার্কসিস্ট পার্টি আছে। আপনি কোন দলে?' প্রশ্নটি করেছিলেন এক বিখ্যাত পত্রিকা *L'Express*-এর এক সাংবাদিক। আমি বললাম, 'আমি এক প্রাইভেট মার্কসিস্ট'। সঙ্গে সঙ্গে সবাই হো হো করে হেসে উঠলেন। পরের সপ্তাহে *L'Express*-এর একটি কলমে বেরলো: মৃণাল সেন, প্রাইভেট মার্কসিস্ট, *Mrinal Sen, Marxiste Privé.*

আমি বললাম আমি সব সময়েই ব্যক্তিগতভাবে মার্কসিস্ট। আমার এই পছন্দটিই অনেক ভাল। বেশি দুঃসাহসী হওয়া ঠিক নয়। সঙ্গে সঙ্গে সবাই হো হো করে হেসে উঠল। বুঝলাম আমার বক্তব্যের মজাটা তাঁরা বুঝতে পেরেছেন। মজা পেয়েছেন। আমার ভেতরকার সঠিক সাহস বা তেজটাকে তাঁরা উপলব্ধি করেছেন। সম্ভবত এটাই বলতে চেয়েছি যে আমি কোনও পার্টির সভ্য নই। কোনও সভ্য-কার্ডও নেই আমার।

যাই হোক সেই ফরাসি পত্রিকায় আমার ছবি দিয়ে টাইটেল হল মৃণাল সেন প্রাইভেট মার্কসিস্ট। ফরাসি ভাষায় বলা যায় মৃণাল সেন মার্কসিস্ট প্রিভে।

কান চলচ্চিত্র উৎসব শেষ হতেই লন্ডনে ন্যাশনাল ফিল্ম থিয়েটারে এক সপ্তাহ ধরে আমার সমস্ত ছবির প্রদর্শনী চলল। অবশ্যই শেষ দিনের ছবিটি হল 'একদিন প্রতিদিন'। কারণ সেটাই তখনকার মতো শেষ ছবি।

প্রথা অনুযায়ী প্রথমে 'গার্ডিয়ান লেকচার' এবং সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা গার্ডিয়ান-এর ডেরেক ম্যালকমের সঙ্গে। অবশেষে দর্শকদের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর পর্ব।

বেশ ভিড় হয়েছিল কিন্তু সেই প্রশ্নোত্তর পর্বে সেখানকার এক অনাবাসী ভারতীয় যিনি নিজের দেশটাকেই দেখেননি, তিনি কিছু অবান্তর প্রশ্ন করলেন। যে প্রশ্নগুলো খুবই বিরক্তিকর। এসব ভারতীয়রা এক ধরনের বেপরোয়া মনোভাবের যুবক। আমি সেই যুবককে কিছুটা হালকা চালে জিজ্ঞেস করলাম যে তিনি কী করেন, কী তাঁর পরিচয়। যুবকটি রেগে গেলেন। দর্শকদের মধ্যে হাস্যরোল উঠল। আমি দর্শকদের প্রতিক্রিয়াতে খুবই খুশি হলাম। আমার অস্বস্তি কাটল। এই একই জায়গায় একই অনুষ্ঠানে দু'বছর বাদে সত্যজিৎ রায়কে একই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়েছিল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কিন্তু সমস্যাটা অন্য জায়গায়। সত্যজিৎবাবু ওই প্রশ্নোত্তর পর্বের ব্যাপারটাকে সহজভাবে না নিয়ে আমার সম্পর্কে একটি নিষ্ঠুর মন্তব্য করলেন। তখন 'সানডে অবজারভার'-এর সম্পাদক মুম্বাই থেকে টেলিফোন করলেন যে আমি যেন তক্ষুনি একটি রিজয়েন্ডার পাঠাই। তা হলে আগামী সপ্তাহে সানডে অবজারভারে এটি ছাপা হতে পারে। এই অবস্থায় উনি আমার কাছে কলকাতার এক প্রতিনিধিকে পাঠালেন। সে প্রতিনিধি সানডে অবজারভারের নতুন টাটকা সংখ্যা দিলেন। পত্রিকাটিতে দেখলাম হেডলাইন হয়েছে যে সত্যজিৎবাবু বলেছেন যে, মৃণাল সেন সবসময় নিরাপদ জায়গায় আঘাত হানে। হেডলাইনটি ছিল: 'মৃণাল সেন অলওয়েজ হিট্স সেফ টারগেট।' সম্ভবত আমার ছবি তথাকথিত রাজনৈতিক ছবি এসব কথা প্রশ্নোত্তর পর্বে উঠে আসে। এ-প্রশ্নের উত্তরে সত্যজিৎবাবু রেগে গিয়ে রীতিমতো গুরুগম্ভীর মেজাজে কথাটা বলেছিলেন। আমি সেই রিজয়েন্ডার-এ লিখলাম কিছু কিছু মজার দর্শক বোকা বোকা প্রশ্ন তৈরি করে এসে প্রশ্নোত্তর পর্বে একটা ঝামেলা পাকানোর চেষ্টা করে। যাই হোক, আমি রিজয়েন্ডার-এ লিখেছিলাম এমনভাবে যাতে সম্পাদক এ-কথাটিকেও গুরুত্ব দিয়ে হেডলাইন করতে পারেন। আমার অনুমান ঠিক। হেডলাইন হল: সত্যজিৎবাবু সবচাইতে নিরাপদ জায়গায় আঘাত হেনেছেন। লোকটি আমি, মৃণাল সেন। আমার কথাটা হল: 'রে হ্যাজ হিট দ্য সেফেস্ট টারগেট, মি।'

লন্ডন সেরে প্যারিস। প্যারিসে যে সভাটি আয়োজিত হয়েছিল সেটির সংগঠকরা হলেন স্ক্যান্ডিনেভিয়ার মহিলারা। প্রথমে 'একদিন প্রতিদিন' দেখানো হল এবং পরে আলোচনা হল ভারতের মহিলাদের বর্তমান অবস্থান নিয়ে। যাঁরা দর্শক তাঁরা প্যারিসে বসবাসকারী স্ক্যান্ডিনেভিয়ার মহিলা।

আমি একমাত্র বহিরাগত। শুধু তাই নয়, পুরুষমানুষ। আমি একদম মঞ্চের মাঝখানে। ছবিটি দেখানো হল। সবাই ছবিটি দেখলেন এবং ভালভাবেই নিলেন। প্রশ্নোত্তর পর্ব মিটল। এ-পর্বটিও সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন ছিল। লন্ডনের মতো নয়। একদম শেষে আমি বললাম, 'আমার একটি প্রশ্ন আছে আপনাদের কাছে।' মহিলারা খুবই উৎসাহিত হলেন।

'আমি বললাম আপনারা সব সামাজিক অবস্থাতেই বেশ খোলামেলা। সংরক্ষণশীল নন। সবক্ষেত্রে খোলামেলা! আমি কী ঠিক বলেছি?'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'হতে পারে।' একজন বললেন একটু গা ছাড়া দিয়ে। অন্যান্যরা হেসে উঠলেন।

'তা হলে কী করে ছবিটি ভাল লাগল?'

'আমাদের ভাল লেগেছে।'

অন্যান্য সবাই মাথা নাড়লেন। কেউ হাত তুলে জানালেন। কেউ কেউ মুখ ফুটে বললেন।

'আপনাদের কী মনে হয়নি যে ছবিটি আমি তৈরি করেছি খুব একটা সাধারণ ঘটনার ওপর। প্রায় অর্থহীন, হালকা, সাদা-সিধে।' বললাম আমি।

'না। সেরকম আমার মনে হয়নি।' বললেন এক ভদ্রমহিলা।

এরপর তিনি হাসলেন এবং সবার দিকে তাকিয়ে নিয়ে তাঁর সুন্দর ধারালো যুক্তি পেশ করলেন।

'ব্যাপারটা হল আমরা ভারতবর্ষের ছবি দেখতে এসেছি। ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় বহুবিধ বহুরকমের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা আছে। বিভিন্নরকমের পারিবারিক সম্পর্ক আছে। এই সমাজব্যবস্থা আমাদের সমাজব্যবস্থার থেকে অনেক দূরে। শুধু তাই নয়, অনেকটা আলাদা, অনেকটা বিপরীত। এত অসুবিধা এত বাধা সত্ত্বেও একটি মেয়ে যে রোজগার করে, তার পরিবারের মুখে অন্ন জোগায়, হঠাৎ-ই সে মেয়েটি একটি রাতে এল না। বাড়ি ফিরল না। সে ক্ষেত্রে ভয়ানক উত্তেজনা-সৃষ্টিকারী ঘটনা ঘটতে পারে অর্থাৎ এ-প্রশ্ন উঠতেই পারে। সুতরাং ছবিটির মূল গল্পটা বুঝতে অসুবিধে হয়নি। কোনও সমস্যার কারণ দেখি না। এক ধরনের আত্মীয়তা খুঁজে পাই যেন।'

আমি সেই ভদ্রমহিলা ও অন্যান্য দর্শকদের দেখলাম ও বুঝলাম কোনও একটা জায়গায় মহিলারা বা দর্শকরা সবাই এমন একটি সুর খুঁজে পেয়েছেন যেটি সবরকম সমাজব্যবস্থায় বা কালচারে প্রযোজ্য। সবই যেন এক।

হঠাৎ এক অখ্যাত অচেনা অজানা কবির লেখা কয়েকটা লাইন মাথায় এল। সহজ সরল অকঠিন কয়েকটা কথা:

নানান বরণ গাভীরে ভাই
একই বরণ দুধ
ভুবন ভ্রমিয়া দেখি একই
[illegible]।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

এর পরই আমি হোটেলের দিকে রওনা দেব। আমাকে ঠিক সময়ে এয়ারপোর্টে প্লেন ধরতে হবে। এমন সময় একজন জিজ্ঞেস করলেন 'আপনার নতুন ছবি কী? মানে, পরের ছবিটি কী!'

আমি বললাম, 'ফিল্ম উইদিন এ ফিল্ম।' তারপর বললাম, 'আগামী বছর ফেব্রুয়ারি, ১৯৮১ সালে আসুন বার্লিনে যদি আমার এ-ছবিটি সেখানে গ্রহণযোগ্য বা নির্বাচিত হয়।'

১৯৮০ সালের ৭ সেপ্টেম্বর একটি ছবির ইউনিট একটি গ্রামে দুর্ভিক্ষের ওপর ছবির শুটিং করতে যায়। গ্রামটির নাম হাতুই। ছবিটির নাম 'আকালের সন্ধানে'।

একটি ভয়েস-ওভার দিয়ে ছবিটি শুরু।

লোকলস্কর, অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম নিয়ে আমরা গ্রামের দিকে এগোচ্ছি। গ্রামের আসল নাম সোমরাবাজার, বানানো নাম হাতুই। আমরা যখন সেই গ্রামে ঢুকলাম তখন দেখলাম সেই গ্রামের চারিদিকে রটে গেছে যে এখানে শুটিং হবে। একটি ফিল্ম কোম্পানি আসছে এবং শুটিং হবে দুর্ভিক্ষের ওপর।

আমরা সবাই তখন পৌঁছে গিয়েছি গ্রামে। এর আগেও গিয়েছি দু'-চারবার। সমস্ত দলবল নিয়ে অবশ্যই নয়, জায়গাটাকে ভালভাবে বুঝে নিতে। সবাইকে ছেড়েছুড়ে এবার যখন আমি একাই ঘুরছি তখন হাড়-জিরজিরে এক বৃদ্ধ চাষি দাওয়ায় বসে কী করছিল, আমাকে চিনে ফেলেছে। চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'দেখ রে, বাবুরা ছবি তুলতে এয়েছে, শহর থেকে এয়েছে, আকালের ছবি তুলবে। আকাল! আকাল তো আমাদের সর্বাঙ্গে।' বলেই খ্যাক খ্যাক করে হেসে উঠল বুড়োটা। নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের ছাপ চোখে মুখে। যেন বিদ্রুপ খেলছে ঠারে-ঠোরে। আমি এরকম মানুষকে জীবনে দেখেছি বলে মনে হয় না। বুঝতে পারি না কীভাবে এত বিচিত্র ধারণা নিয়ে এরা বেঁচে থাকে। বেঁচে থাকে কী এক অদ্ভুত লজিকে!

দু'দিন বাদে যখন আমি ছবির প্রথম শট নিলাম আমার এক অভিনেতাকে দিয়ে ওই হাড়-জিরজিরে বৃদ্ধের কথাটাই ব্যবহার করেছিলাম: 'আকাল আমাদের সর্ব্বাঙ্গে!'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'আকালের সন্ধানে'-র মূল চরিত্রে এক যুবক, অভিনয় করছে এক পরিচালকের। ছবির নাম 'আকালের সন্ধানে'। এ ফিল্ম উইদিন এ ফিল্ম। একই অভিনেতা দুইটি চরিত্রে অভিনয় করছে, একমাত্র ছবির পরিচালক ছাড়া। কেউ কেউ বা ১৯৪৩, আবার কেউ বা ১৯৮০, কেউ ১৯৮০ এবং ১৯৪৩-এ। ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের দিনের চরিত্রে এবং ১৯৮০-র দিনেরও। গ্রামের যারা চরিত্র তারা গ্রামেরই। উদাহরণ দিতে এক অভিনেত্রীকে দিয়েই বোঝানো যাক— কখনও ১৯৮০-র এক অভিনেত্রী, কখনও বা দুর্ভিক্ষের দিনের এক চাষির বউ, সর্বস্ব হারানো এক হতশ্রী মহিলা। পরক্ষণেই হয়তো তাকেই দেখছি শেক্সপিয়র আওড়াচ্ছে। নাম তার স্মিতা পাতিল। ১৯৮০-তে নাম স্মিতাই, ১৯৪৩-এ সাবিত্রী, চাষি বউ। শ্রীলা মজুমদার ১৯৮০-র চরিত্র, এক অতি দুঃখী মেয়ে, ছবির ইউনিট-এ কাজ করে, নাম দুর্গা। অথবা ধরা যাক জমিদার বংশের শেষ মানুষটি, প্যারালিটিক, শয্যাশায়ী এবং তাঁর স্ত্রী— দু'জনেরই অবস্থান ১৯৮০-তে। এইভাবেই চলাফেরা সমস্ত চরিত্রের এবং ১৯৪৩ ও ১৯৮০ নিয়েই ছবির আনাগোনা। কেউ কেউ বা একই সময়ে।

হাড়গোড়সর্বস্ব এক প্রাচীন বাড়ি, বিশাল ব্যবহারযোগ্য গোটা পনেরো ঘর ছাড়া কাজে লাগানোর মতো তেমন কিছুই নেই। ছড়িয়ে ছিটিয়ে ভাঙচুর, এই যা। আর মাঠ পুকুর মন্দির ডিঙিয়ে কুঁড়েঘর ঝোপড়া ঝুপড়ি, মাটির ঘর। এই সবকিছু নিয়েই 'আকালের সন্ধানে', এই সবকিছুর মধ্যে নানা চরিত্রের আসা-যাওয়া।

শুটিং চলছে। গ্রামের অতি প্রাচীন স্কুলশিক্ষক, বৃদ্ধ মানুষ, জ্ঞানী মানুষ, একদিন শুটিং দেখতে এলেন। দেখলেন, কীভাবে এক ক্ষুধার্ত চাষি পাওনাদারের প্রস্তাব বা যে দাদন দেয় সেই দাদনদারের শয়তানিকে ছুড়ে ফেলে দেয়। সেই দৃশ্যে স্মিতা পাতিল অর্থাৎ সেই মুহূর্তে চাষি বাড়ির পুত্রবধূ সবকিছু লক্ষ করে এবং প্রয়োজনবোধে শ্বশুরকে সামলায়। দাদনদার বুঝতে পারে বৃদ্ধ শ্বশুরকে নরমে-গরমে সিধে করা যাবে না। ওইটুকুই একটা দৃশ্যের কিছু অংশ। তারপরেই, পরিচালকের 'কাট্!' শিক্ষক মুগ্ধ, অভিভূত। দাদনদারের পেছনে এসে দাঁড়ান, পিঠে চাপড় দেন, বলেন, 'এমন মানুষ এই গ্রামে এখনও আছে। বুঝলে হে!'

দাদনদার চটে আগুন। গ্রামের অন্যান্যরাও দাদনদারেরই মতো, বলে, 'দেখব, কী করে শুটিং চালাবে! ক'দিন? অসহ্য।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শেষ পর্যন্ত সিনেমার দল আর পেরে ওঠে না, ঠিক করে এখানে আর শুটিং করা সম্ভব হবে না। কলকাতায় স্টুডিয়োতেই বাকি কাজগুলো করে নিতে হবে।

স্মিতা পাতিল এক কোণে দাঁড়িয়ে সবকিছু শুনছে। বুঝতে পারছে দু'-একদিনের মধ্যেই কলকাতায় ফিরে যেতে হবে। ওপরের বারান্দা থেকে এক ভদ্রমহিলা সবকিছু খেয়াল করছেন। পঙ্গু স্বামীর স্ত্রী। দিন পনেরো আগে বিধবা হয়েছেন। স্বামীকে হারিয়ে ভীষণ নিঃসঙ্গ। বড় একা।

নিঃসঙ্গতার করুণ ছবি।

ইউনিটের সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে। ওপর নীচ করছে। নিজের নিজের জিনিসপত্র গোছাচ্ছে। ক্যামেরা এদিক-ওদিক ছুটছে। দেখা যাচ্ছে সবাই খুব ব্যস্ত। স্টুডিয়ো-ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। মালপত্র উঠছে ভেতরে বাইরে। এদিক ওদিকে গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। গাড়িতে উঠে পড়ছে এক এক করে। জয়ন্ত এদিক-ওদিক করছে, সবার শেষে গাড়িতে উঠবে। ওপরে ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে, উঠোনটা ফাঁকা, নিথর। চারিদিকে বিষাদের ছায়া। বিশাল প্রাসাদের সবটাই কেমন যেন দেখাচ্ছে। কেমন যেন দেখাচ্ছে প্রাসাদের থামগুলো। একটা কুকুর ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিক-ওদিক। কোনও শব্দ নেই। নিঝুম সমস্ত গ্রামটা। গ্রামের একটা ছোট্ট মেয়ে একটা থামের পেছন থেকে বেরিয়ে এল। হাতে খালি এক পাউডারের বাক্স। হঠাৎ হঠাৎ-ই সমস্ত নীরবতা খান খান শব্দে ভেঙে গেল। সমস্ত গাড়িগুলো এক এক করে গর্জে উঠল। স্টার্ট নিচ্ছে এক এক করে। পাউডারের বাক্স হাতে মেয়েটি ছুটে এল।

গভীর অন্ধকার। অন্ধকারের ভেতর থেকে দুর্গার মুখটা দেখা গেল। সেই দুর্গা নামে গ্রামের মেয়েটি। অন্ধকারে সবকিছু খোঁজে দুর্গা। অন্ধকারে দুর্গার মুখ মিলিয়ে গিয়ে আবার দুর্গা। মুখখানা ক্রমেই ছোট হয়ে আসে। একটার পর একটা... আরও ছোট... আরও... আরও... আরও... আরও ছোট... বিন্দু... বিন্দুও মিলিয়ে যায়...

কয়েকদিন বাদে দুর্গার বাচ্চাটা মারা যায়... স্বামীকে খুঁজে পাওয়া যায় না... দুর্গা একা... দুর্গা নিঃসঙ্গ। এক কণ্ঠস্বর। প্রাণহীন কণ্ঠস্বর। অন্ধকারের মধ্য থেকে উঠে আসে 'আকালের সন্ধানে'।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অমলেন্দু চক্রবর্তীর কুড়ি পাতার গল্পের শেষে হৃদয় বিদীর্ণ করা প্রশ্ন উঠে আসে দুর্গার: 'কোথায় গেলে বাবুরা? তোমরা না দুর্ভিক্ষের ছবি তুলতে এসেছিলে? কোথায় গেলে গো?'

অতীত ও বর্তমানের যোগাযোগ, অতীতের সঙ্গে বর্তমানের কথোপকথন 'আকালের সন্ধানে' বারবার এসেছে। বর্তমানের চরিত্র, অতীতের চরিত্র সব মিলেমিশে একাকার। সব মিলেমিশে একাকার— ১৯৮০-র স্থান-কাল-পাত্র আর ১৯৪৩-র স্থান-কাল-পাত্র— পঞ্চাশের মন্বন্তর।

যেদিন সিনেমার পুরো দলটা সবকিছু নিয়ে এসে পৌঁছলো গ্রামে, প্রযোজকমশাই তড়িঘড়ি এগিয়ে এলেন। একদিকে জিনিসপত্তর সাজসরঞ্জাম ক্যামেরা সাউন্ড নানা যন্ত্রপাতি এবং আরও শতখানেক এটা ওটা নামানো হচ্ছে, অন্যদিকে প্রযোজক দলটিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছেন বিশাল বাড়িটার সামনে। যেমন বলা হয়েছে, হাড়গোড়সর্বস্ব প্রাচীন বাড়ি...।

প্রযোজক : এই তোমাদের রাজপ্রাসাদ!

: রাজপ্রাসাদই বটে!

: তোমাদের এই রাজপ্রাসাদ একমাসের জন্য। কিন্তু শোনো ভাই, নো ইলেকট্রিসিটি।

: গ্রেট!

সন্ধেবেলায় শাঁখের আওয়াজ শোনা গেল। কেউ শাঁখে ফুঁ দিচ্ছে। জয়ন্ত (ম্যানেজার) এগিয়ে এলেন।

জয়ন্ত (ম্যানেজার): সে এক কাহিনি। এক মহিলা আর তাঁর পঙ্গু স্বামী দশ বছর ধরে ওপরের একটা ঘরে শেষ দিনগুলো গুনছেন। একমাত্র মেয়ের চার বছর আগে বিয়ে হয়ে গিয়েছে। গ্রামের এক ইস্কুল মাস্টারের সঙ্গে। খুব কাছে নয়। এই বাড়িটা একশো বছরের পুরনো। বাড়ির ঘরগুলো তালা দেওয়া, বন্ধ। বাকি ঘরগুলোর মালিকরা মানে শরিকরা যাঁরা কেউ দিল্লি, বোম্বে, কলকাতায় থাকে। মোট ছাব্বিশটা ঘর। সতেরো জন মালিক, ভাবতে পারো! সতেরো জন মালিককে খুঁজে চাবি জোগাড় করতে হয়েছে আমাকে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ইউনিটের সবাই ছাব্বিশটা ঘরে ঘুমিয়েছে, থেকেছে, তাস খেলেছে। দুর্ভিক্ষের ওপর ছবি হচ্ছে অথচ ইউনিটের সবাই চিকেন ফ্রায়েড রাইস খাচ্ছে ডিনারের সময়। চারিদিকে দামি সিগারেটের প্যাকেট পড়ে আছে। মাছ, সবজির দাম গ্রামে বেড়ে গিয়েছে। শুটিংয়ের জন্য এমন অবস্থা, গ্রামের কেউ কেউ বলল, দুর্ভিক্ষের ছবি তুলতে এসে সিনেমার লোকরা গ্রামে দুর্ভিক্ষ লাগিয়ে দিয়েছে।

'আকালের সন্ধানে'-র গল্প বানাতে আমরা কখনও আঁটঘাট বেঁধে চলিনি। নানা চরিত্রের সমারোহ, বহুরূপী না হয়েও একের মধ্যে একাধিক চরিত্রের মিশেল, সময় কখনও পিছিয়ে, কখনও বা এগিয়ে, কখনও বর্তমান। ছড়িয়ে ছিটিয়ে টুকরোটাকরা ঘটনা নিয়ে বেখেয়ালি প্রশ্রয়ের মধ্য দিয়ে 'আকালের সন্ধানে'-র জন্ম ও মৃত্যু। অগোছালো কত কীই না ছিঁড়েছি, কেটেছি, নতুন করে লিখেছি, বাতিল করেছি, কিছু বা বহালও থেকেছে ভবিষ্যতের জন্য। সবকিছুই জমা করে রেখেছি একটা ট্রাঙ্কে। লোকেশনে যাওয়ার সময় পুরো ট্রাঙ্কটাই সঙ্গে নিয়ে গিয়েছি। হয়তো কখনও কিছুর দরকার হতে পারে। আবার লোকেশনে কাজ করতে করতেও বা অকেজো কিছু লেখা রেখে দিয়েছি ওই ট্রাঙ্কেই।

তখনও শুটিং করে চলেছি। সোমরাবাজারেই। একদিন, কেন ঠিক মনে নেই, আঁতিপাতি করে খুঁজছি ট্রাঙ্কটা। যা পেলাম তা খামে মোড়া একটা চিঠি। গীতাকে লেখা, লেখা আমার, সোমরাবাজার থেকে, ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৮০। ডাকে দেওয়া হয়নি, কাউকে দিয়ে যে কলকাতায় পাঠিয়ে দেব, তাও করিনি। ঠিকমতো গীতার হাতে যদি চিঠিটা পড়ত তাও সেদিন থেকে দিন পনেরো আগেই। আর পেলাম তো পেলাম কলকাতায় ফেরবার মুখেই। যদিও ফেরবার কথা তখনই নয়, গ্রামের প্রবীণদের জ্বালায় যেতে হচ্ছে তড়িঘড়ি করে। তাড়া খাওয়ার মতো।

সবটাই অবাক করে দেওয়ার মতো। ভাবতেও কেমন লাগে যেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

[সোমরাবাজার থেকে মৃণাল সেন— গীতা সেনকে:]

সেপ্টেম্বর ২৪, ১৯৮০ ক্যাম্প: সুখাড়িয়া, সোমরাবাজার

রাত ১১.৩০ মি.

গীতা ॥

একবার ফ্রান্সের এক জাঁদরেল ইনটেলেকচুয়াল তাঁর এক বন্ধুকে একটা ভারী মজার কথা লিখেছিলেন। লিখেছিলেন, Purgative, laxative and a deep annoyance at the bourgeoisie: That was my week. লিখেছিলেন বহু বছর আগে, গত শতাব্দীর কোনও একদিন।

হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে গেল। আর তাই আজ যখন তুমি ঘুমের তোড়জোড় করছ, কুনাল আর নিশা হয়তো ঘুমিয়েই পড়েছে, তখন আমার মাথায় একটা নতুন কথা অতি সহজেই চলে এল: Heat, dust and a deep annoyance at the mosquitoes: That was our fortnight.

আজ কাজ শুরু করেছি ভোর থেকে, সূর্য উঠতেই। এলোমেলো মেঘের দৌরাত্ম্যে সূর্যের তেজ কমেছে বেড়েছে সারাদিন। ফলে কাজে ব্যাঘাত ঘটেছে বারবার। সবচেয়ে অসুবিধে হয়েছে একটানা চার মিনিট পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ডের একটা শট নিতে। পল্টুকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল একটা কালো চশমা চোখে লাগিয়ে সর্বক্ষণ সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকার। সব তৈরি, সবাই তৈরি, শুধু আমার নির্দেশের অপেক্ষা। আর আমি পল্টুর গ্রিন সিগন্যালের অপেক্ষায়। ওর সিগন্যাল পেয়ে আমি বলেছি 'স্টার্ট', তিরিশ-চল্লিশ সেকেন্ড পার করে দিয়েছি, কখনও বা দেড় দুই মিনিট অথবা চার মিনিটও ম্যানেজ করেছি, হঠাৎ পেছন থেকে পল্টু চেঁচিয়ে উঠেছে 'কাট'! শট বরবাদ। অর্থাৎ দারুণ বিক্রমে কোত্থেকে ছুটে আসছে এক টুকরো মেঘ ঝলমলে আকাশটাকে ঘোলাটে করে দিতে। এইভাবে আটটা 'টেক' বরবাদ হল। শেষ পর্যন্ত শটটা মোটামুটি দাঁড়াল। আমরা সবাই তখন ক্লান্ত, কিন্তু খুশি। একমাত্র মুখ বেজার করে দূরে দাঁড়িয়েছিল প্রোডিউসারের বাজার সরকার। আমি বললাম, 'ঘাড়ে মুখে জল দিয়ে আসুন।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সত্যি, একটা অভিজ্ঞতা। খেলার একটা মেজাজও পেয়েছিলাম মেঘ আর রৌদ্রের লুকোচুরির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে। যদিও প্রোডিউসারের গুচ্ছের ফিল্ম খরচ হল।

'মানকড়'-এর কথা মনে আছে? কুড়ি বছর আগেকার কথা? আর জমিদারবাড়ির সেই অসামান্য ভাঙচুর? কাল সেই ভাঙা 'রাজবাড়ির' স্বপ্ন দেখেছিলাম। স্বপ্নে সেই বৃদ্ধকে দেখলাম— প্যারালিসিসে সেই আধমরা মানুষটি। যাকে মাথায় রেখে তোমার 'স্বামী'র চরিত্রটিকে তৈরি করেছি। স্বপ্নে দেখলাম বৃদ্ধটি দু'পায়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন, চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ। তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে তুমি বাবা?' সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘুম ভেঙে গেল। স্বপ্ন-ও।

আশ্চর্য! বৃদ্ধ, ভাঙচুর আর গোটা পরিবেশ আমার সামনে এসে দাঁড়াল দীর্ঘ কুড়ি বছর পরে। হয়তো, হয়তো কেন, নিশ্চয়ই, বৃদ্ধ আজ আর বেঁচে নেই। আর তোমার 'স্বামী'? ধুঁকছেন। ভাবতেই শরীরটা যেন শিউরে ওঠে!

সকালে উঠেই একটা নতুন সিকোয়েন্স ভেবে ফেললাম। অর্থাৎ শুটিং করতে করতে হঠাৎ হঠাৎ যেমন আমি করে থাকি— স্ক্রিপ্ট-এ যা থাকে না। সিকোয়েন্সটা এইরকম:

গ্রামের বৃদ্ধরা সবাই এসে দাঁড়িয়েছেন জমিদারবাড়ির সামনে। তাঁরা এসেছেন তোমার সদ্যমৃত প্যারালিটিক 'স্বামী'কে শেষ দেখা দেখতে। দেখতে এসে ফিল্ম ইউনিটের লোকজনের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছেন এঁরা। সবটাই এই প্রাচীন জমিদার পরিবারের শেষ বংশধর তোমার 'স্বামী'-কে নিয়ে। গল্প করছেন। এমন সময় স্মিতা এসে দাঁড়ায়, প্রোডাকশন ম্যানেজারের কাছে এসে বলে, 'জয়ন্তদা, ভদ্রমহিলা বায়না ধরেছেন মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি থেকে নিয়ে না-আসা পর্যন্ত 'স্বামী'-কে তিনি ছাড়বেন না। কাঁদছেন খুব, বলছেন, 'ও একবার দেখে যাক তার বাপকে'। কী করা যায় বলুন তো!'

'কোথায় শ্বশুরবাড়ি?'

গ্রামের লোকেরা, যারা উপস্থিত সেখানে, বলে, 'সে তো বেশ দূরে, ষাট-সত্তর মাইল হবে।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'গাড়ি যাওয়ার রাস্তা আছে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। তবে শহরের মতো নয়।'

ডিরেক্টর (ধৃতিমান) এগিয়ে আসে, বলে— 'আপনাদের একজন কাউকে দিন, পথ দেখিয়ে দেবে। আমাদের একটা গাড়ি আমরা Spare করতে পারব। কী বলেন, জয়ন্তদা?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ!'

এবং লাঞ্চের পরেই সিকোয়েন্সটা তুলে ফেললাম। কথাবার্তা মুখে মুখেই বানিয়ে ফেললাম। চলাফেরাও ওইভাবেই হল। গোটা ব্যাপারটা দারুণ হল!

জানো, কাল রাত্তিরের স্বপ্নটা একটা miracle ঘটিয়ে দিল। মানকড়ের কত কথা মনে পড়ে গেল, কুড়ি বছর আগেকার 'বাইশে শ্রাবণ'-এর নানা কথা। সেই দিনটার কথা মনে পড়ল: মেঘলা সকাল। ভাঙাচোরা রাজবাড়িটার উঠোনে শুটিং করছি, হঠাৎ দেখি সেই ভাঙা বাড়ির এক শরিক। দুলাল কবিরাজ। দারিদ্র্যের ভারে যে মানুষটা সেদিন বিধ্বস্ত দিশেহারা হয়ে ছোটাছুটি করছেন এদিক ওদিক। আমি এগিয়ে গেলাম, জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী হয়েছে?' দুলালবাবু বললেন, 'একটা সাইকেল রিকশা চাই।' আমি বললাম, 'কেন?' দুলালবাবু বললেন, 'হাসপাতালে যেতে হবে।'

শুনলাম, দুলালবাবুর স্ত্রীর labour pain উঠেছে, এক্ষুনি পানাগড় হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। পানাগড় হাসপাতাল মানে চোদ্দো কিলোমিটার দৌড়োতে হবে সাইকেল রিকশাকে! বাইশে শ্রাবণ-এর প্রোডিউসার আমার পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন, আমি তাকালাম ওঁর দিকে, সঙ্গে সঙ্গে উনি প্রোডাকশনের একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দিলেন।

কুড়ি বছর আগেকার এই ঘটনাটি কত সহজেই না কেমন জায়গা করে নিল 'আকালের সন্ধানে'-র এই হঠাৎ গজিয়ে-ওঠা সিকোয়েন্সে। অভিজ্ঞতা অনায়াসে কেমন শিল্প হয়ে উঠল। দূরত্ব রেখেও কেমন আত্মজীবনীর ছোঁয়া পেল। ভাবতেও অবাক লাগে।

এখন লিখতে বসেই হঠাৎ একটা কথা ভাবছি। স্মিতা যেদিন প্রথম তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে তোমার ঘরে, তোমার অর্ধমৃত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্যারালিটিক স্বামী প্রাচীন একটা খাটে শুয়ে আছেন, তখন যদি তুমি বল, 'জানো, আমি ছাড়া ওঁর কথা আর কেউ বুঝতে পারে না, আমার মেয়েও না।' তোমার মুখে এই কথাটা দারুণ হয়, না? বিশ্বাস করো, কথাটা আমার নয়। ধার করা। কথাটা বলেছিলেন মানকড়ের সেই ভদ্রমহিলা। আমাকেই বলেছিলেন, যখন কুড়ি বছর আগে তিনি আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর স্বামী যে আধা অন্ধকার ঘরে অর্ধমৃত অবস্থায় শুয়েছিলেন। ঠিক এই কথাটাই তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'জান বাবা, ওঁর কথা আমি ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারে না।'

এই স্বামীটিই কিন্তু কাল রাত্তিরে স্বপ্নে আমাকে স্পষ্ট গলায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কে তুমি, বাবা?'

কীরকম লাগে এত সব ভাবতে!

সামনের সপ্তাহে একদিন তোমাকে এখানে আসতে হবে। তোমার 'স্বামী'-কে দাহ করে শব-যাত্রীরা যখন ফিরে আসবে, তখন এই গ্রামেরই দুই বিধবা তোমাকে নিয়ে যাবে জমিদারবাড়ির ঘাটে। সেখানে তারা তোমাকে চান করাবে, তোমার শাঁখা ভাঙবে, তোমার সিঁথির সিঁদুর মুছে দেবে। ভয়ংকর দৃশ্য। তৈরি হও। এরা দু'জন গ্রামেরই বিধবা, অভিনয়ের ধারে কাছে নেই।

শাঁখা ভাঙা ও সিঁথির সিঁদুর মোছার দৃশ্য: সবাই তৈরি। ক্যামেরায় চোখ রেখে ক্যামেরাম্যান। আমরা কয়েকজন ছাড়া কাছে পিঠে কেউ নেই। বাড়ির মহিলারা আত্মীয়স্বজন যাঁরা দৃশ্যটি দেখতে এসেছিলেন, সবাইকে বাড়ির ভেতরে ঢুকিয়ে দিলেন বাড়িরই এক প্রাচীনা। না, এই দৃশ্য এরা দেখবে না! প্রাচীনার কড়া নির্দেশ।

স্মিতার সেইদিন কোনও কাজ ছিল না। কিন্তু চুপচাপ এসে দাঁড়াল আমাকে ঘেঁষে। আমার কাঁধটা ধরে চুপচাপ দেখছে। দৃশ্য চলছে, গীতা কাঁদছে, কান্না থামছে না, গ্রামের দুই বৃদ্ধা গীতাকে সামলানোর চেষ্টা করছে প্রাণপণ। স্মিতা একসময় ফিসফিসিয়ে আমার কানে কানে বলছে: দেখো মৃণালদা, গ্রামের দুই বিধবাও কাঁদছে, চোখে জল। সত্যি তাই। আমি স্মিতার দিকে তাকালাম। স্মিতার চোখ ছলছল করছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

তোমার স্বামীর মৃত্যুর দৃশ্যটা অবশ্য কলকাতার স্টুডিয়োতেই করব। এখানে করার কোনও অসুবিধে ছিল না। সবই যখন এখানে হল, ভালমতোই হল, এটাই বা হবে না কেন? হত ঠিকই, কিন্তু আমার কেমন অস্বস্তি হয়। বাড়িটাতে এখনও যে দু'-এক ঘর পরিবার থাকে, তাঁরা যখন দেখবেন, বিশেষ করে প্রবীণরা, যে, তাঁদেরই একটা ঘরে একজনের মৃত্যু ঘটানো হচ্ছে। হোক না তা বানানো, তখন ওঁরা কী ভাববেন, তা ভাবতেই আমার অস্বস্তি। তাই, ওসব 'অনাচার' অরোরা স্টুডিয়োতেই হোক। দশবার মরবেন ভদ্রলোক আর দশবার কাঁদবে তুমি মরাকান্না। কারও কিছু বলবার নেই, ভাববার নেই।

ভাল থেকো। ভালবাসা নিয়ো।

মৃণাল সেন

পুনশ্চ। যদি সম্ভব হয় তো আসার সময় কয়েকটা ওডোমস টিউব নিয়ে এসো। মশারি একবার টাঙিয়েছিলাম, দম বন্ধ হয়ে আসছিল। এ অঞ্চলে তাই ওডোমসই একমাত্র ভরসা।

মধ্যরাতের চিঠি। ভাবি, উদয়াস্ত খাটা-খাটনির পরে মধ্যরাতের ক্লান্তি ঝেড়েমুছে কেন এই চিঠি। কোনও ব্যাখ্যা নেই গীতার কাছেও। চিঠিটা হাতে পড়লে না হয় বলা যেত কেন এই চিঠি, কী এর মর্ম। আমার এবং আমার দলের চোখের সামনে সকালে-বিকেলে- বেলাশেষে সর্বক্ষণ যা আমরা দেখে চলেছি তা হল অসংখ্য ভাঙচুর নিয়ে অতি প্রাচীন এক বিশাল বাড়ি, বসবাসের অযোগ্য, তবু ছবি করার জন্য আমাদের দখলে থাকবে মাস দেড়েকের মতো। 'বাইশে শ্রাবণ' তৈরি হয়েছে তারও কুড়ি বছর আগে, যে-বাড়ি আরও ছড়ানো, ভাঙচুর আরও বেশি, সাপখোপের দৌরাত্ম্যও বড় কম নয়। এবং সেখানেই এককালে চোখ ঝলসানো এক বালাখানায় সেকালের বড়লাট খানা খেয়ে গিয়েছেন। সেইসব ছবি, সেইসব ঘটনা, অবিশ্বাস্য! 'বাইশে শ্রাবণ'-এর দিনে সেসব কেমন হারিয়ে গেল, তলিয়ে গেল সব। আবার গভীর রাতের স্বপ্নে আরও কীই না ঘটে গেল, নতুন ছবির চিত্রনাট্যে কত কী-ই না পালটে গেল আবিষ্কারের মতো, হয়তো বা অন্য কিছু— মননের রাজ্যে, 'আকালে'-র খোঁজে। নতুন ছবি করতে গিয়ে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বারবার যেন এই-ই হয় আমার, নতুন কোনও দৃশ্য, নতুন কিছু ঘটনা। কোনও কিছুই নিজের খেয়াল মাফিক নয়, পরিকল্পিতভাবেই। নিজ সিদ্ধান্ত সংশোধন করি, করেই চলি। ভুলভাল হয়েছে বলেই নয়, করতে হয় বলেই করি। যা কিছু বলা হল, যা কিছু লেখা হল সেসবেরও অদলবদল চলল। হঠাৎ হঠাৎ, যেন বানিয়ে বানিয়ে, মুখে মুখে। এবং কত সহজেই না জায়গা করে নিল স্ক্রিপ্ট-এ। এগুলোকেই কি 'ইমপ্রোভাইজেশন' বলতে পারি না? গীতাকে লেখা চিঠিতে যা বলেছিলাম। এই ব্যাপারটা আমার আসে ভাল, আমার নানা ছবিতেই এমনটি ঘটে। মাঝেমধ্যেই এমন হয়েছে, কোনও প্রবন্ধকার বা কোনও চিত্রসাংবাদিক আমার কোনও ছবির নির্মাণপর্বে আমার স্ক্রিপ্ট-এর অংশবিশেষ চেয়ে বসে যা সে তার লেখায় ব্যবহার করবে। অবশ্যই আমার চিত্রনাট্য প্রসঙ্গে। কেউ বা, কোনও পত্রিকা সম্পাদক, ছবিটা শেষ হওয়ার মুখে পুরো স্ক্রিপ্টটাই চেয়ে বসে— কোনও শারদীয় সংখ্যায় ছাপবে বলে। নির্দ্বিধায় আমি বলি আমার স্ক্রিপ্ট শেষ হওয়ার পরে, সম্পাদনার টেবিলে কাজ শেষ করেও বা।

তা হলে কি বলতে হবে যে ছবি করতে স্ক্রিপ্ট-এর কোনও প্রয়োজন নেই? সবটাই 'ইমপ্রোভাইজেশন' (improvisation)?

এই কথাটাই একবার উঠেছিল লস অ্যাঞ্জেলেস-এর এক আলোচনাসভায়। সেই সভার মধ্যমণি তখন ফেডেরিকো ফেলিনি। আমেরিকার ফিল্ম ইনস্টিটিউটের ছেলেরা মেয়েরা অনেকেই ছিল সেই সভায়, তরুণ ছবি-করিয়েদেরও এক বিশিষ্ট দলও ছিল। স্বভাবতই এদের বেশিরভাগই ফেলিনি সম্পর্কে তখন খুবই উচ্ছ্বসিত। ফেলিনির কথা শোনা এবং প্রয়োজনমতো ফেলেনিকে নানা প্রশ্ন করা সবই চলছিল একের পর এক। যথাযথ কথা বলে চলেছেন ফেলিনি। নানা কথা বলে ছেলেমেয়েরা, নানা প্রশ্নও করে কখনও নির্ভয়ে, কখনও বা কিন্তু কিন্তু করে। সাহস করে একজন বলে বসে আর বাকিরা মুখিয়ে থাকে জবাবের প্রত্যাশায়। বলে, 'চিত্রনাট্য লেখার দরকার আছে কি সবসময়?'

ভুরু কুঁচকে ফেলিনি বলেন, 'কে বলল নেই?'

বাকিরা সবাই, বলিয়ে ছেলেটিও, রীতিমতো ঘাবড়ে গেল, একে অপরের দিকে চাওয়া চাওয়ি করল। শেষ পর্যন্ত তরুণ ছবি-করিয়ে একজন বলেই ফেলল, 'মনের সাধ মিটিয়ে নির্ভাবনায় আপনি যেভাবে ইমপ্রোভাইজ করে থাকেন...।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ফেলিনি ছবি-করিয়ের কথাটা থামিয়ে দিয়ে চড়া গলায় বললেন, 'কে বলেছে এসব কথা? দ্যাট ইজ স্টুপিড গসিপ!'

দৃঢ়তার সঙ্গে ফেলিনি বলেন, 'জানবে ছবি হয় অঙ্কের নিয়মে। বুঝতে হবে, সিনেমার ব্যাপারটা মূলত বিজ্ঞানের ওপর দাঁড়িয়ে, এক জটিল প্রক্রিয়া। তবে, হ্যাঁ, একটা কথা। ছবি করা তো এক-আধ দিনের কাজ নয়। লম্বা রাস্তা ডিঙোতে হয়। চলে একের পর আর এক ধাপ। আরও। তার ওপর চার-পাঁচ মাসে যা তোমরা লিখেছ, চিত্রনাট্য, তাই নিয়ে পড়ে থাকলে চলবে না। ছবি করছ চোখ কান খুলে। কত কী-ই না দেখছ, কত কী শুনছ। সেসব তো উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। চলতে ফিরতে ছবি করতে করতে যা কিছু আসবে, যা কিছু দেখবে, যা কিছু শুনবে, সবকিছু নিয়েই হয়তো নতুন কিছু ভাববে। নতুন নতুন ভাবনা। অবশ্যই সেসব ইমপ্রোভাইজেশন নয়। খাঁটি নির্ভেজাল চিত্রনাট্য।'

আমার ধারণা, এই সমস্ত কথা বলে এবং এইভাবেই বকুনি দিয়ে শুরু করে কথার মারপ্যাঁচ বিতর্ক ইত্যাদি দিয়ে তরুণ কলাকুশলীদের সাবধান করে দেওয়াটাই সেই মুহূর্তে ফেলিনির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। যেন, বাপু হে, আগে অঙ্কটাকে রপ্ত করো, বোঝো, ছবি করার নিয়মকানুনগুলো জেনে নিয়ো, পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা ভাবার সময় তো পড়েই রয়েছে সামনে। আপাতত জমজমাট চিত্রনাট্য তৈরি করবে এটাই হয়তো ফেলিনি চেয়েছিলেন। ভবিষ্যৎ তো পড়েই আছে।

কথাগুলো হয়তো খুবই সত্যি। এই ধরনের প্রাথমিক ও যোগ্যতম পাঠ তরুণদের হাতে গুঁজে দেওয়াটাই বড় কথা। নিয়ম ভাঙা নিয়ম গড়া তো হবেই একদিন, যদি অবশ্য ভাঙাগড়ার ভাবনার কঠিন সময়ের জন্য তৈরি হতে পারো।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দ্বাদশ অধ্যায়

প্রায় পঁচিশ বছর আগে পুনের ফিল্ম ইনস্টিটিউটের বিদায়ী ছাত্রদের আমি কিছু কথা বলেছিলাম। সে কথাগুলো যারা এই পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউটের পড়াশুনো শেষ করে চলে যাচ্ছে তাদের জন্য। এ বক্তব্যর কোনও মানে আছে কি নেই জানি না। তবু বক্তব্যের শেষাংশ তুলে দিলাম।

> ...মনে রেখো যখন এই ফিল্ম মিডিয়াম-কে তোমরা ছুঁয়েছ, তখন জানবে তোমরা মানুষকে ছুঁয়েছ, মানুষের মনকে ছুঁয়েছ। সিনেমার প্রতি দায়বদ্ধতা মানে তোমার নিজের বিবেকের প্রতিও দায়বদ্ধতা। যখন এই শিল্পজগতে প্রবেশ করবে, তখন ঝুঁকিও নিতে পারো, আবার সাবধানেও পা ফেলতে পারো। ঝুঁকি নিলে হয় বাজিমাত করবে, নয় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আর ঝুঁকি না নিলে গয়ংগচ্ছ জীবন, দিনগত পাপক্ষয়। কোনটা করবে বেছে নেবার ভার তোমাদের। আমি শুধু বলব তৈরি হও তোমরা, সামনে কিন্তু কঠিন সময়!

একটা সময়ে আমি আর্থিক দুশ্চিন্তায় ক্রমাগত অনিশ্চয়তার সঙ্গে লড়াই করেছি। শারীরিক ভাবে, মানসিক ভাবে। একেক সময় নিজের সঙ্গে নিজে লড়াই করেছি। সবসময় তর্ক করেছি সৃষ্টি আর ব্যবসার ভারসাম্যের ব্যাপারে। কেউ বলছে না, কেউ বলছে ঠিক।

উদাহরণস্বরূপ 'পথের পাঁচালী'-র অসাধারণ সফলতার কথা বলা যেতে পারে। সৃষ্টি ও ব্যবসা হাতে হাত ধরে চলল। সমগ্র বিশ্বে সাড়া পড়ে গেল। অথচ সত্যজিতের দ্বিতীয় ছবি আমার মতে আরও ভাল, আরও অসাধারণ, সেখানে সৃষ্টি হল অথচ কোনও ব্যবসা হল না। পৃথিবীজুড়ে ফেস্টিভালে গেল। 'গোল্ডেন লায়ন' পেল ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে। এমনই একটা ব্যাপার এই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সৃষ্টি যেটি সর্বদা বিতর্কমূলক। এর কোনও শেষ, এ বিতর্কের কোনও সমাধান নেই। মনে পড়ে আমার বিগত পঁচিশ বছরের ঘটনাবলি। যেখানে পঁচিশ বছর আগে পুনের ছাত্রদের কনভোকেশনে বক্তব্য রেখেছিলাম। আমি ও গীতা কোনওদিনই স্বপ্নেও ভাবিনি এমন একটা বাসস্থান হবে যেখানে অনেক বাতাস, অনেক জায়গা থাকবে। কখনও ভাবিনি যে আমার নতুন গাড়ি হবে বা নতুন গাড়ি থাকবে প্রতি সাত বছর অন্তর। কুণাল ও নিশা বিয়ে করল ১৯৮০ সালে। যতদিন ওরা কলকাতায় ছিল ততদিন একসঙ্গে ছিলাম আমরা। একটা ঘরে আমি ও গীতা, অন্য একটি ঘরে কুণাল ও নিশা। আর একটি ঘর সবার জন্য। বাড়ির ঘরগুলো পুরনো আমলের, আসবাবপত্র সাজানো নয়। আকর্ষণীয় কিছুই নয়। কিন্তু আমাদের চারজনের সুখী পরিবার ছিল সেখানে।

আমি কোনওদিনই এসব নিয়ে ভাবিনি। এমনকী 'চালচিত্র' ছবিটি করবার পরও ভাবিনি। এমনকী ভেনিস উৎসবে যে ছবিটি দুটি ছোট পুরস্কার পেয়েছে সে জন্যও নয়। যদিও এগুলো সরকারি পুরস্কার নয়।

আমরা চলে এলাম সেই অশান্ত, সেই অস্থির সেই অনিশ্চয়তাময় শহর এই কলকাতাতে। এখানে এসে রমাপদ চৌধুরীর একটি উপন্যাসে আমি আমার মধ্যে ফিরে যাই। ছবি তৈরি হয় 'খারিজ'। অঞ্জন দত্ত ও মমতাশংকর মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করে। ছবিটিতে মধ্যবিত্ত সমাজের চরিত্রগুলো ধাক্কা খায়। এ সমাজের আমিও একজন। ছবিটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোনও বিশ্রাম ছিল না। কারণ বিশ্রামের কোনও অবকাশও ছিল না। টানটান গল্প, টানটান উত্তেজনা। অরোরা স্টুডিয়োতে শুটিং হয়। সেই বিখ্যাত অরোরা স্টুডিয়ো। যে স্টুডিয়োটি একসময়ে কত ভাল ভাল ছবি উপহার দিয়েছে। সেসব কথা মনে পড়ে আজ।

কাহিনিটি হল এই শহরে ভয়ংকর ঠান্ডার আবহাওয়া চলছিল। একটি কাজের ছেলে অপর একটি কাজের ছেলের সঙ্গে সিঁড়ির নীচে ঘুমোয়। কিন্তু ঠান্ডার জন্য একটি ছেলে পালান, যার বয়স বারো কি তেরো, সেদিন রান্নাঘরে উনুনের পাশে দরজা বন্ধ করে ঘুমোয়। যে বাড়িতে ওর বাবা ওকে কাজের জন্য রেখে গিয়েছিল, সে বাড়িতে স্বামী-স্ত্রী ও একটি পুত্র সন্তান নিয়ে সুখের সংসার। প্রতি মাসে মাইনে পেত পালান। পালান ছিল গ্রামের ছেলে।

উনুনটি জ্বলছিল। সকালবেলা সাড়া না পেয়ে দরজা ভেঙে দেখা গেল পালান মারা গিয়েছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ডাক্তার এল, পুলিশ এল। পালানের মৃতদেহ মর্গে গেল। পোস্টমর্টেম হল। উৎসুক জনতা বাড়ির সামনে ভিড় করতে লাগল। একমাত্র ছেলেটির অর্থাৎ পালানের বাবা ও পরিবার তখন অনুপস্থিত। এরা কিছুই জানতে পারল না।

কেউই অপরাধী নয়, দোষী নয়। কিন্তু অন্য ধরনের অপরাধবোধ দানা বাঁধতে লাগল। সেটা সেই পালানের গরিব বাবাও বুঝতে পারেনি। বাড়ির এতগুলো মানুষ তারাও বুঝতে পারেনি। পুলিশও ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামায়নি যতটা আইন নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে। সহানুভূতির ব্যাপারটা ছিলই না। কিন্তু এই নিষ্ঠুর মৃত্যু অঞ্জন ও মমতাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। প্রথমেই মনের ভেতরে লড়াই চলতে লাগল গোপন অপরাধবোধের। দুঃখের ও গোপন দায়বদ্ধতার ব্যাপারটা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। প্রথমেই এল নিজেদের রক্ষা করার প্রবণতা। রীতিমতো রেগেমেগে নিজেদের দায়বদ্ধতাকে পাশ কাটিয়ে ফেলা। একে অপরকে আঘাত করতে লাগল। যে আঘাতের বা কথা কাটাকাটির তেমন কোনও কারণ নেই।

আমেরিকার বিখ্যাত চিত্র-সমালোচক স্ট্যানলি কাউফম্যান বলেছিলেন যে, খারিজ সমস্ত পরিবারটাকেই খারিজ করেছিল। সমগ্র পৃথিবীর মানুষের বিরুদ্ধেই এই ছবিটি।

চিত্রনাট্যের কিছু অংশ:

অঞ্জন দত্ত এক প্রবীণ উকিলের চেম্বারে আলোচনা করছে। পাড়ার এক বিশিষ্ট প্রতিবেশী তার সঙ্গী। এঁরা এসেছেন উকিলের পরামর্শ নিতে। যাতে কোনওরকম আইনগত জটিলতার সৃষ্টি না হয়।

উকিল—আপনি বললেন ছেলেটি আপনার পরিবারেরই একজনের মতো, তাই নয় কি!

অঞ্জন—হ্যাঁ।

উকিল—এটা কথার কথা। আমরা তাদের আইনগত অধিকার কি দিয়ে থাকি? অথবা ওদের কোনও নৈতিক দাবিও কি মেনে নিই?

—কেউ কথা বলে না। চুপ করে থাকে সবাই।

উকিল—ছেলেটির বয়স কত?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

অঞ্জন—ছেলেটার বয়স! কত হবে, বারো কি তেরো।

উকিল—তা হলে মাইনর।

অঞ্জন—ওর বাবা ওকে এনেছিল।

উকিল—প্রতি মাসের মাইনে আর দু'বেলা পেট ভরে ভাত।

অঞ্জন—এখানে আমাদের কিছু করার ছিল না। আপনিই বলুন।

উকিল—আপনি যদি চোখ খুলে সতর্কভাবে দেখেন তা হলে দেখবেন সমগ্র পৃথিবীটাই নীতিগতভাবে অপরাধী। এমনকী আমরা, উকিলরাও। তাকিয়ে দেখুন আইনের বইগুলো। আমরা ওই বইগুলোর ভেতর নৈতিক ব্যাপারগুলো, আসল সত্যগুলোকে চেপে রাখি, গোপন করি। আইনের মিথ্যে কচকচানি ওই নীতিগত ত্রুটিগুলোকে চেপে রাখে।

একটু থেমে—

উকিল—দেখি। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট কী বলে।

পোস্টমর্টেম রিপোর্ট বলছে মৃত্যুটা অ্যাসফেকসিয়া নয়। কার্বন মনোঅক্সাইডের বিষাক্ত গ্যাসই মৃত্যুর কারণ।

অঞ্জন ও মমতা যখন কাউকে খুঁজে বেড়াচ্ছে পালানের গ্রামের ঠিকানার জন্য, তখনই ছেলেটির বাবা কলকাতায় এল মাস মাইনে নিতে।

পরের দিন মৃতদেহ পাওয়া গেল। পুলিশ সৎকারের অনুমতি দিয়ে দিল। মৃতদেহের সৎকার হল রাত্রিবেলা। একটু তাড়াতাড়ি। দেহের সৎকার হল পালানের বাবা, আত্মীয় আর বন্ধুবান্ধবদের চোখের সামনে। ওদের সংখ্যা খুবই কম। সবাই মোটামুটি ওই মহল্লার অল্পবয়সি কাজের ছেলে। যে ছেলেটি পালানের সঙ্গে সিঁড়ির নীচে ঘুমোত সে ছেলেটি পালানের বাবার সঙ্গে সবসময় ছিল। যে বাড়িতে ওই বন্ধুটি কাজ করত সে বাড়িতে ছুটি দিয়ে দিয়েছিল পালানের বন্ধুটিকে।

মৃতদেহ সৎকার এবং সব কাজ যাতে তাড়াতাড়ি ঠিকমতো হয়ে যায় এজন্য অঞ্জন ও তার এক প্রতিবেশী সেইসব ছেলেদের সঙ্গে মৃতদেহ বাহকদের সঙ্গে, পালানের বাবার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলেছিল, সঙ্গ দিয়েছিল।

মাঝরাতে সবাই সৎকার করে ফিরল পালানের বাবাকে সঙ্গে নিয়ে। বাড়ি এসে আগুনের ছোঁয়া নিল সবাই। এরপর পালানের বাবা বাড়ির ভেতর ঢুকল, সঙ্গে কয়েকটি ছেলে। বাড়ির সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ উঠে পালানের বাবা তাকাল

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

অঞ্জন ও মমতার দিকে। সঙ্গে অঞ্জন ও মমতার ছেলে। ভয়ংকর মুহূর্ত। নিশ্বাস পড়ছে না কারও। সবাই আতঙ্কিত। পালানের বাবা কাউকে কিছু না বলে হাতজোড় করে সে জায়গা ছেড়ে চলে গেল। পালানের বাবার পেছন পেছন অন্যান্য ছেলেরা হাঁটল। শুধু যে ছেলেটি সিঁড়ির নীচে শুয়ে থাকত পালানের সঙ্গে সে একবার মুখ তুলে তাকাল।

এভাবেই খারিজ ছবিটি শেষ হয়। বেশ কিছু রক্ত-গরম তরুণ শেষ দৃশ্যটি সম্পর্কে আপত্তি করল। বলল, পালানের বাবা ছেড়ে দিল পরিবারটিকে? তাই কখনও হয়?

অন্যদিকে লিন্ডসে অ্যান্ডারসন, যে ব্রিটিশ সিনেমায় ঝড় এনেছিল, অভিভূত হয়েছিল পালানের বাবার সেই শান্ত, ধীর, স্থির চেহারা দেখে। সম্মানবোধ দেখে। এসব কথা লিন্ডসে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিল। তার উত্তরে আমি জানিয়েছিলাম যে কেউ কেউ চাইছিল, পালানের বাবার উচিত ছিল ওই পরিবারের কর্তার গালে একটা চড় মারা।

আমি আমার এক পুরনো বন্ধুকে বলেছিলাম চড় মারার দরকার ছিল না। পালানের বাবার নীরবতাই চড় মেরেছে সবাইকে। এ মধ্যবিত্ত সমাজকে। এর উত্তরে সে বন্ধুটি বলেছিল আমার প্রতিভা গোল্লায় গিয়েছে।

এসব কথা আমি লিন্ডসেকে জানিয়েছিলাম। লিন্ডসে বলেছিল কান চলচ্চিত্র উৎসবে তোমাকে যে বইটা দিয়েছিলাম, সেই বইটা বের করো। পড়ে দেখ কী লেখা আছে। আমি বইটি বের করে পাতা উলটে দেখলাম। উত্তর পেলাম। মজার উত্তর। পরে বলছি।

বইটার লেখক লিন্ডসে অ্যান্ডারসন। কান চলচ্চিত্র উৎসবে আমাকে উপহার দিয়েছিল। অতি ভাল বই। 'অ্যাবাউট জন ফোর্ড'। প্রতিবাদী অথচ ভদ্র মানুষ। কোনওদিন কোথাও তাঁর আপস নেই। মানবদরদী। প্রায় পঞ্চাশ বছরের মতো তাঁর কর্মযজ্ঞের ইতিহাস। তাঁর একটি মাস্টারপিস হল 'স্টেজকোচ'। ১৯৩৯ সালে মুক্তি পায়। আমেরিকা নিয়েই। 'গ্রেপস অফ রথ'। ১৯৪০ সালে। আমেরিকার বিখ্যাত ঔপন্যাসিক জন স্টাইনবেক-এর গল্পের ওপর ভিত্তি করে এ লেখা। ১৯৩০ সালে আমেরিকার সেই কঠিন সময়ের কথা, গ্রেট ডিপ্রেশন-এর কথা আছে সেখানে। একটি কৃষক পরিবার উত্তর আমেরিকা ছেড়ে দক্ষিণে চলে আসে। সেখানে এসে আঙুর ফল তুলতে শুরু করে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সেখানে স্টাইনবেক বলছেন একটি রেখা যদি টানা যায় রাগ ও খিদের মধ্যে, তা হলে দেখা যাবে যে লাইনটি নেহাতই পাতলা ও সরু। খিদেকে কেন্দ্র করে রাগ আগেই জন্মাতে শুরু করেছে। ফোর্ড আমেরিকার বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক। অ্যান্ডারসন নিজেকে বলত, আমি ফোর্ডের কাজে নেশাগ্রস্ত।

অ্যান্ডারসন বেঙ্গালুরুতে জন্মায় এবং বড় হয় ইংল্যান্ডে। মারা যায় হার্ট অ্যাটাকে যখন ফ্রান্সের এক নদীতে সাঁতার কাটছিল।

টনি রিচার্ডসনকে দেখেছিলাম হলিউডে একটি পার্টিতে। তিনিও মারা যান হঠাৎ-ই। ক্যারেল রাইস সম্ভবত ইংল্যান্ডে এখনও জীবিত। অ্যান্ডারসন, টনি রিচার্ডসন, ক্যারেল রাইস। এ তিনজনের ব্রিটিশ সিনেমায় অবদান ভাবা যায় না। কিন্তু এঁরা বেশিদিন বাঁচলেন না, এটাই দুঃখের।

অ্যান্ডারসন কিন্তু বন্দুকের গুলি ছুড়ে গেছে বারবার, তিক্ত, খোঁচা মারা ছবি করেছে। অন্য ধাঁচের ছবি এসব। কাউকে ছাড়েনি। এমনকী রানিমাকেও নয়। 'ব্রিটানিয়া হসপিটাল' ছবিতে হসপিটালের সমস্ত স্টাফরা স্ট্রাইক বা ধর্মঘট ডেকেছে। কিন্তু রানিমা সেখানে আসছেন সে ব্যাপারটা যেন বাধাপ্রাপ্ত না হয়। সেজন্য নীরবে গোপনে তাঁকে কফিনে করে নিয়ে আসা হল: 'দ্য কুইন কাম্‌স ইন এ কফিন!'

খারিজের কথায় চলে আসি আবার। কয়েকটি শট ছাড়া পুরো ছবিটাই স্টুডিয়োতে শুটিং করা হয়েছিল। যে যুবকটি স্টুডিয়োতে সেট তৈরি করেছিল সে ছেলেটি আগে কোনওদিন কোনও এরকম স্টুডিয়োতে সেট-এর কাজ করেনি। কিন্তু সে কাজটি খুব ভাল করেছিল এবং স্টুডিয়োতে যে কাঠামো তৈরি করেছিল তা খুবই দক্ষতার সঙ্গে করেছিল। সেই পুরনো বাড়ির সেইসব ফিকে হওয়া দেওয়াল, তিনতলা বাড়ি তৈরি হয়েছিল। একতলা, দোতলা, তিনতলা আলাদা আলাদা করে। শুটিংয়ের পর এডিটিং টেবিলে বাড়িটা দেখে মনে হল জীবন্ত। মনে হচ্ছিল আসল বাড়ি। বাড়িটা যেন জল বৃষ্টিতে বাতাসে ধূসর হয়েছে। যেহেতু ছেলেটির অভিজ্ঞতা তেমন ছিল না তাই ওকে আমি অনেককিছু বুঝিয়েছি। অনেক সময় দিয়েছি। লম্বা সময়।

এরপর সেই যুবকটি অর্থাৎ নীতিশ রায়কে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। ভারতের একজন নামীদামি আর্ট ডিজাইনার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সে। নীতিশকে মূল কাহিনির আউটলাইন দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ওই বাড়ির একটি ফ্ল্যাটের স্বামী-স্ত্রীর জীবনের ধারা এবং বাড়ির একটা চেহারা নীতিশকে বলে দিয়েছিলাম, এবং ফ্ল্যাটটা ভাড়া নেওয়া ফ্ল্যাট, এটাও বলা ছিল।

নীতিশ আমাকে প্রথমেই জিজ্ঞেস করল ওদের বিয়েটা কীরকম হয়েছিল। বিয়ের ব্যাপারটা বাবা ও মায়ের পছন্দের পাত্র-পাত্রী, না ওদের নিজেদের পছন্দ।

অবাক হয়ে আমি নীতিশকে বললাম, এটা কোনও ব্যাপার হল! বাড়ি তৈরির ব্যাপারে এটা আবার কী!

নীতিশ বলল, বাবা মায়ের পছন্দ হলে অ্যাপার্টমেন্টটার চেহারা অন্যরকম। নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী বিয়ে হলে আরেকরকম। সেখানে আর একটু ফ্যাশনেবল।

আমি বুঝলাম নীতিশ আমার একাজের পক্ষে ঠিক ব্যক্তি। আবার এটাও ভাবলাম যে, নীতিশ এই নতুন প্রফেশনে অনেকদূর উঠবে।

১৯৮২ সালের জানুয়ারি মাসে যখন আমরা খারিজের শুটিং করছি তখন এলিয়ান স্টুটারহাইম ক্যাকটাস ফিল্মের বেশ কিছু বন্ধুকে নিয়ে স্টুডিয়োতে এসেছিল শুটিং দেখাবার জন্য।

ওরা কেউ কেউ সমালোচক, কেউ কেউ ইতিহাসের ছাত্র। বেশিরভাগই ইউরোপের মানুষজন। কয়েকজন এসেছিল উত্তর আমেরিকা ও কানাডা থেকে। ওঁরা সবাই এ শহরে এসেছিল ফিল্ম উৎসব দেখতে। এগারো দিনের উৎসব। ওদের সবাইকে আমি চিনি। বহুবার ওদের সঙ্গে দেখা হয়েছে বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে। এরকম ধরনের স্টুডিয়ো, পুরনো আমলের বাড়ি, এসব দেখে ওদের খুবই উৎসাহ হল। আমাদের সবাইকে ভাল লেগেছিল। যাওয়ার আগে এক বিশেষ বন্ধু জিন মাসকোভিচ আড়ালে ডেকে বললেন 'মৃণাল, আমি একটি ভাল ছবির গন্ধ পাচ্ছি।' আমি খুবই উৎসাহিত হলাম। মর্মস্পর্শী মনে হল। আমি হাত দুটো ধরলাম। ও আমার হাত দুটো চেপে ধরল। আমি জানতাম জিন মাসকোভিচ তখন ক্যানসারে ভুগছিলেন।

মাসখানেক বাদে জুরির সভ্য হয়ে বার্লিন যখন গেলাম ফেব্রুয়ারি মাসে, ঠিক তখন এ মানুষটি 'ভ্যারাইটি'-র হয়ে কভার করছেন। ভ্যারাইটি হল আমেরিকার একটি ট্রেড জার্নাল। ভীষণ ভাল সার্কুলেশন এ-জার্নালটির। আমি খেয়াল

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করলাম ওর মুখটা পাংশু, সাদা সাদা। বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে থিয়েটার হলের বাইরে যখন দেখা হল, আমি তখন ওর ওভারকোটটা ওর শরীর থেকে খুলতে সাহায্য করলাম। ওভারকোটটা ভারী লাগছিল ওর। আমি ওভারকোটটা বয়ে নিয়ে গেলাম ওর বসবার আসন পর্যন্ত। দু'জনে কথা হল। অনেক কথা। মে মাসে দেখা হবে। কান চলচ্চিত্র উৎসবে। আমি জুরি মেম্বার হব। ও ভ্যারাইটি-র হয়ে কাজ করবে।

কিন্তু কান চলচ্চিত্র উৎসবে, তিনমাস বাদে এখন সে হুইলচেয়ারে। ওই অবস্থায় থিয়েটার হলে এসেছে, ছবি দেখেছে। সমস্ত কাগজপত্র গোছগাছ করেছে। শেষ ছবিটা দেখে বিরক্ত হয়ে উঠে বলল, বাজে। সস্তা টেলিভিশনের ছবি। উৎসবের কর্মকর্তারা ওকে ব্যবস্থা করে বাড়ি পাঠিয়ে দিল। ফেরার পথে আমরা প্যারিসে ছিলাম দু'দিন। গীতা আর আমি জিনকে দেখতে যাই আমেরিকার হাসপাতাল নিউয়িতে। ও বলল, 'উৎসব চলতে চলতে ভেবেছিলাম তোমাদের দেখা পাব, দেখবার খুব ইচ্ছে ছিল।' হোটেলে মেসেজ রেখে গিয়েছিল। কারণ জিন জানত আমি তখন খুব ব্যস্ত। কিন্তু জিন খুব খুশি হয়েছিল আমরা ওকে দেখতে এসেছি বলে।

আমরা জিনের কাছে 'খারিজ'-এর কয়েকটা স্টিল ফটোগ্রাফ দিয়ে এসেছিলাম। হেসে বলল, মনে রেখো খারিজ সম্পর্কে আমার ভবিষ্যৎবাণী। জিন বলল, 'এ ছবিগুলো দেখব আর সেই সময়গুলোকে ভাবব যে আমি তোমাদের স্টুডিয়োতে ছিলাম।'

আমি বললাম, 'জিন, মনে আছে, তুমি বলেছিলে এটা ভাল ছবি হবে।'

'হ্যাঁ, মনে আছে।' স্টিলগুলো থেকে মাথা না তুলে দেখতে দেখতে বলল জিন। 'সামনের বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। ভাল কি খারাপ তখন বোঝা যাবে।'

আমরা ভেবেছিলাম যে অন্তত পরের বছর পর্যন্ত জিন বেঁচে থাকবে। ছবিটি বার্লিন বা কান-এ দেখতে পাবে। আমরা ওখান থেকে এয়ারপোর্ট এসে প্লেন ধরলাম।

কয়েক মাস বাদে জিল জ্যাকব, কান চলচ্চিত্র উৎসবের সংগঠক আমাকে প্যারিস থেকে ফোন করে জানালেন 'খারিজ' ছবিটি কান চলচ্চিত্র উৎসবে প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। খারিজ নির্বাচিত। আমি খুশি হলাম।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বললাম, 'জিন কেমন আছে?'

জ্যাকব বলল, 'এখনও বেঁচে।'

কয়েকটা মাস চলে গেল। ১৯৮৩-র ১৪ মে, আমার ছবি 'খারিজ' কান উৎসবে দেখানো হচ্ছে। সেদিনটা আমার জন্মদিন। ছবির টাইটেল আসার আগে পর্দায় ভেসে উঠল 'জিন মাসকোভিচ-এর স্মরণে।'

খবরটা পাওয়া গেল এলিয়ান-এর মাধ্যমে। আমরা দু'জনে, আমি আর এলিয়ান সিদ্ধান্ত নিলাম যে ছবিটি সেই জিন-এর স্মরণে উৎসর্গ করা হোক।

মনে পড়ে গেল যে ১৯৬০ সালে তৈরি 'বাইশে শ্রাবণ' সম্পর্কে জিন একটি সুন্দর লেখা লেখে। ভেনিসে এই ছবিটি দেখার পর। সে বলেছিল সাবটাইটেল ছিল না তবুও ছবিটি দেখে বুঝলাম যে সাবটাইটেল থাকলে কী ভাল হত। সে তখন জানত না আমি কে! কে মৃণাল সেন!

সত্যজিৎ রায় জিনকে খুব ভাল চিনতেন, পছন্দ করতেন খুব। ১৯৬০ অথবা তার পরের বছরেই জিনের সঙ্গে দেখা হয়, অবশ্যই কোনও চলচ্চিত্র উৎসবেই। কথায় কথায় জিন 'বাইশে শ্রাবণ'-এর কথা বলেছিল। সত্যজিৎ রায় দেশে ফিরে এসে আমাকে ফোন করতে ভোলেননি। বললেন, 'জিন মাসকোভিচ এক বিশিষ্ট চিত্র-সমালোচক, থাকে প্যারিসে, আর চলচ্চিত্র উৎসবে ঘুরে বেড়ায় সারা বছর। এবার যখন বাইরে যাবেন, নিশ্চয়ই দেখা করবেন। আপনার ছবি ভেনিসে দেখেছে। খুব বলছিল। লিখেছেও।'

দেখা হয়েছে বেশ কিছু পরে, যখন থেকে নিয়মিত চলচ্চিত্র উৎসবে যেতাম। আমাকে পরিচয় দিতে হয়নি, নিজে থেকেই এগিয়ে এল। সেই থেকেই আমার আর গীতার সঙ্গে জিনের সম্পর্ক জমজমাট হয়ে রইল। মৃত্যুর পরেও।

একটা কথা না বললেই নয়। কান চলচ্চিত্র উৎসবের প্রেস কনফারেন্স। 'খারিজ'-এর। আমার দেখার কথা নয়। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে কিছুটা দেখবার লোভ সামলাতে পারিনি। দর্শক সবাই গোটা পৃথিবীর সাংবাদিক, চিত্র-সমালোচক, লেখক। প্রায় ছ'-সাতশো-র ভিড়। পরদা উঠতেই এক কোণে জিনের ছোট এক ছবি, লেখা সেই: জিন মাসকোভিচের স্মরণে।

স্তব্ধতার মধ্যে সবাই একসঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। দরজার আড়াল থেকে আমার চোখে জল এল। আর দাঁড়ালাম না। দাঁড়াতে পারিনি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ত্র য়ো দ শ অ ধ্যা য়

অনেক কথা বলা হল তবুও অনেক কথা বাকি রয়ে গেল। অনেক অকথিত ব্যাপার স্যাপারও।

অক্টোবর, ১৯৭৬, যখন ঠান্ডা বাতাস বইছে, বয়েই চলেছে, তারপর যখন বড়দিনের উৎসব হাজির, যখন পুব-পশ্চিমের জার্মানি পুব-পশ্চিমেই বিভক্ত, বার্লিনের দেওয়াল যখন অটুট, তখন আমি চলচ্চিত্রের আসরে জুরির সভ্য। লাইপজিগ-এ। পূর্ব জার্মানিতে। বহু রকমের ছবি ছিল উৎসবে। ছোট বড় সব রকমের। ঠিক-বেঠিক নানা রকমের। বেশ কিছু ছবি দেখে ভুলে যেতে হয়। কিছু ছবি, যদিও অল্প, মনে রাখার মতো। জুরির সভ্যরা অনেক ঘাটাঘাটি করল, তর্ক বিতর্ক আলোচনা সবই হল। শেষ পর্যন্ত একটা সিদ্ধান্তে আসা গেল। খুব একটা দারুণ কিছু হল না, আরম্ভটাও তেমন সুখকর হল না।

একদিন এক কফি শপে একজনের সঙ্গে পরিচয় হল। নাম কার্লো আলভারেজ, সঙ্গে তার সুন্দরী স্ত্রী জুলিয়া, স্প্যানিশ উচ্চারণে 'হুলিয়া'। সঙ্গে ওদের বন্ধু ম্যানুয়েল। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের নাম বলল। নামগুলো আমার চেনাচেনা লাগল। সত্যিই চিনি কি? হ্যাঁ, অবশ্যই চিনি। মনে পড়ল ১৯৭২-এর কথা, চার বছর আগেকার কথা। মনে পড়ল, সুইজারল্যান্ডের ছোট এক চলচ্চিত্র উৎসবের কথা, জেনিভা লেকের কাছে, উৎসবের নাম ছোট এক শহরের নামে। নিয়োঁ। আমাকে বানিয়ে দেওয়া হল জুরির চেয়ারম্যান। প্রথমবারেই জুরির মেম্বার, প্রথমবারেই চেয়ারম্যান। লাগছিল ভালই, কিছুটা অস্বস্তিও। উৎসব শেষ হতেই জুরির সবাই যে যার দেশে ফিরে গেল। সবচেয়ে বয়স্ক ও সবচেয়ে বিখ্যাত বেসিল রাইট। মস্ত কাজের মানুষ। সবাই যে যার দেশে ফিরে গেল, থেকে গেল বেলজিয়ামের অঁরি স্টর্ক, ইয়রিস ইভেন্স-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দু'জনে মিলে কয়লাখনির ওপর একটা ছবি করে প্রচুর নাম হয়েছিল সর্বত্র। ছবির নাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'বরিনাজ'। আঁরি স্টর্ক ছাড়া থেকে গেল নিয়োঁ শহরেরই মরিৎস দ্য হ্যাডেল্‌ন ও তার স্ত্রী এরিকা। আর আমি অপেক্ষা করে রইলাম পরের দিন বিকেলের প্লেনের জন্য।

পরের দিন খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেল টেলিফোনের ডাকে। টেলিফোন করেছে মরিৎস, চলচ্চিত্র উৎসবের পরিচালক। এই মরিৎস দ্য হ্যাডেল্‌ন-ই কিছুদিন পরে বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে রীতিমতো জাঁকিয়ে বসল পরিচালক হয়ে। এরিকাও একদিকে মরিৎস-এর সহকারী হিসেবে কাজ করতে লাগল, আবার দু'জনেই নিয়োঁ-র চলচ্চিত্র উৎসব চালিয়ে যাচ্ছিল।

মরিৎস টেলিফোনে জানাল যে সে একটা জরুরি চিঠি পেয়েছে। আলোচনা দরকার অবিলম্বে। আঁরি স্টর্ক চলে আসছে, আমিও যেন চলে যাই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। মরিৎস-এর বাড়িতেই আমরা বসব।

চিঠির লেখক কার্লো আলভারেজ। লিখেছে কলাম্বিয়া থেকে, কলাম্বিয়ার এক জেল থেকে, গোপনে। শুধু আমাদের কাছেই নয়, পৃথিবীর সমস্ত সিনেমা প্রেমিকদের উদ্দেশে। চিঠির বক্তব্য: কার্লো ও তার স্ত্রী জুলিয়া এবং ওদের ছ'জন সঙ্গী জেলে মৃত্যুর দিন গুনছে। এরা মিলিটারি আদালতের সামনে দাঁড়িয়ে।

চিঠিতে আলভারেজ বলছে, 'আমরা চাই পৃথিবীর সবাই আমাদের কথা জানুক। আমাদের অপরাধ, আমরা ছবি করব আমাদের মতো করে। এই কারণেই মিলিটারি শাসকদের আমরা চটিয়ে দিয়েছি।'

আলভারেজ বলছে, 'কিছু করুন আপনারা, আমাদের বাঁচান! আর সময় নেই।'

আমরা চারজন— মরিৎস, এরিকা, আঁরি স্টর্ক ও আমি। খবরটা শুনেই ইয়রিস ইভেন্‌স-কে আঁরি স্টর্ক সব কথাই জানিয়ে দিল, বলল এখনই কিছু করা দরকার, না হলে সমূহ বিপদ। মৃত্যু পর্যন্ত গড়াতে পারে।

আমরা দুটো টেলিগ্রাম তৈরি করলাম, কড়া ভাষায় আমাদের কথা বললাম, সোজা কথায় জানালাম যে এ-ধরনের ফ্যাসিস্ট কায়দা হল সৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার মতলব। টেলিগ্রাম দুটো পাঠালাম— একটা কলাম্বিয়ার মিলিটারি সরকারকে, আর একটা ইউনেস্কো-তে প্যারিসে। আরও কিছু কিছু অ্যাসোসিয়েশনকে। ঠিক করলাম, লড়ে যাব শেষ পর্যন্ত। এবং শেষ পর্যন্ত ভাগ্য

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

যাদের নির্ধারিত ছিল মৃত্যুর পথে, তারাই এখন লাইপজিগের কফি শপে বসে সুস্থ দেহে মানুষের সঙ্গে কথা বলছে আর ভবিষ্যতের কথা ভাবছে। চার বছর পরে।

আরও একজনের কথা মনে পড়ল কথায় কথায়। চিলির পরিচালক প্যাট্রিসিয়ো গুসমানের কথা। ১৯৭২-এ আমি যখন নিয়োঁ-র জুরি-চেয়ারম্যান, যখন কলকাতা শহরে আমার ছবি 'কলকাতা ৭১' রমরম করে চলছে, তখনই জানানো হল যে পরের বছর, ১৯৭৩-এ, মানহাইম ফিল্ম উইকে আবার আমাকে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নিতে হবে। এবং খুশির কথা, গীতা আর কুণালও থাকবে আমার সঙ্গে। সেই প্রথম ওদের বিদেশ ভ্রমণ।

একই ঘটনা ঘটে চলেছে লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে। কিউবা ছাড়া সর্বত্রই। মিলিটারি শাসনের বেয়াদপি ছড়িয়ে আছে বেশিরভাগ দেশেই। 'প্যাট্রিসিয়ো অব চিলি'। প্রথম খণ্ড 'দ্য ফার্স্ট ইয়ার' মানহাইমের ফিল্ম উইকের প্রতিযোগিতা বিভাগে, আর ঠিক তখনই গুসমান জেল খাটছে, ছাড়া পাওয়ার কোনও নির্দিষ্ট সময় কারও জানা নেই। ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত তাই হল, 'দ্য ফার্স্ট ইয়ার' পেল স্পেশ্যাল জুরি প্রাইজ। পরিচালকের অনুপস্থিতিতেই পুরস্কার। এবং শুধু প্রথম খণ্ডেই নয়, তিন তিনটে খণ্ড জুড়ে 'ব্যাটল অব চিলি'-র বেশিরভাগেই ছড়িয়ে রইল চিলির প্রেসিডেন্ট সালভাদোর আইয়েন্দের-র কাহিনি, অসামান্য কাহিনি, আইয়েন্দের দুর্দমনীয় ইতিকথা। শুধু চিলি, কলাম্বিয়া অথবা আর্জেন্টিনাতেই নয়, সর্বত্রই। শুধু কিউবা ছাড়া। দেখা যায় একই কথামুখ সমস্ত ছবিতেই ঘোরাফেরা করছে— শুধু গুসমানের ছবিতেই নয়, অন্যদেরও।

এসব দেখি, ভাবি, একের পর এক। মনে পড়ে তারও অনেক আগে স্পেনের গৃহযুদ্ধের কথা। যে-যুদ্ধে গণতন্ত্রকামী শিবিরের সঙ্গে পৃথিবীর তাবড় তাবড় শিল্পী-সাহিত্যিক-কবিদের একটা অংশ একাত্ম হয়ে ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেড তৈরি হয়, যে-ব্রিগেডের মূলমন্ত্র 'নো পাসারান!' (অর্থাৎ দে শ্যাল নেভার পাস)। আবার ফিরে আসি ষাট-সত্তর দশকের 'কলোনাইজড' লাতিন আমেরিকার বীভৎস শোষণের দিনগুলিতে। ফিরে আসি সেসবের চরম বিরুদ্ধতায়, ফ্যাসিবাদবিরোধী চূড়ান্ত লড়াইয়ে। সেই লড়াইয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কত মানুষ হারিয়ে যায়, খুন হয়, কত রক্ত ঝরে। সেই রক্ত কি শুকোয় না?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আর সেই কথাটাই বলেছিলেন এক আফ্রিকান, বয়স ত্রিশ-বত্রিশের বেশি নয়, কিন্তু ওই বয়সেই স্বাধীন গায়ানার (ব্রিটিশ গায়ানা নয়) শিক্ষামন্ত্রী, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে সবে ফিরে এসেছেন লেখাপড়া শেষ করে! সুন্দর বক্তৃতা করেন— সহজ, সুন্দর, স্পষ্ট, দৃঢ়। একবার কলকাতায় এসেছিলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে, অ্যান্টিফ্যাসিস্ট রাইটারস অ্যাসোসিয়েশনের সভায়। আমি এবং আমার জনাকয়েক বন্ধুরা কলেজে পড়ি, আমরাও এসেছিলাম। আফ্রিকার শিক্ষামন্ত্রী ছোট ছোট বাক্যে অনায়াসসিদ্ধ ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা দিয়ে গেলেন। বললেন, 'আমরা যখন ছোট ছিলাম, আমাদের রাজা ছিল ইংরেজ। ক্লাসে পাঠ মুখস্থ করে অতি সহজেই বলতাম, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এতই বড়, এতই বিশাল যে, সেই সাম্রাজ্যে সূর্য কখনও অস্ত যায় না। ধীরে ধীরে বড় হলাম, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সম্পর্কে নতুন করে শিখলাম, বললাম, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এমনই সাম্রাজ্য যে সে রাজ্যে রক্ত কখনও শুকোয় না।'

সেই দিন থেকে আমি আর আমার বন্ধুরা ওই ভাষাতেই বলতাম, এখনও বলি।

মানহাইমের ফিল্ম উইকে গুসমানকে কেউই দেখতে পেল না, কিন্তু তাকে দেখা গেল তিন বছর বাদে, লাইপজিগে। হাজার হাজার মানুষ তাকে দেখল, তাকে নিয়ে কী-ই না করল সবাই। তিন বছর দেরি হলেও হল তো! মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়েও ফিরে এল গুসমান।

১৯৭৬ সালে লাইপজিগে আজেবাজে ছবি দেখে ক্লান্ত আমরা তখন কফি হাউসে এলাম। আরও অনেকে সেখানে। বেশিরভাগই লাতিন আমেরিকার মানুষ। কেউ কেউ অল্প অল্প কথা বলছিল মজা করে, কেউ আবার ভয়ংকর অভিজ্ঞতার গল্প বলছিল বিশদ ভাবে। অন্যান্য সবাই সে-সব কাহিনি শুনছিল আর ভাবছিল তাদের কথাকে কীভাবে কী বলবে!

এই ভিড়ের মধ্যে ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনাবলি শোনা ও বলার মধ্যে কেউ একজন গ্লেসিয়ের-এর নাম করল।

দিনের আলোতে সেই মানুষটিকে জোর করে তুলে নিয়ে চলে গেল আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনোস আইরেসের কতকগুলো গুণ্ডা মস্তান। সেই গ্লেসিয়েরকে আর কোনওদিন খুঁজে পাওয়া যায়নি। কেউ তাকে কোনওদিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আর দেখতে পায়নি। আমি গ্লেসিয়েরকে দেখেছি। ওর মুখটা আমার সামনে ভেসে উঠল।

১৯৭৩ সালের বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে একটা হ্যান্ডবিল বিলি করছিল গ্লেসিয়ের। প্রতিটি মানুষের কাছে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলছিল বার্লিন ফোরামে সিনেমা হলের ভেতরে। আমি যখন থিয়েটারে ঢুকছি, আমার এক বন্ধু গ্লেসিয়ের-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল।

আর্জেন্টিনার চলচ্চিত্র পরিচালক গ্লেসিয়ের। গ্লেসিয়ের আমাকে একটা হ্যান্ডবিল দিল। হ্যান্ডবিলে সেখানকার ট্রেড ইউনিয়নের খবরাখবর ছিল। আমি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালাম। আমি আমার উৎসাহ চেপে রাখতে পারলাম না এবং ওর কথাগুলো ছিল নির্মম স্বীকারোক্তি।

ছবি তৈরি আমার প্রথম ভালবাসা নয়, বলল সে। আমি ওকে বুঝতে পারলাম। কারণ ওর ছবি 'দ্য ট্রেইটর' আগের দিন দেখেছি। ওর প্রথম ছবি। বিষয়বস্তু একটি ট্রেড ইউনিয়ন নেতার জীবনকাহিনি। যে নেতাকে মেরে ফেলা হয়েছিল শেষ পর্যন্ত। আমি শুনেছিলাম ওকেও তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তারপর থেকে ও নিখোঁজ।

এই কলকাতা শহরেও সেই সময়ের কাছাকাছি এ রকম ঘটনা কিছু ঘটেছে। সুতরাং গ্লেসিয়ের-এর সঙ্গে এ-দেশের যোগাযোগ পরিষ্কার এবং সহজ।

একজন ব্রাজিলের যুবক গলাটা কেশে পরিষ্কার করে নিয়ে বলল খুব ধীরে ধীরে গ্লবার রশা-র নামটা। এই নামটাই যথেষ্ট এ আড্ডাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার জন্য। রশা এক বিখ্যাত চলচ্চিত্রনির্মাতা। ব্রাজিলের মানুষ। ব্রাজিলের সিনেমার মৌলিক চিন্তাবিদ। রশা-র বিরুদ্ধে ছ'টি ক্রিমিনাল কেস সাজানো হয়। সেসব কেসের মধ্যে সরকারকে উচ্ছেদ করবার অভিযোগও আছে। বাধ্য হয়ে এই চিত্রপরিচালক নিজের দেশ ব্রাজিল ছেড়ে দেশে দেশে পালিয়ে বেড়াতে লাগল।

রশা সব জায়গাতেই একা। দেশের বাইরে যেসব ছবি করছে, সেসব ছবি অবশ্য তেমন কিছু নয়। অবশেষে একজন শুভাকাঙ্ক্ষী প্রযোজক আফ্রিকায় নিয়ে এসে ওকে দিয়ে ছবি তৈরি করাল। ছবিটির নাম হল 'লায়ন হ্যাজ সেভেন হেডস'। প্রযোজক ছিল ফরাসি ও ইতালির কয়েকজন। যদিও রশা-র তৈরি ছবি তবুও রশা-র চরিত্র সৃষ্টির চমক কিন্তু তেমন সাড়া জাগাতে পারল না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আফ্রিকাতে এটা রশা-র শেষ ছবি। সমালোচকরাও খুব একটা আনন্দ পেল না কারণ রশা যে ধরনের ছবি করে ঠিক সেরকম। এ ছবিতে কৃষকদের কবিতা, দৈনন্দিন জীবন নিয়ে কথা বলা আছে।

আমি কিন্তু ওর ছবির মজা, ব্যঙ্গ, খোঁচা বুঝতে পারলাম যেটা সমালোচকরা ধরতে পারেনি। 'লায়ন হ্যাজ সেভেন হেডস' রশা-র এক বড় মাপের ছবি। আমার মতে, রশা-র যতগুলো ছবি আছে সেসবের মধ্যে এটি আমার বেশ ভাল লাগার মতো ছবি।

ব্রাজিলে রশা একটি বিরল ব্যক্তিত্ব। রশা নিজেই এক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। আমার সঙ্গে রশা-র কোনওদিন দেখা হয়নি। দেখা হলে বলতাম আফ্রিকা ও স্পেনে ছবি করার পর রশা-র ভক্তরা কেন দু'ভাগ হয়ে গিয়েছিল।

তা কী নিজের দেশ ছেড়ে অন্য দেশে ছবি করবার জন্য। হয়তো সেজন্যই না কি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিল বলেই। হয়তো বা। কিন্তু যে-ছবি দেখে আমি মুগ্ধ, বিস্মিত, ব্রাজিলে বসেই যে ছবি রশা করেছিল তা তুলনারহিত। *Antonio das Mortes* । মনে পড়ে ১৯৭৫-এর কথা। টম লাডি-র কথা। প্যাসিফিক ফিল্ম আর্কাইভ-এর প্রধান, ও আমার বন্ধু। টমের কথায় আমাকে বার্কলে-তে যেতে হয়, ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া-এ। আমাকে একদিন একটা চিঠি পড়তে দেয় টম, প্যারিস থেকে লেখা, রশার চিঠি। চিঠি পড়লে জানা যায় কী অসহ্য অবস্থার মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছে রশা। চাকরি চাই, অর্থ চাই ছবি করার জন্য, এমন কাউকে চাই যে রশাকে বুঝবে, রশাকে জানবে। রশার বাঁকা বাঁকা লেখা পড়ে বুঝলাম কী ভীষণ দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে মানুষটাকে, কী মলিন বন্দি জীবন নিয়ে চলতে হচ্ছে।

রশা নতুন এক চিত্রনাট্য পাঠিয়েছে ওই চিঠির সঙ্গে, ছবি করার জন্য আর্থিক সাহায্য চেয়েছে, বলছে ছবি এবার করতে চায় আমেরিকায়। টম আমাকে চিত্রনাট্যটি পড়তে দেয়। আমি পড়লাম, ঠাসবুনট কিন্তু মেটাফরের আড়ম্বর বড় বেশি। ধরনধারণ অনেকটাই 'লায়ন হ্যাজ সেভেন হেডস'-এর মতো, কিন্তু বাড়াবাড়ির মাত্রাটা বেশি। টম পড়েছে বলে মনে হল না। আমি তাই জিজ্ঞেস করিনি চিঠির জবাব দিয়েছিল কি না। সম্ভবত নয়! অর্থাৎ কিছু হল না।

প্যারিস থেকে রশা ব্রাজিলে ফিরে এল। নিজের দেশে, কিন্তু নিজের মানুষদের কাছে হয়তো নয়। তবু একটা কথা যারা রশাকে জানে, যারা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

মানুষটাকে বোঝে তারা কখনও ভুলবে না যে গ্লবার রশা একটা বই লিখেছিল, আয়তনে মোটেই ভারী নয় অথচ অর্থবহ। ভুলে যাওয়ার মতো নয়— *Aesthetics of Violence* ।

যাদের যাদের কথা উঠল, ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল, সবই ওই লাইপজিগের কফি হাউসে। বেশিরভাগই লাতিন আমেরিকার টুকরো টুকরো ঘটনা, ছোট বড় ঘটনাও, নিজেদের দেশের ভেতরকার এবং লাতিন আমেরিকার আরও অনেক দেশের কথা। কতই না ঘটনা। যেন গোটা পৃথিবীকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে লাইপজিগের সেই কফি হাউসে।

আরও কত কথা। আরও একবার লাইপজিগে গিয়েছিলাম। দু' বছর বাদে। সেমিনারে। যখন সেমিনার শেষ করে এয়ারপোর্টে যাওয়ার জন্য গাড়িতে উঠছি তখন পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ বছর ছুঁইছুঁই একজন ছুটে আসছে আমার দিকে। হাতে একটা লং প্লেয়িং রেকর্ড। ছুটে এল, আমারে ধরেও ফেলল, বলল, 'আমি আর আমার এক বান্ধবী কার্থাজ ফিল্ম উৎসবে, টিউনিসে, আপনার ছবি দেখেছি, 'ওকা উড়ি কথা'। দারুণ লেগেছে।' তারপর লং প্লেয়িং রেকর্ডটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিল, বলল, 'এটা আপনার।' দেখি, আমার নাম ওপরে লেখা, নীচে ওর হাতে লেখা সই। নাম হর্হেস সানসিনেস, বলিভিয়ার পরিচালক। বলল, 'এটা আমার ছবির গানের অ্যালবাম।' ছবির নাম সেই বিখ্যাত *Blood of the Condor*। সবাই জানে ছবিটাকে, কিন্তু সাড়া পেল না তেমন। এই হয়। কারও ভাল লাগে, কারও বা তেমন নয়। ছবিটি আমি দেখেছিলাম বছরখানেক আগে। আমার ভাল লেগেছিল, আর অ্যালবামটা অসাধারণ। এর নাম আমি অনেক শুনেছিলাম, আগে। তারুণ্যে উজ্জ্বল। হর্হেস সানসিনেস! বলিভিয়ার বেপরোয়া পরিচালক!

ফার্নান্দো সোলানাসের কথা কে না জানে! আর্জেন্টিনার সোলানাস। নামে জানতাম, ছবি দেখেছি, লিখেছিও সেইসব ছবি নিয়ে। এবার, এই প্রথম, দেখা হল কান-এ, ১৯৭৮-এ। এবারও চিনতে পারিনি। দেখলাম এক অচেনা মানুষকে। অথচ ঠিক অচেনাও বলা যায় না। যেন আমার কাছেরই কেউ। 'ফর্টনাইট' বিভাগের বিশেষ এক স্ক্রিনিং থেকে সবাই বেরিয়ে আসছে ছবি শেষ হতেই। আমারই ছবি 'ওকা উড়ি কথা'। প্রচুর ভিড়, ভিড়ের মধ্য থেকেই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

বেরিয়ে আসছে, সঙ্গে বিভাগীয় সেক্রেটারি জেনারেল, আমার বিশেষ বন্ধু। ছবি ভাঙতেই দর্শকেরা আমাকে ঘিরে ধরল এবং চলল নানা প্রশ্ন। প্রশংসা তো বটেই। প্রশংসা শুনতে কার না ভাল লাগে। আর লাগে বলেই দর্শকদের ঠেলেঠুলে আমি এগিয়ে আসতে চাইছি না। অথচ দেখতে পাচ্ছি 'ফর্টনাইট' বিভাগের সেক্রেটারি জেনারেল দাঁড়িয়ে আছে অপেক্ষায়। এবং সেই মানুষটিও। সেক্রেটারি জেনারেলের তর সইছিল না, ভিড়ের মধ্য থেকে আমাকে টেনে বার করল, এবং দাঁড় করিয়ে দিল সেই মানুষটির মুখোমুখি। দুজনেই তখন হাসছে, মৃদু। আমি না পারি হাসতে, না পারি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতে। পরিষ্কার বুঝলাম, আমাকে একটি সারপ্রাইজ দেওয়ার মেজাজে রয়েছে ওরা। আশপাশ দিয়ে দর্শকেরা যাওয়া আসা করছে, অনেকেই বা তাকিয়ে দেখছে, হাত তুলে অভিনন্দন জানাচ্ছে অনেকে।

একটু এগিয়ে এসে সে আমার হাতটা ধরল, বলল, 'পারলে ভু ফ্রাঁসে?' অর্থাৎ ফরাসি জানি কি? যদিও নিজের ভাষা স্প্যানিশ। আমি এবার হেসে ফেললাম, বললাম, 'নো (non)'।

তারপর পরিচয় হতেই আমি যেন লাফিয়ে উঠলাম বাচ্চা ছেলের মতো। 'আওয়ার অব দ্য ফারনেসেস'-এর কথা তুললাম, ওদের দেশের নিও-কলোনিয়ালিস্টদের কথা, ওদের সেই বীভৎস নিও-ফ্যাসিস্টদের কথা। সোলানাসের সেই অসামান্য বাক্যটি বলতেও ছাড়লাম না: 'We fear peace more than war !'

সোলানাস বলল, আমার ছবি দেখে নাকি ভীষণ ভাল লেগেছে, মনে হয়েছে এ-ছবি যেন তার নিজের দেশেরই ছবি। দুঃখ-দারিদ্র্য, বিষণ্ণতা ও ফুঁসে ওঠায় দুই দেশের মানুষের মধ্যে কোনও ফারাক নেই। রাস্তাঘাট পথ-প্রান্তর এবং চোখ মুখের আদলের মধ্যে বেমিল অবশ্যই অনেক, কিন্তু বিভেদ নেই অন্তরমহলে। বলে, 'আমি দেশ থেকে পালিয়ে এসেছি। পালানো ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। কিন্তু পলাতক হয়ে বিদেশে থাকাটা যে কী ভয়ংকর যন্ত্রণার তা বোঝাতে পারব না।'

বুঝি, সোলানাসের যন্ত্রণা কোথায়। বুঝি, কী অসহায়তায় ভুগছিল ব্রাজিলের গ্লবার রশা। এবং আরও কত না পলাতক।

সোলানাসের কথার কোনও জবাব আমার ছিল না ঠিকই, কিন্তু সেই থেকে সোলানাসের সঙ্গে আমার সম্পর্ক দারুণ জমে উঠল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এইভাবে দুনিয়া জুড়ে ঝড়ের সংকেত। এইভাবেই দুর্যোগ অব্যাহত, স্বৈরতন্ত্রের কদর্য অত্যাচার, শিয়রে শমন। তারই সঙ্গে প্রতিবাদী দুর্জয় সংকল্প। অবিরাম। কান-৭৮-এ সোলানাস সেই সবের অনেক কিছু বলে গেল, অনেক কিছু শুনলাম। শুধু আর্জেন্টিনার কথাই নয়, লাতিন আমেরিকা জুড়ে নানা কথা। হয় মৃত্যু, নয়তো পালিয়ে যাওয়া। সর্বত্রই আঁতকে ওঠা, গা হিম হয়ে আসা, রক্ত জল হওয়া। অ্যাফ্রো-এশিয়ান দেশে অতটা জোরালো হয়নি ঠিকই, তবু কম বেশি ঘটেছে। ঘটছে, ঘটেই চলেছে। আর, যেসব দেশ নিও-কলোনিয়ালিস্টদের খপ্পরে পড়েনি তেমন করে, পড়ার সম্ভাবনাও কম, অথবা নেই বললেও চলে, সেসব দেশের সংস্কৃতিমনা মানুষেরাও, বিশেষ করে যুবসমাজ, চুপচাপ বসে থাকতে পারছে না। খবরগুলো ছড়িয়ে দেওয়ার কথা ভাবছে তারা। এবং যখনই কোনও ঘটনা ঘটেছে নিজের দেশেই, নিজেদেরই অঞ্চলে, তখনই রুখে দাঁড়িয়েছে। যেমন ১৯৬৮-র মে মাসে, কিছুটা আগে থেকেও বা। ১৯৭৮-এর দশ বছর আগে।

ঠিক-বেঠিক যাই বলা যাক, প্যারিসের ছাত্রছাত্রীদের কাছে সে এক উদ্দীপ্ত সময়। ঠিক-বেঠিক যাই বলা যাক, সরবন-এর ছেলেরা মেয়েরা এক আগুন-জ্বালানো আবেগে উজ্জীবিত। ঠিক-বেঠিক যাই হোক, গোদার তার বন্ধুবান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীদের নিয়ে উঠল কান চলচ্চিত্র উৎসবের দোরগোড়ায়। সেদিনই উৎসবের শুরু, সেদিনই দিনের শেষে গোদার তার দলবল নিয়ে স্টেজের ওপরে গিয়ে দাঁড়াল। আলোয় আলোয় তখন ঝলমল করছে উৎসব। দর্শককুল উঠে দাঁড়াল, কী করবে গোদারের দল বুঝে উঠতে পারল না। হঠাৎ কিছু মানুষের, গোদার আর গোদারের দলের, উজ্জ্বল শ্লোগান, 'ভিভা মাও!'

ফলে, কান-৬৮ বন্ধ সেবছরের মতো!

এরকম কোনও ঘটনা এর আগে ঘটেছে এমন মনে হয় না। হয়তো নয়, হয়নি বলেই জানি।

ঠিক তারই একবছর পরে, সরবন তখন শান্ত, ১৯৬৯-এর দ্বিতীয় সপ্তাহের শুরুতে, যেমন হয়ে থাকে প্রতি বছর, আবার কান-এর উৎসব জমে উঠল। কান, ১৯৬৯। যেমন চলে বরাবর তেমনি সব চলতে লাগল। এবং উৎসবের শেষ হল ইংল্যান্ডের অধৃষ্য চলচ্চিত্রকার লিন্ডসে অ্যান্ডারসনের 'পাম দ'র প্রাপ্তিতে। গ্র্যান্ড প্রাইজ। সর্বোচ্চ উপহার। ছবি[illegible] নাম [illegible] অর্থাৎ যদি এমন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হত। অর্থাৎ ইংল্যান্ডের ফ্যাশনদুরস্ত এক দাপুটে পাবলিক স্কুলের বেয়াড়া নিয়মকানুন সব যদি ভেঙে ফেলা যেত। অথবা ছবি দেখে আমি যেমন মুগ্ধ হয়েছি, যেমন করে ছবিটিকে মর্যাদা দিতে পেরেছি, তাই আমার মতো করে, আমারই বিচারে, আমার মননে, আমার কল্পনায়, একদিকে যেমন দেখতে পাই চূড়ান্ত ফিচলেমি, ফাজলামি, অন্য দিকে... it has a sharp note of defiance and is a violation of the Anglo-Saxon understanding of the British code of ethics. ... It is, by and large, merrily *un-British*!

'মেরিলি আন-ব্রিটিশ'! কথাটা যেমনি মজাদার, তেমনি শ্লেষাত্মক। লিন্ডসে অ্যান্ডারসনের ছবিতে এরকম একাধিক দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে। একটি ছবি, নাম 'ব্রিটানিয়া হসপিটাল'। কান চলচ্চিত্র উৎসবের মূল বিভাগে দেখেছিলাম। আমি তখন উৎসবের জুরির সদস্য। ১৯৮২ সালের ছবি। হাসপাতালের শ্রমিকদের ধর্মঘট চলছে নানা দাবিদাওয়া নিয়ে, পোস্টারে ছেয়ে গেছে দেওয়াল, জ্বালাময়ী বক্তৃতায় মুখর হাসপাতাল চত্বর। অথচ আগেভাগেই ঠিক ছিল, ইংল্যান্ডের মহারানি হাসপাতাল পরিদর্শনে আসছেন। মহারানি বলে কথা! সরকারি ব্যবস্থাপকেরা কূল-কিনারা পাচ্ছেন না। কী হবে, কী করা যায়! হঠাৎ সারা পরদা জুড়ে ফুটে উঠল: 'দ্য কুইন কামস ইন এ কফিন'।

তখনও প্রতিযোগিতার ফলাফল বেরোয় নি। একদিন আড়ালে পেয়ে আমি বললাম লিন্ডসেকে: দারুণ জমিয়েছো, কিন্তু ভারতীয়দের মন পেতে যদি বলতে: 'দ্য কুইন অব ইংল্যান্ড অ্যান্ড দ্য এমপ্রেস অব ইন্ডিয়া কামস ইন এ কফিন'। কথাটা লিন্ডসে-র খুব ভাল লেগেছিল, কিন্তু বলল: 'তোমাদের দেশ যদি এখনও কলোনি-ই থেকে যেত তা হলেই জমত খুব, দারুণ জমত।'

আমার দুর্ভাগ্য যে ছবিটি শেষ পর্যন্ত কোনও পুরস্কার পেল না। পুরস্কার পেল না ঠিকই, কিন্তু লিন্ডসে মানুষটি যেমন থাকার তেমনিই থেকে গেল। লন্ডনে ফিরে যাওয়ার আগে আমাকে ওর সেই বইটি দিয়ে গেল। যেটার কথা আগেই বলেছি। 'অ্যাবাউট জন ফোর্ড'। প্রথম পাতা খুলতেই দেখি ওরই হাতে লেখা কয়েকটা কথা: For Mrinal.... 'Are we intelligent enough to survive?' (And thank you for understanding) Salut! Lindsay 1982.

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চ তু র্দ শ অ ধ্যা য়

'ইউ আর এ ডেলিশিয়াস লায়ার, মৃণাল।' ভদ্রমহিলা বললেন আমাকে। মুখে তাঁর স্মিত হাসি। হাসতে হাসতে কথাটা বলে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন।

১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে আমরা দু'জনেই আমি এবং ওই ভদ্রমহিলা বিচারক ছিলাম। ভদ্রমহিলা ছিলেন চেয়ারপার্সন। ভদ্রমহিলা ছাড়া মোট ন'জন বিচারকের মধ্যে আমরা তিনজন মোটামুটি একই মানসিকতার মানুষ ছিলাম।

তিনজনের মধ্যে ডেভিড স্ট্রাটন বিশিষ্ট ডিস্ট্রিবিউটর, একজিবিটর। অস্ট্রেলিয়ার সিডনির মানুষ। আর একজন হলেন হেলমা স্যানডারস ব্রাহামস যিনি বার্লিনের মানুষ। ইনি অনেক পুরস্কার পাওয়া ছবি করেছেন। বেশকিছু ছবি নারীবাদের ওপর। আমরা এই তিনজন ছিলাম মানসিক দিক থেকে কাছাকাছি। খোলা মনের। মানসিকতার দিক থেকে একই নৌকার যাত্রী। বাকিদের মধ্যে সবাই আবার নিজের মতামত সম্পর্কে কিছুটা গোঁড়া।

ছবি বিচারের শেষ প্রান্তে আমরা রীতিমতো ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। বেশ জোর বিতর্ক সৃষ্টি হল। সে বিতর্কের শেষ নেই। মতামত বেশ কঠিন চেহারা নিল। ভিন্ন রাস্তা নিল। দূরত্ব বাড়ল মতামতের ক্ষেত্রে। লড়াই হচ্ছিল দুটো ছবি নিয়ে। দুটো ছবিই গোল্ডেন বিয়ার পাওয়ার জন্য লড়াই করছিল।

যখন বিতর্ক চরমে উঠল, উত্তেজনা বাড়ল। যখন দেখা গেল কোনও সিদ্ধান্তে আসা যাচ্ছে না, তখন চেয়ারপার্সন নিজের মতামত জানালেন, ব্যাপারটায় মাথা গলালেন। শুধু তাই নয় শ্রেষ্ঠ ছবিটির ব্যাপারে মতভেদের বিরুদ্ধে কথা বললেন। চাইলেন সবাই একই কথা বলুক। সর্বসম্মতভাবে ব্যাপারটাকে আনতে তিনি বললেন, আপনাদের প্রত্যেকের প্রয়োজন তাজা ফুরফুরে বাতাস। তিনি আধ ঘণ্টার জন্য একটি বিরতি ঘোষণা করলেন, যাতে ক্লান্ত বিচারকদের নার্ভগুলো একটু বিশ্রাম পায়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আধ ঘণ্টার জন্য আমরা ছবি নিয়ে কোনও আলোচনা করলাম না। হালকা মেজাজে সবাই উঠে দাঁড়ালাম। আমি কফি খেতে চলে গেলাম অন্যান্য সবার সঙ্গে। চেয়ারপার্সন আমাদের সঙ্গে এলেন এবং আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। উনি যখন এলেন আমি একটা সুন্দর গন্ধ পেলাম। এদিক-ওদিক দেখলাম। কোথা থেকে এ সুগন্ধ আসছে?

সেই ভদ্রমহিলা, সেই চেয়ারপার্সন আমার কাছে এসে বললেন: 'পারফিউম।' ভদ্রমহিলাকে মিষ্টি হাসি, রহস্যময়ী হাসিতে সুন্দর দেখাচ্ছিল। আমি বললাম, 'আমি বিশ্বাস করি না।'

ভদ্রমহিলা তখন মৃদু মৃদু হাসছেন এবং চেষ্টা করছেন আমার মনকে বোঝবার। 'আশ্চর্য আপনার কোনও পরিবর্তন নেই!' বললাম আমি।

'না!' বললেন উনি।

'আপনি একইরকম আছেন।'

'কীরকম?'

'যেদিন আমি প্রথম দেখেছিলাম। বহু বছর আগে... 'রেবেকা'-য়।'

ভদ্রমহিলা হাসতে হাসতে বললেন, 'You are a delicious liar, Mrinal'।

আমার মনে হল এ কথাটা বলতে ভদ্রমহিলা ভালবাসেন। ভদ্রমহিলা আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। এসবের মধ্যে গোপন করার কিছু নেই। লজ্জা পাওয়ারও কিছু নেই। জোন ফনটেন, এঁকে আমি প্রথম দেখি ১৯৪১ সালে। লরেন্স অলিভিয়ের অভিনীত হিচককের ছবিতে নায়িকা হিসেবে। একসময়ে হলিউডের খ্যাতনামা অভিনেত্রী। এখন চলচ্চিত্র উৎসবের বিচারক। শুধু বিচারক নয়, বিচারক প্রধান।

আবার আলোচনা, আবার সেশন শুরু হল এবং যথারীতি তর্কবিতর্ক চলল।

সব জায়গাতেই সর্বস্তরে যখন এরকম বাকযুদ্ধ চলে তখন আমাদের আর কিছু করার থাকে না। তখনই ছবির বিরুদ্ধে ও সপক্ষে ভোটাভুটি হয়। যাইহোক ভোটাভুটি হল। যে ছবিটির নাম ঘোষিত হল শ্রেষ্ঠ ছবি হিসেবে সে ছবিটি বিতর্কিত রয়েই গেল। একইসঙ্গে হর্ষধ্বনি ও নিন্দাধ্বনি শুরু হল ছবিটির নাম ঘোষণার পর।

মাস তিনেক বাদে কান চলচ্চিত্র উৎসবে আমার প্রথম দেখা হল গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ-এর সঙ্গে। এত বছর বাদে যখন আমি লিখছি, তখন তাঁর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আত্মজীবনী আমার হাতে এল। আত্মজীবনীর নাম *Living to Tell the Tale*। সঙ্গে সঙ্গে আমি সেই বইটি থেকে উদ্ধৃত করলাম আমার একটি বইয়ের নতুন অধ্যায়ের শুরুতে জোন ফনটেন-এর সেই মন্তব্যের সঙ্গে মিলিয়ে: The 'delicious liar' continues 'to tell the tale', left untold।

মার্কেজ বিচারপতি বা বিচারক ছিলেন ১৯৮২ সালের কান চলচ্চিত্র উৎসবে। সেখানে আমিও ছিলাম। আমাদের সঙ্গে ছিলেন জেরালডিন চ্যাপলিন, যিনি একজন দক্ষ অভিনেত্রী। তিনি আবার ঘটনাচক্রে চার্লি চ্যাপলিনের কন্যা। সর্বসাকুল্যে ন'জন। বার্লিনেও এই ন'জনই ছিলেন বিচারকের আসনে।

আমি আর গীতা কান-এ এলাম উৎসব শুরু হওয়ার একদিন আগে। প্রথমে কফি শপে আমাকে সংবর্ধনা জানাতে এলেন উমবের্তো সোলাস। ইনি হাভানার মানুষ, আমার বন্ধু। পরে কান উৎসবে দেখলাম ওঁর ছবি *Cecilia*।

সোলাস রোম থেকে এখানে এসে পৌঁছেছেন একঘণ্টা আগে। আমি আলাপ করে খুশি হলাম এবং গীতাকে পরিচয় করালাম। সোলাস এসেছেন ওঁর ছবির জন্য। ভিড়ে ঠাসা সেই কফিশপে একটা টেবিলে তিনজনে বসলাম। আমি, গীতা আর সোলাস। ভয়েতে আমার সঙ্গে বেশি কথা বললেন না সোলাস। কারণ আমি বিচারক হিসেবে আমন্ত্রিত। ওঁর ব্যাপারটা বুঝলাম। কিন্তু আবার মনে হল ওঁকে আমি পেলাম না। ওঁকে কাছে পেলে ভাল হত।

একদিন আমি ও গীতা হল থেকে বের হচ্ছি যখন, তখন মার্কেজ পেছন থেকে ডাকলেন। আমরা পেছনে তাকালাম। মার্কেজ ও তাঁর স্ত্রী আমাদের দু'জনকে ডেকে একটা ধারে নিয়ে গিয়ে উমবের্তো সোলাসের 'সিসিলিয়া' ছবিটির কথাই জানতে চাইলেন। ছবিটা একটি জটিল ভালবাসার ছবি। সেই সময়কার ছবি, যখন কিউবা স্বাধীন হয়নি। ছবির নায়িকা কিউবার মেয়ে, আর নায়ক স্পেন-এর বড় অফিসার। ওদের দু'জনের ভালবাসার ছবি।

'তোমার কি ছবিটা ভাল লেগেছে?' জিজ্ঞাসা করলেন মার্কেজ।

'আমি দুঃখিত। আমি তোমার সঙ্গে একমত নই।' বললাম আমি।

'আমি তোমাকে কিন্তু বলিনি যে আমার ছবিটি ভাল লেগেছে, কি লাগেনি।'

'তোমার প্রশ্নটা! তোমার প্রশ্নটাই বলে দেয় যে তুমি ছবিটা পছন্দ করোনি।'

মার্কেজ আমার পিঠ চাপড়ে সম্মতি জানিয়ে মাথাটা নাড়লেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যে-কোনও চলচ্চিত্র উৎসবে এমনকি কান উৎসবেও ছবি নির্বাচন করা খুব জটিল কাজ। সেজন্য আমরা ঠিক করে নিলাম যে একটা বাছাই ছবির ছোটখাটো তালিকা তৈরি করব। খুব সচেতন ও নিরপেক্ষভাবে, প্রথমে কোনও ছবি দেখে ভাল না লাগলে বাদ দিয়ে দেব। প্রতি তিনদিন অন্তর আমরা বিচারকরা একসঙ্গে বসব, আলোচনা করব। নির্বাচিত ছবি নিয়েও আলোচনা করব। নির্বাচিত ছবিটি দ্বিতীয়বার দেখব। এসব আর কিছুই নয়, নিজেদের সিদ্ধান্তের খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো বারবার বিচার করব এবং ভাবব। অনেকবার ভেবেটেবে আলোচনা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছব সেসব ছবি নিয়ে— যেসব ছবি প্রতিযোগিতার স্তরে শেষ পর্যন্ত দৌড়বে। এসব চুলচেরা বিচার করে যে ছবিটি সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হবে, সেটিও বিতর্কমূলক হতে পারে। যে-কোনও চলচ্চিত্র উৎসবে। শুধু কান বলে নয়, সর্বত্র একই ব্যাপার চলে।

প্রাথমিক অবস্থায় আমি কিউবার ছবি *Cecilia* নিয়ে কথা বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু দেখা গেল এ ছবিটির ব্যাপারে কেউ কোনও কিছুই বলল না। উৎসাহ দেখাল না। ছবিটি আমার ভাল লেগেছিল, তবুও ছবিটি নিয়ে তেমন কিছু বললাম না।

পরে যখন আমরা দ্বিতীয় পর্বের আলোচনা করবার জন্য মিটিং করতে ঘরে ঢুকব, চ্যাপলিন-কন্যা ছবিটির উচ্চস্বরে প্রশংসা করলেন। তখন আমি ওকে একদিকে টেনে নিয়ে গিয়ে বললাম, এ ছবিটি আমারও ভাল লেগেছে। তবে এ-ছবিটি সেরা ছবির অন্তর্গত হতে পারে না। তবুও আমি বিশ্বাস করি যে এ-ছবিটি নিয়ে আলোচনা করা উচিত ছিল, কারণ ছবিটি অন্য ছবিগুলোর চাইতে গুণগত দিক দিয়ে আলাদা শ্রেণির। আমি বললাম, আমি মিটিংয়ে এ-ছবির কথা তুলব এবং আমি আশা করলাম যে চ্যাপলিন-কন্যা আমাকে সমর্থন করবেন।

মিটিং শুরু হল এবং এক ঘণ্টা চলল। মিটিংয়ের সভাপতি আমার প্রতি সদয় ছিলেন এবং উনি আমাকে আলোচনা করতে সুযোগ ও সময় দিলেন। আমি অল্প সময়ের মধ্যে ছবিটি সম্পর্কে বললাম। ভালই বললাম। কিন্তু বুঝলাম আমার বক্তব্যে অন্যান্য বিচারকরা সন্তুষ্ট হননি। আর কিছু করার নেই। জেরালডিন চ্যাপলিন আমার দিকে তাকাল। ওকে দেখলাম ব্যস্ত হয়ে একটা কাগজে কী করছে। আমি বুঝলাম এ সভাতে আমি সংখ্যালঘুদের দলে। সুতরাং যারা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সংখ্যায় বেশি তাঁরা প্রমাণ করবেন— কোন ছবিটি ভাল, যুক্তিকে সামনে রেখে। সঙ্গে সঙ্গে এ ব্যাপারে আমি নিজেকে বিরত করলাম। চুপ করে গেলাম।

বাইরে বেরিয়ে এসে জেরালডিন আমার হাতটা চেপে ধরল এবং সোজাসুজি স্বীকার করল: চলচ্চিত্র উৎসবে বিচারক হওয়া এক বিশ্রী ধরনের কাজ। বোঝা গেল জেরালডিন মুষড়ে পড়েছে কারণ সে এই প্রথম একটি উৎসবে বিচারক হয়েছে। আমি বললাম, চিন্তা কোরো না। এ ব্যাপারটা ভুলে যাও। আমি বা তুমি কেউই ছবিটার জন্য কিছু করতে পারতাম না।

প্রসঙ্গত একদিন কুণালের একটা মেল পেলাম। কুণাল মেলে বলল, অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল প্রিন্সিপলস বা জ্যোতির্বিজ্ঞানীয় তত্ত্ব নির্ধারণে যদি 'গণতন্ত্র'-কে প্রাধান্য দেওয়া হত তা হলে এই মত-ই চালু হত যে, সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। আমি তখন ওকে একটা লাইন বা উক্তি পাঠালাম। জন স্টুয়ার্ট মিলের 'the tyranny of collective mediocrity' (লিবার্টি)। কুণাল জানাল, এ-উক্তির তেজ আছে, কামড় আছে। এভাবেই আমি আর কুণাল ই-মেলে যোগাযোগ রাখি। এক ধরনের খেলা। এই ই-মেলের মাধ্যমে আমরা সিদ্ধান্তে এলাম যে, গণতন্ত্রেরও সীমাবদ্ধতা আছে।

সুতরাং এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যখনই আমাকে বিচারকের জায়গায় কাজ করতে হয় তা কান চলচ্চিত্র উৎসব হোক বা অন্য উৎসব, সেখানেই আমাকে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে কাজ করতে হয়। শেষ বিচারের সময় সুযোগ নিতে হয়। ভোটকে হাতিয়ার করতে হয়, ভোটের সংখ্যার ওপরই নির্ভর করে ছবির পক্ষে-বিপক্ষের রায়।

১৯৮২ সালের কান চলচ্চিত্র উৎসবের কথায় ফিরে আসি। ছবিগুলো প্রথমে ঝাড়াই বাছাই ছাড়াও প্রতিযোগিতায় বারবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব বিচার করা দীর্ঘ ও সময়সাপেক্ষ প্রচেষ্টা। যে আলোচনা শুরু হল সকালে ব্রেকফাস্টের পর সেন্ট্রাল হলে, তা চলল রাত্রি দুটো পর্যন্ত। কখনও আলোচনা চলাকালীন হঠাৎই বিরতি হতে পারে, যদি প্রয়োজন হয়। কিন্তু আলোচনার সময় কমানোর কোনও রাস্তা নেই।

যে ছবিটি বারবার আলোচিত হয়, যে ছবিটিতে পুরস্কার দেওয়ার জন্য নম্বর দেওয়া হয় সে ছবিটি মোটামুটি বাছাই করা ছবি, এই প্রক্রিয়াটি নেহাত ছোট নয়। চূড়ান্ত তালিকা থেকে কয়েকটা নাম করা যেতে পারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

আন্তনিয়োনি, হারজগ, গোদার, কোস্টা গাভরাস, ভিম ভেণ্ডারস, তাভিয়ানি ব্রাদার্স থেকে শুরু করে এত্তরে স্কোলা, অ্যালান পার্কার, জারজি স্কলিমভ্স্কি, ইলমাজ গুনে— এঁরা সবাই বিভিন্ন দেশের অসাধারণ ছবি-নির্মাতা। লিন্ডসে অ্যান্ডারসনও ছবি বানানোর দক্ষ কারিগর। তবে তিনি যে সবসময় অসাধারণ ছবি করবেন এমন কথা নেই। মুশকিলটা এখানেই, কোন ছবিটা ভাল, কোনটা বেশি ভাল এটা কে ঠিক করে দেবে? মাপকাঠিটাই বা কী? যাইহোক, আমরা সবাই আলোচনা বিতর্ক সেরে সিদ্ধান্তে এলাম যে, সমস্ত ছবিগুলো নিয়ে আমরা যথাসাধ্য বিচার করেছি। খবর নিয়ে জানলাম, বিচার বিবেচনার পর যে ছবিটি নির্বাচিত হয়েছে শ্রেষ্ঠ ছবি হিসেবে সে ছবি সম্পর্কে বেশিরভাগ দর্শকেরই একই অভিমত। দর্শকবৃন্দ মেনেও নিয়েছে ব্যাপারটা।

এ ঘটনা সমস্ত চলচ্চিত্র উৎসবেই ঘটে কম-বেশি। সে উৎসব যত বড় বা যত ছোটই হোক। সুতরাং কান উৎসবেও এটা কোনও ব্যতিক্রমী ব্যাপার নয়। সর্বত্রই এমন ঘটনা ঘটছে।

কেউ ভাবছে এটা খুব ভাল, কেউ ভাবছে এটা ততটা ভাল ছবি নয়। সেজন্য আমরা সবাই গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত মেনে নিই। শেষ পর্যন্ত সংখ্যার খেলা, যথেষ্ট অস্বস্তিকর হলেও সেটাই সত্যি! মার্কেজের অবশ্য অন্য সমস্যা ছিল। সে চেয়েছিল, বিচারকরা গোটা কিউবার ছবিকে আলাদা সম্মান জানাক, সেই সূত্রেই উমবের্তো সোলাসের *Cecilia*-র স্বতন্ত্র স্বীকৃতি জুটুক। অথচ নিজে ও-ছবিটাকে পছন্দ করেনি মার্কেজ, আমার পছন্দ হয়েছিল তাই এই কথাগুলো সে আমাকে বলে। শুনে আমার যে খুব ভাল লেগেছিল তা নয়। তবু যখন মার্কেজ আমাকে চেপে ধরলেন, আমার পক্ষে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হল না।

লাঞ্চের পরে আলোচনা শুরু হল, আমি কিউবার কথাটা তুললাম। বিচারকমণ্ডলী অস্বস্তি বোধ করল। চেয়ারম্যান একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি তাঁর সেক্রেটারিকে বললেন, আপনি উৎসবের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলুন। প্রেসিডেন্ট রোবেয়ার ফ্রেবে লে ব্রে ছুটে এলেন খুব তাড়াতাড়ি। বয়স্ক মানুষ। বিগত এক দশক ধরে কান চলচ্চিত্র উৎসবের কর্তাব্যক্তি। রোবেয়ার যখন কিউবার ছবিটি নিয়ে প্রস্তাব শুনলেন, অবাক হলেন না, আবার অস্বস্তিও বোধ করলেন না। শুধু বললেন, 'এ প্রস্তাবটা কে দিয়েছে?'

সঙ্গে সঙ্গে বললাম, 'আমি।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তিনিও সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'মৃণাল, তুমি একটা ছবিকে পুরস্কার দিতে এসেছ। কোনও দেশকে নয়।' কথাটা বলে উনি চলে গেলেন। আমরা আবার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। অস্বস্তি কাটল অন্য সবাইয়ের, আমারও।

পরের দিন বিকেলে দর্শকঠাসা থিয়েটার হলে দেখা গেল সবাই উপস্থিত একমাত্র মার্কেজ ছাড়া। কিন্তু ওর স্ত্রী আমাদের সঙ্গে ছিল যতক্ষণ এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান চলেছে।

বারোদিনের এই যুদ্ধের পর ক্যাকটাস গ্রুপ চলে গেল জুরিখে এবং আমি, গীতা ভারতে ফেরার আগে কিছুক্ষণের জন্য প্যারিসে নামলাম।

আমার ইউনিট এদিকে কলকাতায় অপেক্ষা করছে। 'খারিজ' ছবিটির প্রোডাকশনের কাজ চলছে পরিকল্পনা অনুযায়ী। এডিটিং ও ডাবিং শেষ হয়ে গেল এক মাসের মধ্যে। ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের ব্যাপারে বেঙ্গালুরু থেকে এলেন বি ভি করন্থ। তিনি নাটকের মানুষ, আবার ছবিও তৈরি করেছেন। তাঁর সঙ্গে কাজ করা রীতিমতো রোমাঞ্চকর। কয়েকদিনের মধ্যে কাজ হয়ে গেল। আমি ও আমার ছবির সম্পাদক চেন্নাই রওনা দিলাম ছবির বাকি কাজগুলোর জন্য। মুম্বই থেকে আমার ক্যামেরাম্যান কে কে মহাজনও এল। অগাস্টের প্রথম সপ্তাহে ল্যাবরেটরির কাজ শেষ। সেন্সর সার্টিফিকেট খুব সহজেই পেয়ে গেলাম।

ছবির সার্টিফিকেটের একটা কপি চলে গেল ক্যাকটাস গ্রুপের কাছে। ওঁরা ছবিটিকে দেখানোর ব্যবস্থা করলেন তিন জায়গায়। একটা নিজেদের জন্য, একটা বার্লিনে প্রিভিউ কমিটির জন্য, একটা কান চলচ্চিত্র উৎসবের ডিরেক্টর জিল জ্যাকবের কাছে। ওঁরা সবাই আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন। ওঁদের সবারই ছবিটি ভাল লেগেছে। আমি পড়লাম ফাঁপড়ে, কারণ আমার কাছে কান-বার্লিন দুই-ই সমান। আমি সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার ক্যাকটাস গ্রুপ-এর ওপর ছেড়ে দিলাম, ওরা 'খারিজ' কান-এ পাঠাল। বার্লিনের ডিরেক্টর অসন্তুষ্ট হলেন, ছবিটি কান উৎসবে ১৯৮৩ সালের জন্য অনেক আগেই ঠিক হয়ে গেল।

এই সময়ে আমার ইউনিটের কর্মীরা নতুন ছবির জন্য হাঁকপাঁক করছিল। আমার ছবির নতুন প্রযোজক অধৈর্য হয়ে যাচ্ছিলেন। বললেন, আমি আর অপেক্ষা করব না। অনেকদিন অপেক্ষা করেছি। ছবির বিষয় বেছে, ছোট হোক

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বড় হোক, ছবি তৈরি করতে বললেন। তাঁর টাকা একদম রাখা আছে ছবি করবার জন্য। প্রযোজক ভদ্রলোক মরিয়া রয়ে উঠলেন।

আমার এক জার্মান বন্ধু রাইনার্ড হফ যিনি পশ্চিম জার্মানিতে ছবি তৈরি শুরু করেন আমার ছবির জগতে আসার অনেক পরে। বোধহয় ওঁর প্রথম ছবি 'ব্রুটালাইজেশন অফ ফ্রান্জ ব্লুম', যে ছবির জন্য তিনি পৃথিবীতে পরিচিতি পেলেন। বেশ কিছু ছবি তাঁর পুরস্কৃত হয়। তিনি একটি প্রোডাকশন কোম্পানি খোলেন তাঁর কিছু বন্ধুদের নিয়ে। নাম দিলেন 'বায়োস্কোপ ফিল্ম'। ভলকার স্লেয়েনডর্ফ ছিলেন সেই বন্ধুবর্গের মধ্যে, যিনি গুন্টার গ্রাসের 'টিন ড্রাম' নিয়ে ছবি করেছিলেন। গুন্টারের এই অ্যাবসার্ড ফ্যান্টাসি এক তিন বছরের জার্মান বালককে নিয়ে, যে নাৎসি-শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ বড় হতে চায়নি নিজে।

রাইনার্ড ছিলেন জার্মান ফিল্ম ও টেলিভিশনের সভাপতি। আমি যখন আমার নতুন ছবি সম্পর্কে বললাম, তখন তিনি বললেন, বিশ্বাস করা যায় না। আরও বললেন যে, এটা একটা ভয়ংকর ঝুঁকি নেওয়ার কাজ। যেসব ছবির রীতিমতো বাজার আছে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে স্বাধীন ছবি করতে চাওয়া ভয়ংকর সাহসের ব্যাপার।

রাইনার্ডের ভাষায় আমি একজন ভাগ্যবান মানুষ, এই প্রযোজকের বাবার নাম বাবুলাল চৌখানি, যিনি অনেক ছবি প্রযোজনা করেছেন একসময়ে। এর মধ্যে খুব খ্যাতনামা ছবি হল 'আলিবাবা'। আমার মতে এ ছবিটি এদেশে সবচাইতে ভাল সংগীতমুখর ছবি। ছবিটির নায়িকা সাধনা বসু। পরিচালক এবং নায়ক ছিলেন তাঁর স্বামী মধু বসু। এ ছবিতে এ-দু'জনের অভিনয় অপূর্ব, অসাধারণ একজন মর্জিনা আর একজন আবদুল্লা। ১৯৫৬ সালে ইনি শেষ ছবি প্রযোজনা করেন। এবারে পঁচিশ বছর বাদে তাঁরই ছেলে আমার কাছে ছবির প্রস্তাব নিয়ে এলেন।

রাইনার্ড বললেন, 'তুমি ভাগ্যবান। পৃথিবীর কোথাও তুমি এমন প্রযোজক পাবে না।'

বছর দুয়েক বাদে রাইনার্ড আমাকে নিয়ে, আমার ছবি নিয়ে একটি দীর্ঘ তথ্যচিত্র তৈরি করলেন। সেটা ছিল ১৯৮৪ সাল। কলকাতা শহরে রাইনার্ড দশদিন থাকার সময় আমার প্রযোজক জগদীশ চৌখানির সঙ্গেও সাক্ষাৎ করলেন ওঁকেও এ-ছবির মধ্যে অভিনয় করালেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

জগদীশ চৌখানি নিজের বাবার ছবির নীচে চেয়ারে বসে বসে আমাদের সঙ্গে কত কথা বলে গেলেন। কত প্রশ্নের উত্তর দিলেন। সেই দৃশ্যগ্রহণের সময় জগদীশকে ঠিক জমিদারের মতো লাগছিল। ফ্লোরে মাদুর ছড়ানো। এদিকে ওদিকে বালিশ ছড়ানো। সেসবের মাঝখানে জগদীশ বসে আছে যেন এক জমিদার।

একটি প্রশ্নের উত্তরে জগদীশ বললেন, 'নতুন ধরনের ছবির প্রয়োজন আছে। একটি কাপড়ের কারখানায় যদি ডিজাইন একই ধরনের হতে থাকে তা হলে বাজার তৈরি হয় না, ব্যবসা হয় না। একইভাবে ছবির জগতেও পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে।'

এবারে নতুন ছবির আলোচনায় আসা যাক।

গল্প নিয়ে ভাবছি শুধু। কী গল্প, কী বিষয়! মাথায় ঢুকছে না কিছুই। একদিন মাঝরাতে কিছুতেই ঘুম আসছিল না। আমি বিছানা ছেড়ে অন্য ঘরে গিয়ে পায়চারি করতে লাগলাম। হঠাৎ-ই কাঠের ভারী বইয়ের আলমারি থেকে প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পের ও কবিতার মোটা বইটা পড়তে লাগলাম। এর মধ্যে একটি নিটোল গল্প দু'-চারবার পড়লাম। আগেও পড়েছি, একবার নয়, বেশ কয়েকবার। কিন্তু কোনওদিনই ভাবিনি এটি ছবি হতে পারে। এ গল্পটা নিয়ে ভাবা যেতে পারে। বিগত চল্লিশ বছরে ভাবিনি এরকম কাহিনি নিয়ে ছবি করতে পারি।

অথচ আশ্চর্য, সেই রাতে, গভীর রাতে, গল্পটা পড়তে পড়তে আবিষ্কার করলাম এর মধ্যে সিনেমার বীজ লুকিয়ে আছে। এই প্রথম তেলেনাপোতা আবিষ্কার করলাম, যা আমি আগে কোনওদিন করতে পারিনি। তেলেনাপোতা (১৯৪১)-র সঙ্গে অ্যালাঁ রেনে-র ছবি *Last year at Marienbad* (১৯৬১)-র আশ্চর্য মিল, অথচ স্থান-কাল-পাত্রে কোথাও মিল নেই। রব গ্রিয়ে-র কাহানি মারিয়েনবাদ-এর সঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্রের তেলেনাপোতার মিল আসলে বাস্তব-অতিরেক এক কল্পনায়।

প্রথমে বলি কীভাবে প্রেমেন্দ্র মিত্রের তেলেনাপোতার কাহিনির শুরু:

> শনি ও মঙ্গলের, মঙ্গলই হবে বোধহয়, যোগাযোগ হলে তেলেনাপোতা আপনারাও একদিন আবিষ্কার করতে পারেন। অর্থাৎ কাজে কর্মে মানুষের ভিড়ে হাঁপিয়ে ওঠার পর যদি হঠাৎ দু'দিনের জন্যে ছুটি পাওয়া যায়, আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও

> যদি কেউ এসে ফুসলানি দেয় যে, কোনও এক আশ্চর্য সরোবরে পৃথিবীর সবচেয়ে সরলতম মাছেরা এখনও তাদের জল-জীবনে প্রথম বঁড়শিতে হৃদয়বিদ্ধ করবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছে, আর জীবনে কখনও কয়েকটা পুঁটি ছাড়া অন্য কিছু জল থেকে টেনে তোলার সৌভাগ্য যদি আপনার না হয়ে থাকে, তা হলে হঠাৎ একদিন তেলেনাপোতা আপনিও আবিষ্কার করতে পারেন।... (তেলেনাপোতা আবিষ্কার)

যখন আমি সিদ্ধান্ত নিলাম 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' ছবি করব তখন সে ছবির নায়ক কিন্তু মাছ ধরতে গেল না। সে হয়ে গেল পেশাদারি ফটোগ্রাফার। ছবিতে দেখা গেল যে ফটোগ্রাফার তার ডার্করুমে কাজ করছে। তারপর দেখা গেল একটি মেয়ে ধ্বংসস্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সেখানেই ছবির নায়ক সুভাষের কণ্ঠস্বর।

ডার্করুমের নীরবতা, অদ্ভুত নীরবতা। তারপর নায়ক সুভাষের কথা।

> এই শহরে কত সমস্যা, কত ভিড়, কত বাধা, কত ঝামেলা। কত শব্দের বিশ্রী খেলা। যদি ক'দিন ছুটি হয়, এ শহর থেকে ছুটে অন্য এক জায়গায় যাওয়া যায়, যেখানে মুক্ত ঝোড়ো বাতাস বইছে, যেখানে কোনও বন্ধু আপনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে প্রলুব্ধ করে, যেখানে কালের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে, সেটি কোনও ফটোগ্রাফারের স্বর্গস্থান।
>
> সেই স্বর্গ দীপু, সুভাষ আর অনিলকে এ জায়গায় এনেছে। এখানে একসময়ে বিশাল প্রাসাদ, জমিদার এবং তাঁদের সাম্রাজ্য শক্তি বিরাজ করত। দীপুর পূর্বপুরুষের জায়গা। এখানে তাঁরা থাকতেন, রাজ্যপাট চালাতেন। এখানে এখন মশার উপদ্রব, মশারির রাজত্ব চলছে। একশো বছর আগের ঘটনা।
>
> দীপুর এই বাড়িতে কিছু অংশ উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। এই নিরালা নির্জনস্থানে এক গরিব চাষি, বুড়ো মানুষ, দীপুর বাবার আমলের মানুষ, তিনিই এসব দেখাশোনা করেন। এখানে দীপুর কাকিমা আছেন তাঁর মেয়েটিকে নিয়ে।
>
> এই নির্জন স্থানে ধ্বংসস্তূপের মাঝে সেই মা ও মেয়ে বাস করে। মা পঙ্গু, অন্ধ মহিলা। আশায় আশায় আছেন যে একদিন তাঁর দূর সম্পর্কের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বোনপো এখানে আসবে এবং তাঁর মেয়েটিকে বিয়ে করবে। সেরকমই কথা আছে। কিন্তু বোনপোটি অন্যত্র বিয়ে করেছে, কথা রাখেনি। এ ব্যাপারটা সেই 'মেয়েটি' যামিনী জানে। কিন্তু যামিনী সে দুঃখের কথা তার মাকে কোনওদিন জানায়নি। নিজের কাছে গোপন করে রেখেছে।

ছিটনো ছড়ানো এক বিশাল ধ্বংসস্তূপ। তারই মধ্যে যামিনী, একা। যামিনী ও যামিনীর বৃদ্ধা মা জানে দীপুরা এসে গেছে, মিলে মিশে রান্নার জোগাড়যন্ত্র করছে। যামিনী দীপুর সঙ্গে যোগাযোগ করে। কিছু কথা বলতে চায়। একান্তে।

কথা শুনে দীপুর মন ভারাক্রান্ত হয়। বুঝে উঠতে পারে না শেষ পর্যন্ত কী হবে মা-মেয়ের।

দীপু বলে, 'তোমার দিদি জামাইবাবু কি ওখানেই থাকেন? মজফফরপুরে?'

'হ্যাঁ। ওরা প্রতি মাসে দেড়শো করে টাকা পাঠায়। আমাদের কথা ভাবে, আমাকে মাঝে মাঝে শাড়িটারি পাঠায়।'

'ওরা বলে না তোমাকে ওদের সঙ্গে থাকতে? দু'জনকেই?'

'প্রায়ই বলে। কিন্তু...।'

'তা হলে যাচ্ছ না কেন?'

'মা চায় না। সবই তো গেল, তবু মায়ের অহংকার গেল না। মা তার মেয়ের বাড়িতে আমাকে নিয়ে থাকবে না।'

'তা হলে তোমার মা এখানেই এভাবে থাকবেন?'

দীপু একটু রেগেই বলল, 'আমি কি সব কথা খুলে বলব তোমার মাকে?'

যামিনী ধীর শক্তভাবে বলল, 'না!'

'না। যামিনীর মা মরে যাবে। এ শোক সহ্য করতে পারবে না।' বলে দীপু। দীপু, সুভাষ, অনিল কেউই এ ব্যাপারে মাথা ঘামাতে আসেনি। ঘুঁটে-কুড়নীর মেয়েকে উদ্ধার করতে আসেনি। মা-মেয়েকে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে রেখে চলে যায়। ধ্বংসস্তূপ! ফটোগ্রাফার'স প্যারাডাইস!

সুভাষ হঠাৎ-ই বলে উঠল, 'সময়! সবই সময়! সময়ের খেলা!'

তিনজনেই ফিরে আসে, সুভাষ ফিরে যায় ডার্করুমে ছবি ওয়াশ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করতে, যামিনীর একটা বড় ছবি দেওয়ালে সেঁটে দিতে। সুভাষের শেষ তোলা ছবি— ধ্বংসস্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে যামিনী।

একদিন হঠাৎ সকালবেলায় চা খেতে খেতে গীতা বলল, 'পরে কী হবে?'

আমি ঘাবড়ে গেলাম। এ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। আমি বললাম, 'তুমি বলো।'

গীতা যেহেতু মায়ের অভিনয় করেছে তাই সে বলল, মা আর মেয়ে ক'দিন একে অপরের সঙ্গে কথা বলবে না। তারপর একদিন যামিনী মায়ের নামে চিঠি লিখবে দিদি-জামাইবাবুকে। কী লিখবে? লিখবে, তাঁরা এই জায়গা ছেড়ে চলে যাবে, চলে যাবে দিদি-জামাইবাবুর কাছে। তোমার কী মনে হয়?

আমি অবাক হয়ে গেলাম। সেই মায়ের বংশের গর্ব, সেই গর্বকে বুকে রেখে চলা— সব শেষ হয়ে গেল। যখন মানুষ বাস্তবকে সামনাসামনি দেখে, তখন ফ্যান্টাসি আর থাকে না। প্রথম ধাক্কা চলে গেলে বাস্তবকে বুঝতে পারা যায়।

গীতা বলল, ক'দিন ধরে 'একদিন প্রতিদিন'-এর সেই মায়ের কথাও ভাবছিলাম। সেটাও এরকমই। ভোরবেলা উনুন ধরাতে ধরাতে আর এক নতুন চেহারার মা, অথচ আগের দিন রাতে তিনি তা ছিলেন না।

শুনতে শুনতে গীতার জন্য আমি গর্ববোধ করছিলাম।

নতুন বছর চলে এল। ১৯৮৩...

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পঞ্চদশ অধ্যায়

'মিটিং দ্য ওয়ার্ল্ড!' এই প্রবাদটা পুরনো একটি কথা মনে করিয়ে দেয়, যখন আমার ছেলে কুণাল পাঁচ বছরের শিশু।

দিনটা ছিল মেঘাচ্ছন্ন। দক্ষিণ কলকাতার একটি জায়গায় বসে আছি, যে জায়গাটায় লোকজন বেড়াতে বা বসতে ভালবাসে। হঠাৎ কালবৈশাখীর দাপট শুরু হল। দাপটের উল্লাস যতক্ষণ চলল ততক্ষণ ভয়ংকর তারপর সবকিছু শান্ত, নিরিবিলি। এই ঝড়ের সময় বিদ্যুতের তীব্র ঝলকানিতে কুণাল আকাশের দিকে থমকে তাকাল। আমি কী ভয় পেলাম। কুণাল চেঁচিয়ে বলল, 'সেভেনটি মিলিমিটার স্ক্রিন!'

আমার ঠাকুরদা কুণালের এই বয়সে এই আলোর ঝলকানিকে সেই পুরাণের গরুড় পাখির সঙ্গে তুলনা করত— যে গরুড় পাখির বিশাল ডানা ছিল। আবার মুসলমান ঠাকুরদা হলে এটাকে জিব্রায়েলের সঙ্গে তুলনা করত, বলত আল্লার দূত।

বিজ্ঞান, কারিগরি প্রযুক্তি যেহেতু এখন আমাদের সমাজ-সংস্কৃতির ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে, কুণাল স্বভাবতই সেই আধুনিকতাতে অভ্যস্ত, কথার মধ্যে সেটাই স্পষ্ট। তা ছাড়া কুণাল সত্তর মিলিমিটারের পর্দায় একটি সিনেমা দেখেছিল সপ্তাহখানেক আগে। সে কারণেই তার নতুন অভিজ্ঞতাকে সে এভাবে ব্যক্ত করেছে। আমি আর কুণাল ভীষণভাবে ভারতীয়। বুঝতে পারলাম বিজ্ঞানের দাপটে পৃথিবীটা কত কাছে এসে গিয়েছে। ঘরের দরজার সামনে সবকিছু। এখানে ধর্ম, কৃষ্টি, ভাষা কোনও বাধা নয়। হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে এই তাৎক্ষণিক উপলব্ধিটা আমাদের হল।

একটু যদি পিছিয়ে যাই, তা হলে সেই সময়টার কথা বলতে হয়। ১৯৮৩, বামফ্রন্ট সরকার দ্বিতীয়বার ক্ষমতায়, ইতিমধ্যে পাঁচটি বছর অর্থাৎ ১৯৭৭ থেকে ১৯৮২ সাল বামফ্রন্ট সরকার কিছুটা সফলতার সঙ্গে কাজ করেছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও

যদিও যথেষ্ট সফলতা আসেনি। আমি নীরবে আমার কাজ করে যাচ্ছি। 'খণ্ডহর' ছবির শুটিংয়ের পর বাকি কাজগুলো শেষ করছি।

হঠাৎ ইতালির রোম থেকে আমন্ত্রণ এল বিচারকের স্থান নেওয়ার জন্য ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে। দিন দশেকের জন্য। সময়টা আগস্ট-সেপ্টেম্বর, আমি জানতে চাইলাম অন্য বিচারক কারা। ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবের ডিরেক্টর, যিনি আবার বহুদিনের পুরনো সাংবাদিক, জানালেন যে মোট সাতজনের মধ্যে অ্যানিয়েস ভার্দা (ফরাসি) এবং নাগিসা ওসিমা (জাপান), ওসমান সেমবেন (সেনেগাল) এবং বার্নার্ডো বার্তোলুচি (ইতালি), এঁরা রাজি হয়েছেন বিচারকমণ্ডলীর সদস্য হওয়ার জন্য।

আমি এরকমই ভালবাসি। সবাই একটা গ্রুপে, একই হোটেলের অতিথি। আমি রাজি হলাম।

ইতিমধ্যে ক্যাকটাস গ্রুপ জানাল যে ভেনিস থেকে ফেরার পথে টরোন্টো যেতে হবে সামান্য কয়েকদিনের জন্য, সেখানে 'খারিজ' ছবিটা দেখানো হবে। আমি একটু অনিশ্চিত ছিলাম, যার জন্য ব্যাপারটাকে মন থেকে দূরে সরিয়ে রাখলাম। শুটিংয়ের পরবর্তী প্রোডাকশনের বাকি কাজগুলো তাড়াতাড়ি করা হল। যতটা ভালভাবে করা যায় সেই চেষ্টা হল।

আমি ও আমার ছবির সম্পাদক মৃন্ময় চক্রবর্তী একনাগাড়ে কাজ করতে লাগলাম। একবার মুম্বই, একবার চেন্নাই দৌড়ে আবার কলকাতায় ফিরে এলাম। এই ফাঁকে একদিনের জন্য ফরাসি সংস্কৃতি মন্ত্রীর সঙ্গে লাঞ্চ খেতে দিল্লি যেতে হল। সেখানে ভারত ও ফ্রান্সের প্রযোজনায় ছবির ভাবনা, যৌথ প্রচেষ্টার কথাবার্তা হল। সেই ফরাসি মন্ত্রীর নাম Jack Lang। কেন 'Jack', কেন 'Jacques' নয়, জানতে চাইলাম। শুনলাম নামটা ওঁর বাবা রেখেছিলেন মিত্রশক্তি বা ব্রিটিশদের সম্মানার্থে।

এই ভদ্রলোকটির প্রকল্প হাতে নেওয়া হল প্রায় বছর দুয়েক বাদে। আরও দুটো দেশ এই প্রকল্পে যোগদান করল। একটি বেলজিয়াম অপরটি সুইজারল্যান্ড। এটা খুব একটা বড় বাজেটের ছবির প্রকল্প ছিল না।

যাইহোক কলকাতায় ফিরে 'খণ্ডহর' ছবির টুকিটাকি কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। এদিকে কান উৎসবে 'খারিজ' ছবিটি দেখানো হবে এবং কান উৎসব একেবারে ঘাড়ের কাছে। তাই আমি 'খণ্ডহর'-এর বাকি কাজ অর্ধসমাপ্ত রেখে ইউরোপ রওনা দিলাম অন্তত এক সপ্তাহের জন্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

ওদিকে অঞ্জন দত্ত ও মমতাশংকর 'খারিজ' ছবিতে স্বামী-স্ত্রীর অভিনয় করেছে। ওদের দু'জনের মধ্যে অঞ্জন তার নাটক নিয়ে পশ্চিম বার্লিনে ছিল আর মমতাশংকর তার নাচের গ্রুপ নিয়ে ইংল্যান্ডে। ওরা দু'জনেই ঠিক করল যে অন্তত একদিনের জন্য ওরা আমার সঙ্গে দেখা করবে এবং উৎসবে উপস্থিত থাকবে। ইতিমধ্যে উৎসবের কর্তা জিল জ্যাকব গীতাকেও আমন্ত্রণ জানাল যে, গীতাও আমার সঙ্গে থাকবে। এতে আমাদের মনমেজাজ চাঙ্গা হবে। জ্যাকব আবার বলল, 'গীতা কি তোমার ছবির অভিনেত্রী নয়? শুধু তাই নয়, সে তোমার স্ত্রীও।'

কিন্তু আমি নিজেকে জিজ্ঞাসা করলাম, জ্যাকব কি জানে না যে গীতা এই ছবিতে মাত্র মিনিট দুয়েকের জন্য অভিনয় করেছে। দু'মিনিট বললেও ভুল হবে, দু'মিনিটের কম সময় অভিনয় করেছে।

আমার মনে আছে 'খারিজ'-এর প্রেস মিটিংয়ে আমি কতটা উৎফুল্ল ছিলাম যে শুধু প্রেসের জন্য 'খারিজ' ছবিটির বিশেষ প্রদর্শনী হয়। ছবির সেই প্রেস মিটিংয়ে বেশিরভাগটাই আলোচনা, অনুভবের পারস্পরিক আদানপ্রদান। প্রশ্নটশ্ন কমই ছিল। আমার কাছে এটি একটি বিশেষ ঘটনা। সাংবাদিকরা অনেক কথা বললেন, আশ্চর্যের বিষয় সাংবাদিকরা কেউ কোনও আক্রমণ বা আঘাত করলেন না।

একটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। একজন অভিজ্ঞ বয়স্ক সাংবাদিক বললেন, 'সেই গরিব মানুষের মুখগুলো দেখে আমি অনেক কিছু বুঝতে পারছিলাম। সেই গরিব বাবার মুখটা, সেই বারো বছরের ছেলেটির বাবার মুখটা, করুণ মুখের ভাষা অনেক কিছু বলছিল। এক দুঃস্থ বাবা তার বারো বছরের ছেলেটিকে নিয়ে শহরে এল। বাধ্য হয়েই অর্থ রোজগারের জন্য এই শহরের এই সভ্য সমাজের স্বামী স্ত্রীর কাছে রেখে গেল। ওঁদের বাড়িতে ছেলেটি গৃহভৃত্যের কাজ করতে লাগল। ওই বাপটির মুখ দেখে সেই দেশের গ্রামীণ অর্থনীতির ভয়ংকর চেহারাটা ধরা পড়ে গেল।' সাংবাদিকটি 'খারিজ'-এর পশ্চাৎপটটিও ধরে ফেলেছেন দেখে রীতিমতো বিস্মিত হলাম। ওটি কাহিনির মধ্যেই নিহিত ছিল, অথচ ছবির ফ্রেমে ধরা নেই। শুনতে শুনতে আমার সামনে একটি ছবি ভেসে উঠল। একটি সাপের মতো মানুষের লাইন দাঁড়িয়ে আছে। একটা বিশাল ভিড়, টাকা ভাঙানোর দোকানের সামনে। সেই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

লাইনের মাথায় আন্তনিয়ো— যে মূল চরিত্র, সে তখন অন্য একটা দোকানে টাকা ভাঙাচ্ছে।

ওদিকে ক্যামেরা মানুষের ভিড়কে ধরে আছে। এমন সময় এক মাঝবয়সি ভদ্রলোক, লম্বাটে মুখ, একগাল দাড়ি নিয়ে বিধ্বস্ত লাগছিল, যিনি তাঁর বাইনোকুলারটা দিয়ে টাকা ভাঙানির দোকানে টাকা নিতে চাইছিলেন। ভদ্রলোক দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে। ডি সিকার *Bicycle Thieves* (১৯৪৮)-এর কথা মনে পড়ে গেল। বোঝা যায় যুদ্ধের পর ইতালিতে কী চরম অর্থনৈতিক চাপে বিধ্বস্ত হয়ে বাইনোকুলারটা বিক্রি করতে এসেছে। সেই মধ্যবয়স্ক লোকটাকে আর কখনও খুঁজে পাওয়া গেল না ছবিতে। সিনেমার ইতিহাসে, বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এসব হচ্ছে 'মাস্টার টাচ্' অন্যতম এক গ্রেট মাস্টার-এর।

১৯৪২ সালে আইজেনস্টাইন তাঁর অসাধারণ লেখা 'ডিকেন্স, গ্রিফিথ অ্যান্ড ফিল্ম টুডে'-তে এই ব্যাপারটিকে অসাধারণভাবে বুঝিয়েছেন। এক জায়গায় আইজেনস্টাইন বলেছেন, 'যখন আমি টাইপেজ ব্যবহার করি, তখন আমি মুখ খুঁজে বেড়াই। আমি যখনই মুখ খুঁজে পেয়েছি, তা ধরে রাখার জন্য ছবি করেছি।'

ডি সিকা একটা সময়কে তাঁর ছবিতে ধরবার জন্য একটি মুখ খুঁজছিলেন। সে মুখটাকে খুঁজে নিয়ে তিনি তাঁর ছবিতে ধরে রাখেন। একটা টাইপেজ তাঁর *Bicycle Thieves* ছবিটাকে জ্যান্ত করে তুলল, সামাজিক প্রাসঙ্গিকতায় নিয়ে গেল।

'এ ছবিটা কী আপনার দেশের শিশু শ্রমিকের কুৎসিত কাহিনি নয়?' একজন সাংবাদিক জিজ্ঞেস করলেন আমাকে।

আমি বললাম, 'এটা ঠিক কথা যে শিশু শ্রমিকের ভয়ংকর অবস্থান আমাদের দেশে। আমি হয়তো তা নিয়ে ছবিও করব। কিন্তু এ-ছবিতে আমার মূল আক্রমণ মধ্যবিত্ত সমাজকে, যে-সমাজের আমিও একজন।'

তারপর অন্য প্রশ্নের উত্তরে বললাম, 'ছবিটি তৈরি করেছি শিশু শ্রমিকদের জন্যও নয়, বা হঠাৎ দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুর ব্যাপারটার জন্যও নয়, ছবিটি তৈরি করেছি নির্দয়ভাবে আমার এ সমাজকে পোস্টমর্টেম করবার জন্য। শুধু এই সমাজ নয়, এ সমাজের একটা শ্রেণিকে আঘাত করেছি। আমিও সেই শ্রেণির,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সেই সমাজের একজন। আমি আমার নিজের গালে চড় মেরেছি, আমার সমাজের গালে চড় মেরেছি। কিন্তু তাতেও বাইরে বা ওপর থেকে দেখলে মনে হয়, সমাজের গায়ে যেন আঁচড়টি লাগেনি।’

‘অভিনয় করেছেন যাঁরা তাঁরা খুব সপ্রতিভ। যেন মনে হয় কোনও অভিনয় নয়। খুবই স্বাভাবিক।’ কে একজন বলল। ঠিক এক বছর বাদে যখন ‘খারিজ’-এর আমেরিকার নিউইয়র্কে প্রিমিয়ার হল, তখন স্ট্যানলি কাউফম্যান ‘নিউ রিপাবলিক’ পত্রিকায় লিখলেন এবং বিশ্লেষণ করে দেখালেন, কী করে অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা তাঁদের প্রতিভাকে উজাড় করে দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য নীচে তুলে দিলাম:

> ...The principal actors... heighten our own feeling of espionage into interiors with the confidentiality of their performances. It's a kind of acting that precludes display and is thus easily underrated as mere *behaving*, which it is not. Theirs is a close parallel between the acting here and the look of the film itself. The actor needs skill—enough skill to ignore skill, to concentrate on congruence with the character, on permitting us to peep and eavesdrop rather than to project at us... (Kauffmann)

কাউফম্যান আরও বলেন। বলেন, এ ধরনের ছবি করতে গেলে অনেক অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, শুধু ছবি তৈরি করতে জানলেই হয় না।

১৪ মে, ১৯৮২। ক্যাকটাস সন্ধেবেলায় মূল সিনেমা হলে, কান চলচ্চিত্র উৎসব যেখানে আগে অনুষ্ঠিত হত, সেখানে আমাকে না জানিয়ে আমার জন্মদিনে পার্টি দিল। আমাকে আর গীতাকে এলিয়ান প্রায় বগলদাবা করে নিয়ে গেল। সে দিনটাতে বিশাল আয়োজন হয়েছিল। কেক কাটা থেকে শুরু এবং অনেক কিছু। অবিশ্বাস্য ব্যাপার। অনেকে নিমন্ত্রিত, অনেকে নিমন্ত্রিত নয় এমন মানুষরাও ছিলেন। আমি ভেবেছিলাম আমার ছবির অভিনেতা অভিনেত্রীরা হয়তো আসবে। ইংল্যান্ড থেকে মমতাশংকর এবং বার্লিন থেকে অঞ্জন দত্ত, কেউই আসতে পারল না। একটা দিনের জন্যও না। মাঝরাতে হোটেলে ফিরে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমি আর গীতা ক্লান্ত। গীতা বলল, তোমাকে এমন নার্ভাস কোনওদিন দেখিনি। কেক কাটতে এত ভয়!

উৎসবের শেষ দিনে একটি উজ্জ্বল সন্ধেবেলা। যখন আমরা কয়েকজন মঞ্চের পিছনে উপবিষ্ট। একজন—স্প্যানিশ চিত্রপরিচালক কার্লো সওরা যিনি তাঁর অপেরাধর্মী ছবিগুলোর জন্য বিখ্যাত, যাঁর সঙ্গে বেশ কয়েকবার আমার দেখা হয়েছে, বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে কতরকম আলোচনাও হয়েছে। এ ছাড়াও ছিলেন সোহেই ইমামুরা, যাঁর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হল, বড় পুরস্কার জিতে নিলেন তাঁর *Ballad of Narayama* ছবিটির জন্যে। পুরনো জাপানি ছবির রিমেক হলে কী হবে, কর্কশ বাস্তবতা ছবিতে। গ্রাম থেকে বহু দূরে একটা পাহাড়ের চুড়োয় এক পরিত্যক্ত মৃতপ্রায় মহিলার কাহিনি। নিষ্ঠুর ছবি। টিপিকাল জাপানি ছবি।

আন্দ্রেই তারকোভস্কি সেখানে উপস্থিত ছিলেন নিজের ছবি *Nostalgia*-র জন্য, প্রথমে ছবিটির নাম ছিল *The Italian Journey*। নিজেকে গুটিয়ে রাখা মানুষ ইনি, মঞ্চের পেছনে প্রথম সাক্ষাৎ হল আমার। তাঁর প্রথম ছবি *The Childhood of Ivan* ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে বড় পুরস্কার এনে দেয় ১৯৬২ সালে। কিন্তু প্রাথমিক অবস্থাতে সোভিয়েত রাশিয়ার চলচ্চিত্র জগতের উঁচু স্তরের আমলাদের কুনজরে পড়লেন তিনি। অবশেষে দেশ ছাড়লেন এবং দেশে আর ফিরলেন না।

যাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্যে আমি মরিয়া হয়ে গিয়েছিলাম, সেই বিখ্যাত ফরাসি চলচ্চিত্রকার রোবেয়ার ব্রেসঁ-র সঙ্গে দেখা হল মঞ্চের পিছনে। এ মানুষটার প্রতি আমার অগাধ ভালবাসা ও শ্রদ্ধা ছিল। উনি একটি কোণে বসেছিলেন আমাদের অপেক্ষায়। একটু নিজেকে স্বতন্ত্র রেখে। উনি আমাকে কাছে ডাকলেন। আমি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ওঁর পাশে বসলাম।

'তুমি কি আমার ছবি দেখেছ!' ঠান্ডা নির্লিপ্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন।

'অবশ্যই।' আমি উৎসাহ নিয়ে বললাম।

'কোন শো? সন্ধেবেলার শো?'

'হ্যাঁ। যখন আপনি বক্তব্য রাখলেন।'

'তুমি বেড়াল কুকুরের ডাক শুনেছ?'

আমি 'না' বলতে পারলাম না। আবার হ্যাঁ বলতে পারলাম না। কী করে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বলব। আমি কী করে বিকট হইহই চিৎকার না শুনে থাকতে পারি। শুধু বেড়ালের ডাক নয়, নির্দয়ভাবে নানারকম কটু কথা। আমি ওঁর দিকে তাকাতে পারলাম না।

এবারে ব্রেসঁ-র সময় এল। ওঁকে মঞ্চে ডাকা হল। যেমন আমাদের সবাইকেই এক এক করে ডাকা হল। উইংসের একধারে দাঁড়িয়ে আবার কানে এল হাততালি, প্রশংসা এবং বেড়ালের ডাক হইহই রইরই শব্দ। সেই মানুষটি মঞ্চে এলেন এবং পুরস্কার নিয়ে চলে গেলেন। পুরস্কার পাওয়ার পর মঞ্চে দাঁড়িয়ে দর্শকদের উদ্দেশে একটি শব্দও ব্যবহার করলেন না। সাধারণত পুরস্কার দেওয়ার পর পুরস্কার প্রাপককে দর্শকদের উদ্দেশে কিছু বলতে হয়।

যখন সমস্ত পুরস্কার প্রাপকরা একটি লাইনে দাঁড়াল সেখানে ব্রেসঁকে দেখা গেল না। তিনি অনুপস্থিত। বোধ হয় *'L' Argent'* (Money) তাঁর শেষ ছবি। অথবা আর একটা ছবি কি তিনি করেছেন? সেটা অবশ্য আমার জানা নেই।

সেইসব মনে রেখেই একটি প্রাত্যহিক সংবাদপত্রে আমি ব্রেসঁ-র ছবিটির প্রশংসা করলাম। পত্রিকাটি হল 'স্টেটসম্যান' পত্রিকা।

> ...Being a habitual viewer and a regular filmmaker, I now see that a passionate cineaste does not have to speak necessarily, like his counterpart in literature, only of his anxiety to change the society, of his protest, of his challenge to the world difficult to accept; but also of the confusion, of the anguished search, of the inherent contradictions, which are beyond easy resolutions. Brilliant patches of such anguished searches and of human situations in total disarray, and finally, of love, of its purity and innocence are seen to manifest themselves in Robert Bresson's films, one after another. (*The Statesman*)

দেশে ফিরে এসে খণ্ডহরের বাকি কাজ শুরু করে দিলাম। আগস্ট মাসে সেন্সরের ছাড়পত্র পেলাম। খারিজের ঠিক এক বছর পরে। ঠিক সেই সময় কুণাল আমেরিকার ইলিনয় ইউনিভার্সিটি থেকে পি এইচ ডি করবার ছাড়পত্র পেল। সাবজেক্ট— ইলেকট্রনিক্স ও কম্পিউটার সায়েন্স।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ইতিমধ্যে সেখানে যাওয়ার আগে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউটে সে এসব নিয়ে কাজ করছিল। আর কুণালের স্ত্রী নিশা নিউট্রিশন সায়েন্সের ওপর পোস্ট গ্র্যাজুয়েট করে রিসার্চ করছিল রিপ্রোডাকটিভ বায়োলজির ওপর। তখন নিশা থিসিস জমা দিয়েছে। নিশা এসব নিয়েই ব্যস্ত ছিল।

ইতিমধ্যে আমি ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবের বিচারক হওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছি, তৈরি হচ্ছি ভেনিসে যাওয়ার জন্য। শেষ মুহূর্তে গীতা আমার সঙ্গে যেতে পারল না কারণ কুণাল তখন শিকাগো যাবে। সেটা সেপ্টেম্বর মাস। গীতার সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল। আমার মাথায় একটা প্ল্যান এল। গীতাকে বললাম, তুমি কাঁদতে কাঁদতে দমদম এয়ারপোর্টে কুণালকে ছেড়ে আসবে, না হাসতে হাসতে দূর বিদেশে ছেলের সঙ্গে দেখা করবে! কারণ টরন্টো শিকাগো থেকে কাছেই। কুণাল মাকে দেখে খুব খুশি হবে। গীতা আনন্দে আত্মহারা হয়ে ভাবল যে শিকাগো তার নিজের পয়সায় যেতে হবে না এবং শিকাগোতে ক'টা দিন কাটাতে পারবে। এজন্য আমি আমার ভ্রমণসূচিতে টরন্টোকে রাখলাম এবং এলিয়ানকে জানালাম সেই মতো। এলিয়ানকে ফোনে ধরতে চেষ্টা করলাম কিন্তু সে জুরিখে ছিল না। ঘণ্টাখানেক আগে সে মাদ্রিদ রওনা দিয়েছে। তাকে ভালাডোলিড-এ পৌঁছুতে হবে ঠিক সময়মতো। খারিজের পুরস্কার নেওয়ার জন্য: 'গোল্ড স্পাইক'। সে সন্ধেবেলা ফিরবে অথবা পরের দিন ফিরবে।

এটা ভেনিসে আমার চতুর্থবার ভ্রমণ এবং গীতার দ্বিতীয়বার। ভেনিসে থাকাকালীন ছবি দেখা, ছবি নিয়ে আলোচনা, যুক্তি, তর্ক বার্তোলুচির সঙ্গে। সেখানে বার্তোলুচি সমস্ত বিচারকদের প্রধান বা চেয়ারম্যান। আমি মুনিখ থেকে একটি জরুরি ডাক পেলাম। ডেকে পাঠিয়েছে রাইনার্ড হফ যাকে জার্মান টেলিভিশন দায়িত্ব দিয়েছে আমার ওপর একটি দীর্ঘ ছবি করবার জন্য। আমি একা কেন! কেন, সেখানে আমার শহর কলকাতা নেই? বললাম আমি।

রাইনার্ড জানাল সাক্ষাতে বিস্তারিত কথা হবে।

আমরা পরিকল্পনা করলাম ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসব শেষ হলেই দেখা করব একে অপরের সঙ্গে। আমরা ঠিক করে নিলাম একটার পর একটা আলোচনার বিষয়বস্তু। কয়েকদিনের মধ্যে সব ঠিক হয়ে গেল। সে আলোচনা চলল ঘণ্টার পর ঘণ্টা বার্গামোতে।

বার্গামোতে এক ভারতীয় সিনেমাপ্রেমী বন্ধু ডেভিড ফেরারিয়ো, সংগঠিত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ইন্দিরা গাঁধী-র হাত থেকে নিচ্ছি রাষ্ট্রপতি-র স্বর্ণকমল

তেহরান ফেস্টিভ্যালে জুরি-তে ছিলাম, তৎকালীন রানি ফারা-র সঙ্গে সৌজন্য বিনিময়, মাঝখানে ফ্র্যাঙ্ক কাপরা (বাঁদিক থেকে তৃতীয়)

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বোলপুরে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সিনেমার শতবর্ষ উপলক্ষে প্যারিসে ইউনেস্কো-র এক অনুষ্ঠানে মেলিনা মারকুরি, ইউসেফ শাহিন, আন্দ্রে ডেলভো, গাস্তন কাবোরে, মিশেল পিকোলি, ফারনান্দো সোলানাস, মিশেল অবেয়ার, জঁ রুশ-এর সঙ্গে

দিল্লি উৎসব-এর জুরি বোর্ডে। একেবারে বাঁদিকে বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার ওসমান সেমবেন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নিউ ইয়র্ক থেকে আগত গায়ক পিট সিগার আর পবিত্র সরকার-এর সঙ্গে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে

বিলায়েৎ খান-এর সঙ্গে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কান উৎসবে গোদার-এর সঙ্গে

জার্মান চলচ্চিত্রকার রাইনার্ড হউফ কলকাতায় এসেছিলেন 'টেন ডেজ ইন ক্যালকাটা: আ পোর্ট্রেট অব মৃণাল সেন' ছবিটি তুলতে, তাঁর সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এক অনুষ্ঠানে তপন সিংহ-এর সঙ্গে, পিছনে সন্দীপ রায়

পবিত্র সরকার, সুচিত্রা মিত্র-র সঙ্গে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

২০০০। রুশ রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন-এর পক্ষ থেকে পেলাম 'অর্ডার অব সিটিজেন' পুরস্কার

টাউন হল। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছেন অমর্ত্য সেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

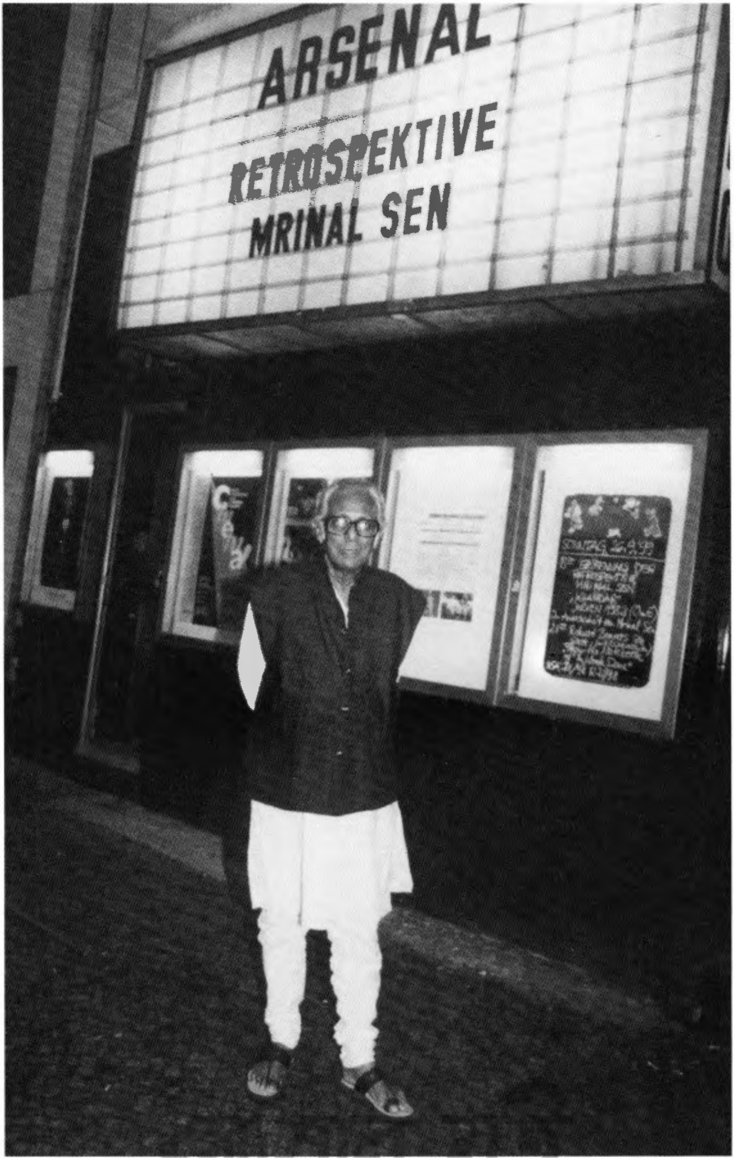

বার্লিন ফোরাম-এর থিয়েটার আরসেলান-এ আমার ছবির রেট্রোসপেকটিভ চলছিল, তার সামনে দাঁড়িয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চ্যাপলিন-এর নাতনির সঙ্গে, কলকাতায় আমার বাড়িতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

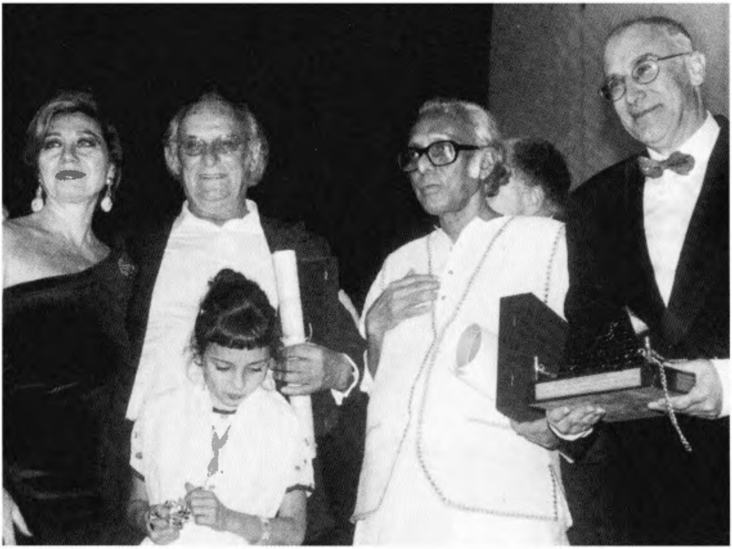

কায়রো উৎসবে পুরস্কৃত হওয়ার পর, বাঁদিকে স্পেন-এর বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার কার্লো সওরা (সস্ত্রীক), ডানদিকে হাঙ্গেরি-র পিটার গারর্ডোজ

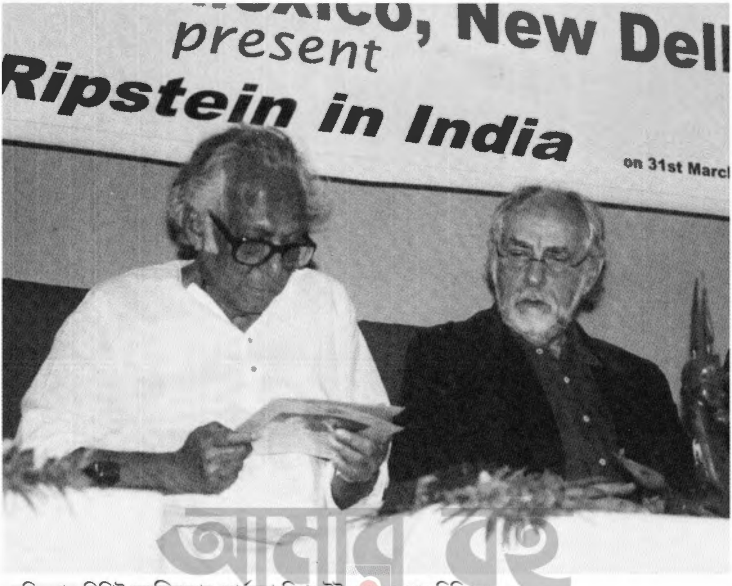

মেক্সিকোর বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার আর্তুরো রিপস্টেইন-এর সঙ্গে। দিল্লিতে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আবদুল কালাম-এর হাত থেকে নিচ্ছি 'দাদাসাহেব ফালকে' পুরস্কার। বাঁদিকে তৎকালীন তথ্য-সম্প্রচার মন্ত্রী জয়পাল রেড্ডি

এশিয়াটিক সোসাইটি-র পক্ষ থেকে পেলাম ইন্দিরা গাঁধী পদক

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৯৮৫ ও ২০১০। পঁচিশ বছর আগে ও পরে কান চলচ্চিত্রোৎসবে বন্ধু এলিয়ান-এর সঙ্গে, আমার জন্মদিনে, ১৪ মে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করল আমার ছবির রেট্রোস্পেকটিভ। তাই এই ছোট শহরে দু'দিন থাকতে হল, যার একদিন রাইনার্ড-এর জন্য।

ভেনিসে আমাদের ঠাসা কর্মসূচি ছিল। ভালমন্দ সবরকম ছবিই ছিল সেখানে। দীর্ঘক্ষণ আলোচনা, মতান্তর, যুক্তির জাল, স্ত্রী ও বন্ধুদের সঙ্গে কথাবার্তা, অনেকক্ষণ ধরে বেড়ানো ভেনিসে বিখ্যাত সেই গ্র্যান্ড কানাল-এ এবং বেড়াতে বেড়াতে পৌঁছে গেলাম বেশ জমাটি এক দ্বীপে। লাঞ্চের আগে আলোচনা প্রায় ঘণ্টা তিনেক চলল, তখন আমার স্ত্রী ও বন্ধুরা সেই দ্বীপের দৃশ্য দেখে বেড়াল, কেনাকাটাও করল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে তাঁরা মুগ্ধ। লাঞ্চের পর আমাদের সকলের স্ত্রীরা লিডো-তে ফিরে আড্ডা মারতে লাগল আর আমরা বিচারকরা তখন যুক্তির জাল বুনছি সেরা ছবিটির ওপর। এটা প্রায় ঘণ্টা চারেক ধরে। চার ঘণ্টা আলোচনার পর মোটরবোট আমাদের সবাইকে নিয়ে চলল হোটেলের দিকে।

সে উৎসবে জঁা লুক গোদার বড় পুরস্কার পেলেন। তাঁর ছবি *Prenom Carmen*-এর জন্য। বিতর্কিত পরিচালক তবুও তাঁর ছবি স্টাইল ও আঙ্গিকের দিক দিয়ে অসাধারণ। গোদার তাঁর নিজের স্টাইলে আধুনিক সমাজব্যবস্থায় অতি পরিচিত কারমেন-এর গল্প বলেছেন। কিন্তু আমার মনে রেখাপাত করেছিল ইউজিন প্যালসি-র ছবি। তিনি তরুণী। অল্প বয়সে তাঁর প্রথম ছবি *The Negro Street*। এ ছবিটি তাঁর দেশের মানুষদের সহজ ও সরল কাহিনি। যারা লড়াই করছে, কষ্ট পাচ্ছে, তাদের কথা রয়েছে এ ছবিতে।

পরের দিন গাড়িতে আমরা বার্গামো পৌঁছলাম। রাইনার্ড তখন ওখানেই ছিল। আমাদের বিশ্রামের সময় ছিল না। এমনকী ঘুমোনোর সময়ও ছিল না।

প্রথমদিন ডেভিডের সঙ্গে আলোচনা এবং রেট্রস্পেকটিভ নিয়ে ব্যস্ত রইলাম। এরপর রাইনার্ডের সঙ্গে। এরপর টরন্টোর দিকে রওনা দিলাম রোম থেকে। রাইনার্ড চলে গেল মুনিখ-এ। এটাই ঠিক হল যে রাইনার্ড ও আর একজন অক্টোবর মাসে কলকাতায় আসবে। ও আর ওর ক্যামেরাম্যান। এই দু'জনে ছবিটির কাজ করবে। বাকি কর্মীরা আমার ইউনিটের তিনজন।

আর একজন ডেভিড ওভারবি, লেখক ও সমালোচক, আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, ইতালীয় সিনেমার বিশেষজ্ঞ, বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সিনেমার ওপর। ডেভিড আমাদের টরন্টো বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানাতে এলেন। ওখানে ছোট

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চলচ্চিত্র উৎসব হলেও সবকিছু সুন্দর। সময়ের সঙ্গে তাল রেখে সবকিছু চলল। ওদের উষ্ণ অভ্যর্থনা আজও মনে আছে। কুণাল শিকাগোতে পৌঁছনোর একদিন আগেই আমরা পৌঁছে গেলাম সেখানে।

বিদেশের মাটিতে আমাদের যোগসূত্র স্থাপন হল। মনে পড়ে কুণালের সাড়ে তিন বছর বয়সে যখন স্কুলে নিয়ে গেছিলাম, তখন সে ভীষণ কেঁদেছিল। বহু বছর বাদে একইভাবে ইউনিভার্সিটির দোড়গোড়ায় এনে দিলাম। এবার গীতার চোখে জল। আমরা তিনজনে নিশার অনুপস্থিতি উপলব্ধি করলাম। নিশা তখন কলকাতায় তার থিসিস শেষ করছে।

আমরা তৈরি হয়ে নিলাম রাইনার্ডের জন্য যথেষ্ট প্রস্তুতি নিয়ে। অক্টোবর মাসের কোনও এক সময়ে রাইনার্ড কলকাতায় এল, সঙ্গে ক্যামেরাম্যান ফ্র্যাংক ব্রুনে-কে নিয়ে। সময়টা ছিল অক্টোবরের প্রথম দিকে। আমাদের কথা হল। অনেক কথা হল। ক্যামেরাম্যান সারাদিন ধরে কলকাতার রাস্তাঘাট ঘুরে দেখল। রাতারাতি সে তার কাজের পরিকল্পনা বদলে ফেলল। পরের দিন ছবির কাজ শুরু হল। নানা জায়গা থেকে। ক্যামেরাম্যানের ডায়েরির নোটের বাইরে। ছবির কাজ শুরু হল, কিন্তু শেষ কোথায় সেটা বোঝা গেল না। দশদিনের কাজ হল এবং ছবির নাম হল *Ten Days in Calcutta: A Portrait of Mrinal Sen*। শুটিং হল। আমার নিজের, আমার শহরের সঙ্গে নিলেন আমার ছবির প্রচুর ক্লিপিংস। নিজের ছবি মানে রাইনার্ডের ছবি *Knife in the Head* সম্পর্কে আমার খুব উৎসাহ ছিল। এই ছবিটির ক্লিপিংসও নেওয়া হল। এ ছবিটির গল্প এক ছাত্র ও শিক্ষকের গল্প। দু'জনেই পুলিশের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিল। ছবিটি কোনওভাবেই ভারতবর্ষের ছাত্র আন্দোলনের বাস্তবচিত্র থেকে আলাদা নয়। শুটিংয়ের পরবর্তী কাজগুলো হল মুনিখে। আমি রাইনার্ডের সঙ্গে মুম্বই গেলাম। সেখানে স্মিতা পাতিলের একটি ইন্টারভিউ নিল সে। কারণ স্মিতা আমার ছবি 'আকালের সন্ধানে'-তে অভিনয় করেছে।

রাইনার্ড ফিরে যাওয়ার ক'দিন বাদে হঠাৎ জানা গেল সত্যজিৎ রায়ের হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। পরপর দুটো অ্যাটাক। আমেরিকাতে বাইপাস সার্জারি হল। আর কাজ করতে পারবেন না তিনি। তবু তাঁর অদম্য কর্মপ্রীতি তাঁকে কাজের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

জায়গায় নিয়ে এল। তাঁর ইচ্ছাশক্তি তাঁকে আবার কাজ করতে আগ্রহী করে তুলল। যদিও তাঁর স্বাস্থ্য তখন ভেঙে গিয়েছে।

১৯৮৭ সালের এপ্রিল মাসে সত্যজিৎ রায়ের একটি বই প্রকাশ পেল। আমি বইটির প্রথম প্রকাশের দিন বইটি সবার হাতে তুলে দিলাম। বইটির নাম 'স্টোরিজ'। তাঁরই লেখা বাংলা গল্পের ইংরেজি অনুবাদ। যে গল্পগুলো উনি 'সন্দেশ' পত্রিকার জন্য লিখেছেন বিগত পঁচিশ বছর ধরে। সিগাল বুকস-এর এই বইগুলো কলকাতার পাশাপাশি একই সঙ্গে লন্ডন আর নিউইয়র্ক থেকেও প্রকাশ পেল। মজার ব্যাপার হল ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত কয়েকজন রুশ চলচ্চিত্রকার জানালেন সত্যজিৎ রায়ের নামে তাঁরা একটি ফিল্ম ক্লাব তৈরি করেছেন তাঁদের দেশে।

১৯৮৯ সালে সত্যজিৎ রায় ছবি করলেন ইবসেনের কাহিনি নিয়ে। ছবিটির নাম 'গণশত্রু'। ১৯৯০ সালে করলেন নিজের লেখা কাহিনি নিয়ে। সে ছবিটি হল 'শাখা-প্রশাখা'। ১৯৯১ সালে করলেন দশ বছর আগে নিজের লেখা গল্প 'আগন্তুক'। এই তিনটি ছবি পরপর তৈরির সময় স্টুডিয়োর বাইরে অ্যাম্বুলেন্স মোতায়েন থাকত। ডাক্তার বক্সি, বিখ্যাত হার্টের ডাক্তার উপস্থিত থাকতেন।

এরই ফাঁকে আমি ওর সঙ্গে নিভৃতে আলোচনা করতাম। আর কেউ সেখানে থাকত না। আমি ওঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম: 'মাঝে মাঝে একা লাগে না?' উনি বলেছিলেন: 'ভয়ংকর একা লাগে। ভীষণভাবে একা লাগে।'

এক বছর বাদে ২৩ এপ্রিল, ১৯৯২, তাঁর জন্মদিনের ন'দিন আগে উনি চলে গেলেন। ১৯৮৩ সালে তাঁর প্রথম হার্ট অ্যাটাকের দু' ঘণ্টা আগে একটা টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন: 'কাজ নিয়ে খুব ব্যস্ত আছি, মৃত্যু নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই।'

অকপট, অদ্ভুত সাহসী একজন মানুষ!

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ষো ড় শ অ ধ্যা য়

সারা পৃথিবী জুড়ে চলচ্চিত্র উৎসবের শেষ নেই। আন্তর্জাতিক উৎসব। এমনি এক চলচ্চিত্র উৎসব সেবার হল এদেশের মুম্বইয়েও। শুরু হল সেবার 'খণ্ডহর' দিয়ে। আমরা সবাই খুশি, প্রযোজক জগদীশ চৌখানিও। ইচ্ছে, মুম্বই শেষ করে আরও দু'-চারটে দেখানো যাক না, এদেশে ওদেশে। বড় ফেস্টিভালে।

শুরুর দিনে যা এদেশে সাধারণত ঘটে থাকে— প্রথমেই বক্তৃতা, সরকারি এক-আধজনের, আরও বা দু'-একজনের, ছোট বড় যার যতটা বলবার। নাচগান বা কখনও-সখনও। তারপর মূল ছবি। দর্শকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়েও বা। অনেকটা রাশিয়ান মডেলে। আশ্চর্য, খণ্ডহরের ক্ষেত্রে সেবার এতটা বাড়াবাড়ি একেবারেই হয়নি। দু'-চার কথাবার্তার পরেই ছবি দেখানো। শুধু কয়েকজন কলাকুশলী ও শিল্পীকে মঞ্চে তুলে আনা, পরিচয় করিয়ে দেওয়া। ব্যস, ওইটুকুই। কপাল আমাদের ভালই ছিল বলতে হবে।

একবার অবশ্য রাশিয়ান মডেলের এক চেহারা দেখেছিলাম মস্কোতে। আমার মতো মামুলি দর্শকও ছিল যেমন, তেমনি ছিলেন হলিউডের অতি বিখ্যাত কিং ভিডর। বয়স প্রচুর, তখন আর ছবি করেন না। পাশাপাশি আমরা দু'জন। আর চলচ্চিত্র উৎসব শুরু হচ্ছে ফ্রান্সিস ফোর্ড কোপোলার *Apocalypse Now* দিয়ে। কপাল যদি মন্দই না হবে কোপোলার, তবে কেন এক বিশাল বক্তৃতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল বিশাল জনতার, কোপোলার তো বটেই, কিং ভিডরেরও। মঞ্চে বসেছিলেন গণ্যমান্য অনেকেই, এবং মধ্যমণি সিনেমার মন্ত্রী ফিলিপ ইয়ারমাস। চেয়ার ছেড়ে উঠলেন মন্ত্রী। দর্শককুলের কানফাটানো করতালি। বক্তৃতা চলছে তো চলছেই, রুশ ভাষায়, অনুবাদের ছিটেফোঁটাও নেই। মন্ত্রীর বক্তৃতা শেষ হতেই আবার তেমনি করতালি। ছবি হয়তো এবার শুরু হবে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অবশ্যই কিং ভিডর ভয়ংকর রেগে গিয়েছিলেন তখন। হাতঘড়িটা একবার দেখলেন, তারপর আমার দিকে তাকালেন, বললেন, 'রুশভাষা জানো?' আমি বললাম, 'না।' বললেন, 'কতক্ষণ বলেছেন ভদ্রলোক জানো? নিশ্চয়ই জানো না। উনপঞ্চাশ মিনিট!' আমি হাসতে চেষ্টা করলাম। কিং ভিডর মনে মনে গজরাচ্ছিলেন।

খণ্ডহরের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা পুরোপুরি আলাদা। যেমন শুরু, তেমনি শেষ। দারুণ!

কয়েকদিনের মধ্যেই খবর এল বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসব শুরু হবে ফেব্রুয়ারি মাসে। ছবিটা ওঁরা দেখেছেন। ওঁদের মনে হয়েছে ছবিটা পুরনো ধাঁচের। এ খবর শুনে আমার ছবির প্রযোজক খুব ভেঙে পড়লেন। আমি বললাম, ব্যাপারটা সহজভাবে গ্রহণ করো।

এমনকী ১৯৬৫ সালে সত্যজিৎ রায়কে তাঁর 'চারুলতা' ছবিটি সম্পর্কে কান চলচ্চিত্র উৎসব বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল। ছবিটা তারা গ্রহণ করেনি। আমি প্রযোজককে বললাম এটা নিয়ে দুঃখ পেয়ে লাভ নেই। কথাটা বোধহয় আমি নিজেকে বললাম। এটার একটা সহজ অঙ্ক আছে। গতবছর বার্লিন উৎসবের ডিরেক্টর খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন, যখন জানলেন 'খারিজ' ছবিটা ১৯৮৩ সালে দেখানো হবে কান চলচ্চিত্র উৎসবে। সেই কারণেই ১৯৮৪ সালে বার্লিনে খণ্ডহর পুরনো ধাঁচের ছবি হয়ে দাঁড়াল। একেবারে জলবৎ তরলং।

খণ্ডহর রিলিজ হওয়ার পর ক্যাকটাস গেল জিল জ্যাকবের সেক্রেটারির কাছে। জ্যাকবের মহিলা সেক্রেটারি ছবির একটি প্রিন্ট চেয়ে পাঠালেন। ক্যাকটাস তাড়াতাড়ি একটি প্রিন্ট পাঠিয়ে দিল প্যারিসে ছবিটার প্রিভিউয়ের জন্য।

ছবিটি দেশের মাটিতে জমজমাট হয়ে দাঁড়াল। আমাদের তো ভালই লাগল, প্রযোজকও খুশিতে আত্মহারা। ছবিটা যাদের ভাল লাগল, তারা তীব্র আবেগে ভালবেসে ফেলল ছবিটাকে। খবরের কাগজও ছবিটাকে সম্মান জানিয়ে রিভিউ বের করল।

লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র বললেন, 'এবার আমি শান্তিতে মরতে পারি।' পরের দিন সকালে আমি ওঁর বাড়িতে গেলাম না জানিয়ে। বললেন, 'তুমি তোমার কথা রেখেছ। একটি শর্তে ছবিটা তোমাকে করতে দিয়েছিলাম যে আমার চোখ

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পুরোপুরি খারাপ হওয়ার আগে আমাকে ছবিটা দেখিয়ো। দুঃখের ব্যাপার চোখটা বড্ড তাড়াতাড়ি খারাপ হচ্ছিল। আমার চোখদুটো পুরোপুরি খারাপ হলে আমি দেখতে পেতাম না। দেখতে পেতাম না সেই ধ্বংস হওয়া বাড়িটা। দেখতে পেতাম না এই ক্ষয়িষ্ণু সময়ের নগ্ন কুৎসিত চেহারাটা, অন্ধকার ভাঙাচোরা সিঁড়ির ধাপ, সেই বিবর্ণ বয়স্কা মহিলা যাঁর গায়ে কম্বল জড়ানো। এত সমস্ত স্পষ্টভাবে দেখার পর দেখলাম সেই তরুণীকে— যামিনী। দুঃখী দূরবর্তিনী, বিষণ্ণ, একাকী।'

যখন প্রেমেন্দ্র মিত্র এসব কথাগুলো বলছিলেন তখন তাঁর হাতের সামনে একটি বই পড়েছিল। তাঁরই গল্প সংকলন।

বইটার পাতা ওলটাতে ওলটাতে একটি বিশেষ পাতায় এসে আমাকে প্রেমেন্দ্র মিত্র সেই খোলা বইয়ের পাতাটা দেখালেন। দেখলাম সেসব লাইনগুলোর নীচে কলম দিয়ে দাগ টানা। লাইনগুলো পড়ে দেখলাম ছবিটি করবার আগে আমি বারবার যেসব লাইনগুলো পড়েছিলাম, উনি আমাকে সেসব লাইনগুলো উচ্চস্বরে পড়তে বললেন।

আমি পড়লাম উদাত্ত কণ্ঠে, উনি শুনলেন: '...অস্ত যাওয়া তারার মতো তেলেনাপোতার স্মৃতি আপনার কাছে ঝাপসা একটা স্বপ্ন বলে মনে হবে। মনে হবে তেলেনাপোতা বলে কোথায় কিছু সত্যি নেই। গম্ভীর কঠিন যার মুখ আর দৃষ্টি যার সুদূর ও করুণ, ধ্বংসপুরীর ছায়ার মতো সেই মেয়েটি হয়তো আপনার কোনও দুর্বল মুহূর্তের অবাস্তব কুয়াশার কল্পনামাত্র।'

আমি একটু থামলাম লাইনগুলো পড়তে পড়তে। আর একটি লাইন পড়লেই গল্পটা শেষ হবে। আমি শেষ লাইনটা পড়লাম।

মনে আছে, মাঝরাত্তিরে উঠে আমি গল্পটা পড়েছিলাম, আর ওই লাইনদুটো পড়তে পড়তেই আবিষ্কার করেছিলাম তেলেনাপোতা-কে।

সেদিন সন্ধেবেলা উনি বললেন, 'আমার লাইনগুলো মনে ছিল, গত সন্ধেয় ছবিটা দেখে ফেরার সময় চেষ্টা করতেই মনে পড়ে গেল লাইনগুলো: একবার ক্ষণিকের জন্যে আবিষ্কৃত হয়ে তেলেনাপোতা আবার চিরন্তন রাত্রির অতলতায় নিমগ্ন হয়ে যাবে।'

আমি খুব খুশি যে আমি কথা রাখতে পেরেছি প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাছে।

আমি যখন বাড়ি চলে আসব আসব ভাবছি, উনি বললেন, 'নামটা কী?'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'কে! কার নাম!' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'ওই যে মাছ ধরতে যাওয়া ছেলেটির।' বললেন প্রেমেন্দ্র মিত্র।

'এখানে ছেলেটি ফটোগ্রাফার। ছবিতে কোনও মাছধরা নেই।' একটু অস্বস্তি নিয়েই বললাম আমি।

এক ঝলকের জন্য আমার দিকে তাকিয়ে মাথাটা নাড়লেন এবং বললেন, 'হুম্‌ম্‌।'

যদিও বিষয়টা বদলাল না, কিন্তু তার মনের ভাব বদলে গেল। আর উনি জিজ্ঞেস করলেন না যে ছেলেটা কে ছিল!

মনে হয় উনি হয়তো এই পরিবর্তনটা পছন্দ করেননি। হয়তো এ সম্পর্কে ওঁর কোনও মতামতও ছিল না। আমি সেটা জানতেও চাইনি এজন্যে যে এ ব্যাপারটা নিয়ে ওঁর আর আমার মধ্যে কোনও জটিলতা যাতে তৈরি না হয়।

যাইহোক দু'জনেই অনুভব করেছি, একে অপরের অনুভূতিকে। চমৎকার একটা সময় কাটিয়েছি দু'জনে, ছবি তৈরির আগে-পরে। প্রেমেন্দ্র মিত্র এই পৃথিবী ত্যাগ করেন এ ঘটনার প্রায় চার বছর বাদে। ১৯৮৮ সালে।

সপ্তাহখানেক বাদে জিল জ্যাকব আমাকে লম্বা একটা টেলিগ্রাম করল। ক্যাকটাসের এলিয়ানও ফোন করল। একটি সুখবর।

কমিটির ছবিটি ভীষণ ভাল লেগেছে। ছবির দৃশ্যাবলি থেকে আবেগঘন মুহূর্ত— সবই খুবই শক্তিশালী। সবাই একসঙ্গে সুর মিলিয়ে ছবিটিকে পছন্দ করেছে। প্রশংসায় পঞ্চমুখ কমিটির সবাই। এখানে ওখানে ছোটখাটো খুঁতখুঁতানি যে একেবারেই নেই তা নয়, তা সেসব ধরাছোঁয়ার মতো কিছুই নয়। কিন্তু যা নিয়ে জিল জ্যাকবের বেশ খানিকটা অস্বস্তি তা আমাকেও ভাবিয়ে তুলেছে। জিলের মতে খণ্ডহর অবশ্যই চলচ্চিত্র উৎসবে থাকবে, কিন্তু প্রতিযোগিতায় নয়। 'কেন? কেন নয়? ব্যাপারটা কি গোলমেলে নয়?' জিল জ্যাকব ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল।

আসলে 'পথের পাঁচালী' তো এই কান চলচ্চিত্র উৎসবেই দেখানো হয়েছিল ১৯৫৫-য়, তাই তার তিরিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে সত্যজিৎ রায়কে সম্মান জানানোর জন্যে তাঁর সাম্প্রতিকতম 'ঘরে বাইরে'-কে একমাত্র ভারতীয় ছবি হিসাবে রাখা হচ্ছে প্রতিযোগিতায়। কিন্তু জুরির বিচারে তেমনটা যদি না ঘটে, অর্থাৎ অন্য কিছু ঘটে যায়!' জিল জ্যাকবের ভয় সেখানেই। তা ছাড়া সত্যজিৎ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রায়ের হার্ট অ্যাটাক হওয়ায় সকলে আশঙ্কা করতে শুরু করেছিল যে, এইটেই তাঁর শেষ ছবি না হয়ে দাঁড়ায়! জিল বুঝতে পেরেছিল যে আমি এই মানবিক ব্যাপারটির জন্য খুশি হয়ে সবকিছু মেনে নেব এবং আমার সম্মতি জানাব যে খণ্ডহর ছবিটি মূল প্রতিযোগিতার বাইরে দেখানো হোক। লম্বা টেলিগ্রামে জ্যাকব ব্যাপারটা বুঝিয়ে বারবার আমাকে অনুরোধ করল যাতে আমি কোনওভাবেই এই উৎসব থেকে আমার খণ্ডহরকে তুলে না নিয়ে আসি। পরের দিনই জিল প্যারিস থেকে আমাকে ধন্যবাদ দিল যেহেতু আমি এ প্রস্তাবটা খারিজ করিনি। এবং আমি তাকে আশ্বস্ত করলাম যে সত্যজিৎবাবুর ভয়ংকর ইচ্ছাশক্তি এবং তাঁর কাজের প্রতি অবিশ্বাস্য ভালবাসা তাঁকে আবার কর্মজগতে ফিরিয়ে আনবে।

প্রতিবারের মতো এবারেও আমার জন্মদিন, ১৪ মে-তে খণ্ডহর কান উৎসবে দেখানো হল এবং অভূতপূর্ব সাড়া মিলল। Un Certain Regard-এ।

ছবি নিয়ে আমি নিষ্ঠা সহকারে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলাম। ক্যাকটাস যেটা করেছিল সেটা হল ছবি বিক্রির ব্যবস্থা, সুইডেনের ফিল্ম ইনস্টিটিউট এই ছবিটা কিনেছিল। শুরুটা ভালই হল।

এরই মধ্যে বেশ কিছু ঘটনা ঘটে গেল খণ্ডহর নিয়ে। ঘটনা মনট্রিয়ল-এ, শিকাগোতে, কখনও বা গোটা পৃথিবী জুড়ে আন্তর্জাতিক স্তরে। আগে ছিল না, কান চলচ্চিত্র উৎসবের এক নতুন বিভাগ সম্প্রতি খোলা হয়েছে, নাম কান ক্লাসিক্স (Cannes Classics)। শুনি, কান ক্লাসিক্স-এ এ যাবৎ কোনও ভারতীয় ছবি জায়গা করতে পারেনি। এবার পেরেছে। এ বছরেই। ২০১০ সালের ১২-২৩ মে মাসে। ছবি সেই খণ্ডহর। যা কিনা ২৬ বছর আগে প্রতিযোগিতার বাইরেই থেকেছে। খুবই মজার ব্যাপার। নয় কি? ভাল লাগে। নয় কি?

কানাডার মনট্রিয়লে খণ্ডহর দ্বিতীয় পুরস্কার পেল। একমাস বাদে সেরা ছবি হিসেবে স্বর্ণপদক পেল শিকাগোতে। মনট্রিয়লে আমি পুরস্কার নেওয়ার জন্য উপস্থিত ছিলাম। কুণাল শিকাগোয় আমার হয়ে পুরস্কার গ্রহণ করল। কুণালের স্ত্রী নিশা ভারত থেকে রিসার্চের কাজকর্ম ঠিকমতো করতে না পেরে শিকাগো চলে গেল বছরখানেকের জন্য।

ছবিতে কুণালকে লাগছিল টিপিক্যাল বাঙালিবাবুর মতো। বাঙালিয়ানার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চূড়ান্ত। ধুতি পাঞ্জাবি পরে কুণাল পুরস্কার নেয়। কুণালকে চেনা যাচ্ছিল না। অন্য কারও সঙ্গেও কুণালকে মেলানো যাচ্ছিল না। গায়ে একটি হালকাভাবে সুন্দর শাল জড়ানো পাঞ্জাবির ওপর। কিছুতেই শাল আর ধুতি ঠিক রাখা যাচ্ছিল না। কুণালকে কীরকম যেন একটা লাগছিল। ওরা আমাকে ওখানকার খবরের কাগজের ছবি পাঠাল। কুণালের হাতে ট্রফি। ট্রফিটাকে ধরে আছে কুণাল। গীতা বলল খুব স্মার্ট দেখাচ্ছিল কুণালকে। আমি নিশাকে বললাম, 'তুমি এত নিষ্ঠুর কেন!' নিশা হাসতে হাসতে বলল, 'মোটেই না, আমি নিষ্ঠুর নই, কেন কুণাল ওরকম সেজেছে, মনে করে দেখুন দিনটা কী ছিল— ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮০।' কথাটা বলে নিশা আবার হাসতে লাগল।

নিশা ঠিকই বলেছে। ওটা ছিল ওদের বিয়ের দিন। সবার মাঝখানে কুণাল বর সেজে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে আছে। কুণালকে বেশ নার্ভাস দেখাচ্ছিল। সেদিনটা আমি খুব মজা পেয়েছিলাম। নিশা যেমন পেয়েছিল শিকাগোতে পুরস্কার নেওয়ার সময়।

হঠাৎ মজা পেয়েছিলাম একটা মজার আবিষ্কারে। পুরনো কথা। রঞ্জিত মল্লিক 'ইন্টারভিউ' ছবিতে চাকরির ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে ধুতি-পাঞ্জাবি পরেছিল। ধুতি-পাঞ্জাবি পরতে বাধ্য হয়েছিল। রঞ্জিতকে লাগছিল ধোপদুরস্ত বাঙালিবাবু। ঘটনাচক্রে এত বছর বাদে শিকাগোতে কুণালকে ধুতি পরতে হল।

কুণালের কোনও রাস্তা ছিল না। বাঙালি ফুলবাবু তাকে সাজতে হয়েছে। দুটো চরিত্র আমার সামনে। একটি বাস্তব, একটি কল্পনায়। ভাবতে অবাক লাগে, কোনও কোনও পণ্ডিতও এসথিটিকস বা নন্দনতত্ত্ব নিয়ে কথা বলেছেন বা বলা ভাল কথা বলেছেন ইলিউশন আর রিয়েলিটি নিয়ে।

বইটার নাম *Illusion and Reality*। চল্লিশের দশকের শুরুতে পড়েছিলাম। খুব আনন্দের সঙ্গে পড়েছিলাম। বইটি লেখকের মৃত্যুর পর প্রকাশ পেয়েছিল। লেখক ক্রিস্টোফার কডওয়েল মারা যান স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে। সেই সময়টায় পৃথিবীর ইতিহাস বদলাতে শুরু করেছে।

স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় ইংল্যান্ডের কমিউনিস্ট পার্টি চাঁদা তোলে এবং তহবিল তৈরি করে, অ্যাম্বুলেন্স ও চিকিৎসার জন্য কিছু জিনিসপত্র কেনে। কডওয়েলের দায়িত্ব ছিল অ্যাম্বুলেন্স চালিয়ে ফরাসি দেশটা পার করিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দেওয়া। কডওয়েল সেই গুরুদায়িত্ব পালন করে বার্সিলোনায় চলে যান। সেখানে ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেড-এ যোগদান করেন। সেই দলে বহু বিদ্বজ্জনের মধ্যে ছিলেন আর্নেস্ট হেমিংওয়ে আর নরম্যান বেথুন। ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি নিহত হন ওই যুদ্ধে, বয়স তখন তাঁর মাত্র তিরিশ বছর।

ঘটনাচক্রে আমি এই অতীতের ভেতর দিয়ে সময় কাটিয়েছি। যে অতীতকে ভোলা যায় না। যে অতীত ঋদ্ধ করেছে আমাকে।

ফিরে আসি বর্তমানে, ১৯৮৩-তে। ...শিকাগো থেকে গীতার কাছে কুণালের চিঠি এল। গীতা রান্না করছিল। গীতা আমাকে পড়তে বলল সেই চিঠিটা। আমি সে চিঠিটা পড়লাম। বেশ জোরে জোরেই পড়লাম।

> মা আমি খুব তাড়াতাড়ি ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরি থেকে চিঠি লিখছি। আমার মনে পড়ছে ছোটবেলায় তোমার হাত ধরে সত্যজিৎ রায়ের 'অপরাজিত' দেখতে গিয়েছিলাম। আমার মনে পড়ে তুমি খুব কেঁদেছিলে, আর তোমাকে অত কাঁদতে দেখে আমারও চোখ ফেটে জল আসছিল। আমি এসব ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু গতকাল রাতে আবার কথাগুলো মনে পড়ল। ছবিটা আমার মনে খুব দাগ কেটেছিল। আমরা অপুকে খুব ভালবেসেছিলাম। গতকাল সন্ধেবেলা নিশা ও আমার কয়েকজন বন্ধু সবাই মিলে শিকাগো ইউনিভার্সিটির ফিল্ম ক্লাবে গিয়েছিলাম সেই অপরাজিত দেখতে। এটা বোধহয় আমার তৃতীয়বার বা চতুর্থবার দেখা হল। আমরা সবাই আমাদের মধ্যে অপুকে খুঁজে পাচ্ছিলাম। যারা এদেশে থাকবে বলে স্থির করেছে তাদের সবাই মোটামুটি নিজের মায়ের সঙ্গে কোনও-না-কোনও সমস্যায় জড়িয়ে আছে। ওদের কেউ কেউ ছবিটা দেখে খুব অস্বস্তি বোধ করছিল। ছবিটা দেখে আমরা সবাই আমাদের ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এসে তর্ক জুড়ে দিলাম। ওরা বলছিল, সন্তানের কি কোনও অধিকার নেই নিজের ভবিষ্যৎ গড়ে নেবার? ছেলে কি কেবল মায়ের আঁচল ধরে থাকবে?

চিঠিটা ছোট হলে কী হবে, বিতর্কটা আমাকে জানাতে চাইছিল কুণাল, কারণ ও জানত— 'অপরাজিত' আমার কাছে সত্যজিৎ রায়ের ছবিগুলির মধ্যে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সবচেয়ে প্রিয়। ছবিটার ভেতরে আমি 'contemporaneity' খুঁজে পাই। একই কারণে পঞ্চদশ শতকের পটভূমিতে তৈরি কার্ল ড্রায়ার-এর *Passion of Joan of Arc*-কে আমার 'contemporary' ছবি বলে মনে হয়।

শিকাগো শহরে অনেক দূর থেকে কুণাল কুণালের বন্ধুদের সঙ্গে ছবিটা দেখেছে। হঠাৎ অপু কৈশোর পেরিয়ে যুবক হয়ে দাঁড়াল। কী করে অপু ধীরে ধীরে নিজের জগৎকে বড় করল এবং কীভাবে সে তার বাবার পুরোহিতগিরির কাজকে প্রত্যাখ্যান করল। অপু ভাবে এক অসম্ভব বাধা ডিঙোনোর কথা। সে নিজের মনের সঙ্গে লড়াই করে এবং অবশেষে এই পৃথিবীর বড় শহরে প্রবেশ করে। সর্বজয়া শান্তভাবে সবকিছু মেনে নিল, অথচ তার ভেতরে ভয়ংকর একাকিত্বের যন্ত্রণা। কিন্তু কুণালের বন্ধুদের কী হয়েছিল? আমার মনে হয়, একধরনের অপরাধবোধে ভুগছিল ওরা।

তর্কটা কীভাবে শেষ হয়েছিল সে সম্পর্কে কুণাল একটিও কথা জানায়নি। তবে সে জানিয়েছিল যে এখানে সে আর থাকবে না তার পড়াশুনো শেষ হলে। ফিরে আসবে।

চিঠিটা দেখে মনে হল কুণাল চিঠিটা তাড়াতাড়ি লিখেছে। কাজের ফাঁকে চিঠিটা লিখে কুণাল বাড়ি ফেরার পথে পোস্টবক্সে ফেলে দিয়েছে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি চিঠিটা লেখার কোনও প্রয়োজন ছিল না। আমি অবাক হলাম। গীতা যখন রান্নাঘরে আমি তখন কুণালের চিঠিটা রেখে বাইরে এসে ভাবতে লাগলাম।

বিশের দশকের কাহিনি, তিরিশের দশকে লেখা হয়েছিল, সত্যজিৎবাবু ছবি করেছিলেন পঞ্চাশের দশকে এসে, সেই ছবি দেখে নিজেদের মধ্যে তর্ক শুরু করল একদল তরুণ-তরুণী আশির দশকের মাঝামাঝি। কী আশ্চর্য! সমস্ত সময়ের সীমারেখা মুছে ফেলে 'অপরাজিত' হয়ে উঠেছে সমকালীন ভাষ্য, সাম্প্রতিকের চিহ্ন।

কুণালও কি পারবে কথা রাখতে? আজ সে যা বলছে, আসন্ন সময় যদি পরিবর্তনের ভার চাপিয়ে দেয় তার ওপর, তখন সে কোনটাকে বেশি গুরুত্ব দেবে?

এসব প্রশ্ন আমার আর গীতা উভয়েরই। পার্থিব প্রশ্ন, জীবনের প্রশ্ন। কুণাল আর নিশা প্রতি বছরে একবার আমাদের কাছে আসে। কখনও কখনও বছরে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

দু'বার। আমরা দু'জনও ওদের ওখানে গিয়েছি। আমাদের বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ওরা প্রতি সপ্তাহে ফোন করে, আধ ঘণ্টা ধরে ফোনে কথা হয়। এ ছাড়া ই-মেলে যোগাযোগ হয় নিয়মিত। জীবন এভাবেই বয়ে চলে, আপন নিয়মে। সঙ্গে আমার সিনেমার কাজও।

একদিন হঠাৎই কুণালের চিঠি এল। সেটা ডিসেম্বর, ১৯৯৯ সাল। ২৮ ডিসেম্বর। রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে আমার ল্যাপটপ-এ মেলবক্স খুলে কুণালের চিঠিটা পেলাম। ওর সঙ্গে ওর বন্ধুদের একটা বহুদিনকার নির্ধারিত উদ্যোগ নিয়ে লিখেছে।

তিরিশ বছর আগে যখন কুণাল ও কুণালের বন্ধুরা স্কুলের পাঠ শেষ করতে চলেছে তখন ওরা সবাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল যে ওরা এই শহরে কলকাতায় মিলিত হবে নতুন শতাব্দীর প্রাক্কালে।

ওদের কাছে তখন সময়টা ছিল আনন্দ আর উত্তেজনার সময়। তখন মানুষ চাঁদে পা রেখেছে। গ্যাগারিন থেকে অ্যাপোলো ঘটতে ঠিক দশ বছর সময় লেগেছে। কুণালরা তখন তিরিশ বছর এগিয়ে এক উজ্জ্বল পৃথিবীর বা শহরের কথা ভাবতে শুরু করেছিল।

তা হলে কোন জায়গায় কুণাল ও কুণালের বন্ধুরা দেখা করবে? তিরিশ বছর বাদে এ শহরটাকে তো আর চেনাই যাবে না। ওরা এমন জায়গায় দেখা করবে যে জায়গাটা বুলডোজারের শিকার হবে না। কুণালের বন্ধুরা একবাক্যে রাজি যে ওরা সবাই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের উত্তরদিকের গেটের সামনে দেখা করবে।

কুণালের চিঠির খানিকটা তুলে দিচ্ছি: 'গত দু'দশকে যখনই আমাদের দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে নতুন শতকের সন্ধিক্ষণের বছরটা নিয়ে। একদিন আমি সন্ধেবেলার দিকে গড়িয়াহাটের দিকে হাঁটছিলাম এবং যখন ত্রিকোণ পার্কের কাছে এলাম আমার পা দুটো হড়কে গেল। নিজেকে সামলে নিয়ে হোঁচট খেতে খেতে নীচের দিকে তাকিয়ে আবিষ্কার করলাম যে, তিরিশ বছর আগে যেরকম হোঁচট খেয়েছিলাম আমি ফুটপাতের ওপর, আজও তিরিশ বছর বাদে তেমনি হোঁচট খেলাম ফুটপাতের ওপর।' মুশকিল হল যখন ডিসেম্বর মাসের শুরুর দিকে কুণাল একটা কাজ পেল, 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'র। কুণাল না

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পারল কাজটা প্রত্যাখ্যান করতে, না পারল কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞেস করতে যে, ডিসেম্বর মাসে শুরু না করলে কী হয়। শেষ পর্যন্ত কুণাল কাজটা নিল এবং এক সপ্তাহের মধ্যে কাজে ঢুকে পড়ল। এতে যে ওর নতুন শতকে সকলে মিলিত হওয়ার স্বপ্নটা ভেঙে গেল, তা নিয়ে ওর চিঠিতে লিখল: 'কথাটা আমি নিজেকে দিয়েছিলাম। নিজের মনের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম আমি। সেই প্রতিজ্ঞাকেও ভাঙতে হচ্ছে। ভয়ানক শক্ত ও কঠিন ব্যাপার।'

কুণালের চিঠি তো শেষ হল। তারপর এল সেই ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৯, নতুন শতকের সন্ধিক্ষণ।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের উত্তরদিকের গেটটার সামনে আমি বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ পৌঁছে গেলাম। সেখানে কুণালের বন্ধু, বন্ধুদের স্ত্রী সবার সঙ্গে দেখা হল। সেখানে আবার তাদের কারও কারও ছেলেমেয়েরাও উপস্থিত ছিল। এমনকি, ডিভোর্সীও ছিল দু'-একজন। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম এই স্বপ্নের মিলনের যে নায়ক তার প্রতিনিধি হয়ে। প্রস্তাবটা ঠিক হয়েছিল তিরিশ বছর আগে। ওদের সবার এবার মনে হল বয়স হয়েছে। তিরিশ বছর বয়স বেড়ে গেছে সবার।

রাত্রিবেলা কুণালকে জানালাম ফোন করে যে আমি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে উপস্থিত ছিলাম। সুন্দর সময় সেখানে কেটেছে। তবে ওরা সব বুড়ো হয়ে গিয়েছে। আমিই সেখানে যুবক। আমি যেন তিরিশ বছর আগের সময়টাতে ফিরে গেছি।

নতুন চাকরি কুণালের ভালই লেগেছিল। সেখানে কয়েক বছর কাজ করার পর নানারকম নতুন নতুন পরিকল্পনা, নতুন দায়িত্ব— সব মিলিয়ে মিশিয়ে কুণালের ভাষায় বলা যায়, 'এ কাজটা সৃষ্টিধর্মী, স্বাধীন এবং রীতিমতো চ্যালেঞ্জিং।' অন্যদিকে নিশা শিকাগোতে চাইল্ড এডুকেশনের ওপর পড়াশুনো করেছিল বলে শিকাগো ইউনিভার্সিটির ল্যাবরেটরি স্কুলে যোগ দিল নার্সারি আর কিন্ডারগার্টেন লেভেল-এ পড়াবে বলে, এর পিছনে ছিল ওর প্রগাঢ় ভালবাসা।

এভাবেই ওদের বৈবাহিক জীবনের শুরু বিদেশে, এইভাবেই ওরা বড় হল বা পরিণত হল। এইভাবেই আমরা চারজন একে অপরের সঙ্গে কথাবার্তা বলতাম, বছরের পর বছর। বিগত কয়েকটা বছর আমরা ওদের 'মিস' করি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ওরাও আমাদের 'মিস' করে, কিন্তু কখনও কোনও দূরত্ব তৈরি হয়নি। এখনও পর্যন্ত নয়, 'নট ইয়েট' বা বলতে পারি কুরোসাওয়ার সেই বিখ্যাত ছবির নামটা নিয়ে *Madadayo*— নট ইয়েট। ছবির সেই বৃদ্ধ শিক্ষক বারবারই অসুস্থ হয়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। লড়াই করে মৃত্যুর সঙ্গে বারবারই। তার ছাত্ররা দৌড়ে আসে, ডাক্তার দেখায়, সেবা করে। বৃদ্ধ শিক্ষক বেঁচে ওঠে। সবশেষে মিষ্টি হেসে বলে 'মাদাদায়ো— নট ইয়েট'।

চলে আসি 'খণ্ডহর' প্রসঙ্গে। 'ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম গাইড'-এর সম্পাদক পিটার কাওই প্রতিবারের মতো এ বছরেও সেরা দশটি ছবির নাম ঘোষণা করলেন, তার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবিগুলোর মধ্যে ঠাঁই পেল খণ্ডহর। বাকি ন'টা হল: *Under the Volcano* by John Huston (USA/Mexico), *Diary For My Children* by Mérta Meszáros (Hungary), *E La Nave Va* (And the Ship Sails On) by Federico Fellini (Italy-France), *Coup de Foudre* (At First Sight) by Diane Kurys (France), *Un Dimanche à la Campagne* (A Sunday in the Countryside) by Bertrand Tavernier (France), *Paris Texas* by Wim Wenders (West Germany-France) এবং Italy's *Kaos* (Chaos) by the famous Taviani Brothers.

পরের বছর শুরুর দিকে একসময়ে রাইনার্ড হফ আমাকে ওর ছবির একটি আশি মিনিটের ক্যাসেট পাঠাল। আমার ও কলকাতার ওপর যে কাজটা করেছিল।

এই শহরের বিভিন্ন প্রান্তের ছবি, দশদিনের কাজে এমনভাবে সাজানো হয়েছিল যে ছবিটির শুটিং-এর সময় কিছুই বোঝা যায়নি। পরবর্তীকালে মিউনিখে এ ছবিটা অর্থাৎ *Ten days in Calcutta* দেখি। একটি বড় থিয়েটার হলে বিশেষ অতিথিদের সঙ্গে বসে। 'টাইমস' পত্রিকা (লন্ডন)-এর ডেভিড রবিনসন আমার সঙ্গে ছিলেন। আমি খুব পরিষ্কারভাবেই বললাম, রাইনার্ড যেভাবে এ শহরের ওপর কাজ করেছে এমন কাজ আগে কেউ কোনওদিন করেনি। রবিনসন বললেন: 'You can't see the tip of your nose, can you?'

সেদিনই মিউনিখ থেকে ক্যাকটাস-এর এলিয়ানের ফোন পেলাম। ইন্দো-ফ্রেঞ্চ কো-প্রোডাকশনের সঙ্গে সুইস আর বেলজিয়াম কোম্পানিকে যুক্ত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

করা যায় কীভাবে, আমাদের নতুন ছবির ব্যাপারে। আন্তর্জাতিক স্তরে এত বড় ব্যাপার ঘটতে চলেছে বটে, বাজেট ছিল কিন্তু অত্যন্ত কম। যাইহোক, রাজস্থানে গেলাম ইউনিটের লোকজন নিয়ে লোকেশন দেখতে। জনমানবশূন্য, ধূ ধূ প্রান্তর, ভয় লাগে এমন নির্জন জায়গা রাজস্থান ছাড়া কোথায় পাব! ঈশ্বরের অভিশাপ লেগেছে যেন এমন কাঠিন্য আর রিক্ততা। সমরেশ বসুর একটা গল্পের আদল নিয়েছিলাম মাত্র, চিত্রনাট্য একসঙ্গে লিখব বলে ডেকে নিলাম মোহিতকে। মোহিত চট্টোপাধ্যায় বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে যে 'অ্যাবসার্ড থিয়েটার'-এর প্রবক্তা, সত্তরের বেশ কিছু ছবিতেই আমার সঙ্গে কাজ করেছিল ও। চারটি চরিত্র ছবির। এক কৃষক আর এক তাঁতির সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিল একটি ছিন্নমূল মেয়ে। তার সম্ভাব্য সন্তান নিয়ে শুরু হয় দ্বন্দ্ব ওই দুই পুরুষের মধ্যে। বাইরে থেকে অর্থ বা পুঁজির লোভ বয়ে আনে আরেক পুরুষ। এক ব্যবসায়ী। মাতৃতন্ত্রের পরাজয়, ব্যক্তিমালিকানা, পুঁজির প্রসার— এঙ্গেলস রচিত এ-সমস্ত তত্ত্বগুলি যেন ছায়া ফেলে ছবিটাতে— 'জেনেসিস'-এ।

ওরা তিনজন তিনজনের কাছে বন্ধু, খোলামেলা। চাষ-আবাদ শুরু হল এবং আশা করা গেল গম উৎপাদন হবে। জামাকাপড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হল, খাওয়া-দাওয়া আনন্দের সঙ্গে হতে লাগল। এমনকী সেই ব্যবসায়ীও খুশি হল এই ভেবে যে এই গ্রামে আবার জীবন ফিরে এসেছে। এই মহিলাটি আসার পর জীবনের ছন্দ ফিরে এসেছে, কিন্তু ধীরে ধীরে ওদের সম্পর্কের বন্ধনে চিড় ধরতে শুরু করেছে।

চাষি ও তাঁতি দু'জনেই সেই মহিলাকে কাছে পেতে চাইছিল। এসব দেখে ব্যবসায়ী খুব খুশি হয়েছিল। মহিলাটি প্রথমদিকে চেষ্টা করল দু' দুটো পুরুষের কামনা বাসনার বাইরে আসবার জন্য। কিন্তু সে পারল না।

ব্যবসায়ী কিন্তু বুঝতে পারল কী ঘটছিল ওই দু'জনের মধ্যে। একদিন হঠাৎই ওরা দু'জনে আবিষ্কার করল যে ব্যবসায়ী তাদের ঠকিয়েছে, বঞ্চিত করেছে। ওরা দু'জনে বিদ্রোহ করল। তখন ব্যবসায়ী তাদের নগদ টাকা দিয়ে হাত করল। ওরা দু'জন ভাবল অর্থ দিয়ে আর নগদ টাকা দিয়ে স্বপ্নকে খরিদ করা যায়।

মহিলাটি বুঝল যে ওরা দু'জনে স্বপ্ন দেখছে, দেখল কী ঘটতে চলেছে, পুরনো বিশ্বাস ভালবাসা হারিয়ে যাচ্ছে।

ব্যবসায়ী দেখল যে শস্য জন্মেছে। ওরা তিনজনে কাজ করছে। কঠিনভাবে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

পরিশ্রম করছে। আবার এটাও দেখল যে ফাটল ধরে গিয়েছে ওদের সম্পর্কে। কারণ মেয়েটি অর্থাৎ ওই মহিলাটি গর্ভবতী।

চাষি ও তাঁতি দু'জনের মধ্যে আরও পাওয়া, আরও আরাম, আরও সম্পদের লড়াই শুরু হয়ে গেল। একদিন রাত্রিবেলা চাষি ও তাঁতি নিজেদের মধ্যে আত্মহননের যুদ্ধ শুরু করে দিল পিতৃত্বের দাবি নিয়ে। এ সন্তানের বাবা কে! মহিলাটি সতর্ক করল তোমরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করছ। অকারণে শত্রু তৈরি করছ। কিন্তু বাইরের শত্রু সম্পর্কে সাবধান। ধীরে ধীরে মহিলাটি বুঝতে পারল এখানকার অধ্যায় শেষ। জীবন এখানে শেষ হতে চলেছে। এখানে নিজেদের লড়াই চলছে, আত্মহননের লড়াই চলেছে। একদিন গভীর রাতে সেই গর্ভবতী মহিলা তাঁর সন্তানকে পেটে নিয়ে সেই স্থান পরিত্যাগ করল নতুন জীবনের খোঁজে।

এ দু'জনের মনোমালিন্য ও লড়াই-এর ভেতর ঢুকে পড়ল সেই ব্যবসায়ী। তখন ওরা দু'জনেই একে অপরকে হত্যা করতে চাইছে। এরপর দেখা গেল সেই ব্যবসায়ী উটের পেছনে তার ব্যক্তিগত সৈন্য-সামন্ত নিয়ে সেখানে এসে হাজির হয়ে ওইসব জমি-জায়গা সম্পদ দখল করল। ওরা দু'জনে এই সময়ে মুহূর্তের জন্য একত্র হয়ে প্রতিবাদ করল— এ জায়গা, এ গ্রাম আমাদের। আমাদের হাতে তৈরি এ গ্রামের শস্য। এ গ্রামের সম্পদ।

অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। বুলডোজারের ধাক্কায় সবকিছু গুঁড়িয়ে গেল নতুন অধ্যায়, নতুন পৃথিবীর জন্য।

তিনজন অভিনয় করেছিল এ-ছবিতে। ওম পুরী, নাসিরুদ্দিন ও শাবানা আজমি। অসাধারণ অভিনয় করেছিল তিনজনেই। ব্যবসায়ীর ভূমিকায় ছিলেন নাটকের মানুষ, দিল্লি নিবাসী এম কে রায়না। সুন্দর অভিনয় করেছিলেন তিনিও।

দু'মাস ধরে কাজ হয়েছিল। ভয়ংকর গরমে সেই ঝলসানো রোদে। আবার ভয়ংকর ঠান্ডাতেও কাজ হয়েছিল। ভয়ংকর গরমে সর্পকুলের ঘুরে বেড়ানো, বড় বড় প্রচুর বিছের সান্নিধ্য পাওয়া গিয়েছিল। অনেক অসুবিধে অনেক সমস্যা দেখা দিয়েছিল— শুটিংয়ের আগে, শুটিংয়ের সময়ে, শুটিংয়ের পরে। বিশেষ করে যখন এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় মালপত্র নিয়ে যাওয়া হত তখন। এমন সব জায়গা যেখানে যাওয়া মানুষের পক্ষে সহজ নয়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

একটা বিরাট ব্যবস্থা হয়েছিল সেটা হল বিরাট একটি বিস্ফোরণের শুটিং করা। সেজন্য মালমশলা বারুদ সবকিছুর ব্যবস্থা হয়েছিল। ডজনখানেকের ওপর ধোঁয়া বোমার অর্ডার দেওয়া হয়েছিল। সবই যুদ্ধের দৃশ্য। ভয়ংকর যুদ্ধের দৃশ্য। আগুনে আগুনে ছয়লাপ, সেই ধোঁয়ায় গ্রামটা জ্বলছে। সবাইকে সতর্ক করা হয়েছিল এ দৃশ্যটি তোলার আগে। এসব ঘটনা ক্যামেরায় বন্দি হয় বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের এক অফিসারের তত্ত্বাবধানে। ঘণ্টাখানেক বাদে যখন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স জানাল যে সব ঠিক আছে, আপনারা বেরিয়ে আসতে পারেন, কোনও বিপদ নেই, তখন আমরা সবাই বেরিয়ে এলাম দেখতে। ঠিক তখনই হঠাৎ একটি বিস্ফোরণ হল। যে বিস্ফোরণে আমরা আহত হলাম। এ ব্যাপারে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের কোনও দোষ নেই। এটা ভগবানের কাজ— এ মতামত সেখানকার গ্রামবাসীদের। সব গ্রামবাসীরই এক কথা— আপনারা পুজো দিন।

এরপর সমস্ত দৃশ্যগুলো বন্দি হয়ে ইউরোপ চলে গেল প্রোডাকশনের পরবর্তী কাজগুলোর জন্য। বেশিরভাগ টাকাটাই ফরাসি প্রযোজক খরচ করবেন এবং সুইজারল্যান্ডও খরচ করবে বাকি বহির্দৃশ্যগুলোর জন্য। বেলজিয়াম ও ভারত ঠিক করেছিল খরচ বহন করতে নিজের দেশের শুটিং-এর জন্য। বাধ্য হয়েই আমি ও আমার লোককে বহুবার ব্রাসেলস আর প্যারিস যাতায়াত করতে হয়েছে। কখনও গাড়িতে কখনও ট্রেনে। তখন আমি অবশ্য ইউরোপে।

পণ্ডিত রবিশঙ্কর সুর সৃষ্টি করলেন প্যারিসে থেকেই। মাত্র দু'-চারজন সহকারী নিয়ে তিনি কাজটা সারলেন। বারো সপ্তাহের মধ্যে সব কাজ শেষ। প্রথম ক্যাসেটের কপি চলে গেল জিল জ্যাকবের কাছে। ফেস্টিভালের প্রিভিউ কমিটির জন্য। বোধহয় সেই সময়টা এপ্রিলের দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিন। গীতা যখন ব্রাসেলস্-এর বাড়িতে জিনিসপত্র গোছাচ্ছে তখনই প্যারিস থেকে জিল-এর ফোনটা এল, সুখবরটা জানাল। ইউরোপের ইউনিটের মানুষজনও চমৎকার কাজ করল। সবাই খুব খুশি, বিমানবন্দরে আমাদের বিদায় জানাতে এল। ব্রাসেলস্-এ থাকাকালীন কোনও এক সাংবাদিককে ছবিটা সম্পর্কে যে-উত্তরটা দিয়েছিলাম সেটা বরং বলি:

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

A World built and gained is but the World lost...

To be rebuilt or regained...

Genesis, Over Again.

যথারীতি ১৪ মে আমার জন্মদিনে কান চলচ্চিত্র উৎসবে 'জেনেসিস' দেখানো হল। সময়টা ছিল ১৯৮৬। কেউ বলল অসাধারণ, কেউ বলল তেমন কিছু নয়, কেউবা আমলই দিল না। কেউ আবার এঙ্গেলস-এর মার্কসবাদী তত্ত্বের সঙ্গে ছবির সম্পর্ক নিয়ে কিছু কথাও বলল: 'The Origins of Family, Private Property and the State.' কিন্তু 'খারিজ'-এর মতো 'জেনেসিস' তেমন সাড়া জাগাল না। ভাল মন্দ দু'-ই বলল।

এই ভাললাগা-মন্দলাগা আমাকে কখনওই তেমন প্রভাবিত করে না, আমি শুধু ছবি করে যাব সময়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে। ভাঙচুর করব, নতুন করে গড়ব, প্রতি মুহূর্তে নতুন চেহারায় নতুন ভঙ্গিতে হয়তো জন্ম নেবে আমার ছবি।

এইভাবে, গঠনে-গড়নে, ভাল-মন্দয়, অঙ্গসৌষ্ঠবে বা অঙ্গবৈকল্যে, আভাসে ইশারায় ইঙ্গিতে সাদায় কালোয় আমার প্রতিটি ছবিই দর্শকের মুখোমুখি হয়েছে। জেনেসিসের ক্ষেত্রেও হয়েছে। কখনও ভাল লাগেনি, কখনও লেগেছে। আমিও বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছি। কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে:

Geoff Brown (*The Times*)—U.K.

Stripped to its bare bones, the film might not sound too nourishing. But Sen is a wizard at conjuring subtle moods from a few figures in a landscape, and the unruffled pace is entirely justified by shifting human relationship.

M. K. Raghavendra: (*Deep Focus*)—India

It sounds and looks like a middle class Marxist primer... it is an awful kind of Marxist cinema.

Alexander Walker (*The Standard*)—U.K.

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

Unflawed gem of a movie.

Utpal Dutt: (*Ganashakti*)—India

With a narrative firmly confined to the archetypal trader, weaver and farmer, the film attains the quality of a parable, and gives a feel of the sharp-edged simplicity of a fairy tale. A complex historical period is here summed up before our eyes.

Jean-Claude Carrière: (*Libèration*)-France

Devoid of any mythical concern, all is simple, calm and clear. The scenes are brief, loaded with ellipses. Everything seems to be situated in the story itself but in a manner it is made, and the making is splendid... One is also able to read behind his film a story that all Indian children know—that of two birds flying with a big worm picked up from the earth held in their beaks—a single worm for both of them. A hunter follows them, bow in hand, never drawing it. He stops when the birds stop, and starts again when they fly. Surprised, a man asks the hunter, "What, on earth, you're doing? You're wasting your time. Why don't you strike?" And the hunter replies, "I'm waiting for them to fight."

এ এক আশ্চর্য ব্যাখ্যা— বিখ্যাত ফরাসি চিত্রনাট্যকার জ্যঁ-ক্লদ কেরিয়ার যা করেছেন। চলচ্চিত্রকার হিসেবে মুগ্ধ হয়েছি। আবার ভাবনায়ও পড়েছি যখন ছবির শেষে বুলডোজার টেনে এনেছি। যখন ইট পাথর মাটির শেকড় উপড়ে তুলে আনছি শূন্যে আর ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলছি সর্বত্র। শুধু অভাব হাড়গোড়ের আর করোটির। থাকলে কী জমত না! যাই হোক, জ্যঁ-ক্লদ কেরিয়ার এই ভাঙচুর নিয়েই লিখলেন:

What does it aim at? To construct a new city on that dried up earth where one does not kill snakes? A long road? Going where and coming from where...?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অর্থাৎ জেনেসিস। তাই কি? ছবির ভাষায়? সাফ কথায়, জেনেসিস-এ নিউ টেস্টামেন্ট-এর কথা নেই, নেই ওল্ড টেস্টামেন্ট-ও, আদম-ইভ-এ্যাবেল-কেইন কেউ নেই, নেই বাইবেলের কোনও পাঠ। সাদা কথায় বলা যায়, জনমানবশূন্য ধূ ধূ প্রান্তর, এক চাষি আর এক তাঁতি, আর দু'জনের সঙ্গে জড়িয়ে-পড়া এক ছিন্নমূল মহিলা। এই তিনজনকে নিয়ে এক সৃষ্টি— 'the story of the Creation'... Genesis, Over again.

...সেই ধূ ধূ প্রান্তরে চাষে-বাসে অজস্র ফলন আর আত্মহারা তিনে মিলে— চাষি, তাঁতি আর ওই নিরালম্ব মহিলা, বর্তমানে গর্ভিণী। কে পিতা, কারই বা ঔরসে কেউই জানে না, তিনজনের একজনও নয়। একজনই জানে— গর্ভধারিণী। জানে যে সে মা! কুপিত দু'জনে, যন্ত্রণাবিদ্ধ একজন—নাথবতী অনাথবৎ। আর বাইরে থেকে শুধু ব্যবসায়ীটিই দেখেছে কী ভয়ংকর সর্বনাশ ডেকে আনছে চাষি ও তাঁতি। আর তাইতো চেয়েছিল ব্যবসায়ী, শিকারী, জ্যঁ-ক্লদ কেরিয়ারের সেই গল্প।...

এদিন হঠাৎ, হঠাৎই, এক ব্যতিক্রমী সমালোচক, লেখক ও বিশিষ্ট স্কলার আমাকে একটা বেশ বড় লেখা পাঠালেন। আমার সঙ্গে পরিচয় আছে। থাকেন ইউ এস এ-তে। পড়ান। গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক—Avalon Foundation Professor, কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি— লেখাটির নাম *Outside in the Teaching Machine*। সহজে বোধগম্য নয়, তবু চল্লিশ-পঞ্চাশ পাতা থেকে খুঁজে পেতে একটা অতি ক্ষুদ্র অংশ তুলে না ধরে পারছি না। নানা ভাবনার প্রাসঙ্গিকতায় একাত্ম। সাধারণের কাছেও হয়তো অবোধ্য হবে না।...

> ...The viewer is baffled because Sen assumes *agency* of reinscription rather than the marginality of the post-colonial position... In such a text, the allegory works in bits and pieces, with something like a relationship with the post-modern habit of citing without authority. With a pedagogy that sees this as the mark of post-colonial mode of fragmentation, the allegory can offer a persistent parabasis to the development of any continuous ethno-cultural narrative *or* of a continuous re-inscription. *Genesis* is the 'origi-

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

nal', not the translated title of the film... At the origin is something, like a subtitle, something like a footnote, something like postcript, and post-coloniality can be its scrupulous paradigm...

জেনেসিস-এর ভারতীয় নাম মনের মতো পাইনি। পাইনি বলেই ব্রাসেল্‌স-এর সেই সাংবাদিকের কথাটা মাথায় এল যা কিনা ছবি শেষ করে ব্রাসেল্‌স্‌ ছাড়ার মুখে সাংবাদিককে লিখেছিলাম এবং এয়ারপোর্টে বসে চটপট লিখে ফেললাম জ্যাক লং-কেও ওদের পার্টির হারের মুখে...

A World built and gained is but the World lost...
to be rebuilt or regained...
Genesis, Over Again.

অর্থাৎ আমার ছবির এক মানে খুঁজে পেলাম আর পেলাম জ্যাক লং-এর রাজনৈতিক জয়-পরাজয়ের কথা।

বারবার জেনেসিস নামটাই মনে পড়ল, আর ওই তিনটি লাইন। তাই জেনেসিস নামটাই রেখে দিলাম। '...ওভার এগেইন' কথাটা জুড়ে দিলে কি ভুল হত!

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সপ্তদশ অধ্যায়

অনেক হয়েছে। অনেক অনেক। অনেক লেখালেখি, অনেকরকম লেখা, অথচ পড়াশুনো অনেক কম। বেড়ানোও হয়েছে অনেক অনেক। এখান থেকে সেখানে। ছবির বিচারক হওয়া, ছবির প্রদর্শনীতে উপস্থিত থাকা, চলচ্চিত্র উৎসবে যাওয়া, তারই মধ্যে ছবির কাজ করা, নতুন ছবি তৈরি করা। প্রেস কনফারেন্স অ্যাটেন্ড করা, ঘন ঘন খুঁজে বেড়ানো তেমন মানুষকে, যিনি আমার ছবির প্রশংসা করবেন এবং ঘুরে বেড়ানো। আবার সবাইকে কারণে-অকারণে বলে যাওয়া যে আমি বিশ্রাম চাই না। আসলে আমি কিন্তু লম্বা ছুটি চাই, প্রচুর দিনের জন্য, প্রায় শীতঘুম দেওয়ার মতো ছুটি। কান চলচ্চিত্র উৎসব থেকে ১৯৮৬ সালে ফিরে এসে দুটো সপ্তাহ কাটালাম এই শহরে। সে দু' সপ্তাহে তেমন কোনও ঘটনা ঘটল না। এখানকার ভয়ংকর গরমে অতিষ্ঠ হয়ে আমি আর গীতা আন্দামান বেড়াতে গেলাম, যেখানে আমরা কোনওদিন যাইনি। সেখানে গিয়ে হতাশ হলাম বিশ্রী আবহাওয়ার জন্য। সেখানেই জানতে পারলাম যে আন্দামানে বেশিরভাগ সময়ই আবহাওয়ার ভীষণ পরিবর্তন হয়, আবহাওয়া বিদ্রোহ করে প্রায়ই। ভয়ংকর গরম। রীতিমতো দাবদাহ, এমনকী বর্ষার সময়েও একই অবস্থা। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল লন্ডনের আবহাওয়ার ওপর জেরোম কে জেরোম-এর উক্তি: 'Weather, like the government, is always on the wrong'।

জেরোম আমার অন্যতম প্রিয় লেখক, লন্ডন নিবাসী। অনেক কিছুর ওপর লিখেছেন। যে বই আমার ভাল লেগেছিল সবচেয়ে বেশি: 'থ্রি মেন ইন আ বোট', 'নট টু স্পিক অফ আ ডগ'। আর 'বেলে লেটার', প্রচুর।

এত গরম সত্ত্বেও গীতার এ ভ্রমণসূচিটা ভাল লেগেছিল, কারণ বিগত দশ বছরের মধ্যে এইটিই আমার সঙ্গে গীতার একক ভ্রমণ, যে ভ্রমণসূচিতে কোনও

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কাজের ব্যাপার নেই। কোনও প্রেস কনফারেন্স নেই, কোনও ইন্টারভিউ নেই, কোনও সেমিনার নেই যে বলতে হবে, বক্তৃতা দিতে হবে। অদ্ভুতভাবে গীতা নিজের ব্যক্তিত্বকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে গেল যে অলডাস হাক্সলি-র পর্যবেক্ষণও খান খান হয়ে গেল, তিনি তাঁর *Eyeless in Gaza*-তে লিখেছিলেন, '...There go the two friends, one behind the other, *just as an Indian wife trails behind her husband.*' দু' সপ্তাহের আন্দামান সফরে গীতা সেটা যেন আমাকে শেখাল মর্যাদা আর মাধুর্যের সঙ্গে।

মাস দেড়েক বাদে আমি আমার কাজে মন দিলাম। সেই জেনেসিসের গর্ভবতী মহিলার কথা লিখতে শুরু করলাম।

পথের পাশে একটি ছোট খাবারের হোটেল, ভারতীয় ধাবার মতো। ধাবার মালিক এক বৃদ্ধা। কতরকম মানুষ আসে খেতে। ভাল মন্দ সবরকম। বেশিরভাগ খদ্দেরই শ্রমিক। সে ভদ্রমহিলা ভালবাসেন কথা বলতে। তাঁর জীবনের কথা, জীবনের উত্থান ও পতনের কথা, গল্প বলতে শুরু করলে আর থামেন না, থামতে চান না। টেনিসনের 'এনক আর্ডেন'-এর বুড়ির মতো। সেই সরাইখানার পাশ দিয়ে বড় বড় কনভয়গুলো সশব্দে নিত্য চলে যায়। কেউ জানে না ওইসব কনভয়গুলো কোথায় যাচ্ছে! সেই বৃদ্ধা গল্প করেন, কথা বলেন। একদিন সমস্ত খদ্দের চলে যাওয়ার পর ভদ্রমহিলা যখন একা, সেই হোটেল বা ধাবাটি বন্ধ করবেন ভাবছেন, দেখলেন অন্ধকারের মধ্যে একজন অপরিচিত মানুষকে, যাকে আগে কোনওদিন তিনি দেখেননি। মানুষটি রাস্তায় হাঁটছে একা একা অন্ধকারে। সেই মানুষটি হাঁটতে না পেরে অন্ধকার রাস্তায় বসে পড়ল। অসহায় মানুষটি সাহায্যের জন্য এদিক ওদিক দেখছিল। বৃদ্ধা হাতে লণ্ঠন নিয়ে অন্ধকারে রাস্তা পারাপার করলেন। দেখলেন মানুষটি গর্ভবতী নারী, যে সন্তান প্রসবের মুহূর্তে রাস্তায় এসে বসেছে। তারপর গভীর রাতে কনভয়ের আওয়াজের মধ্য দিয়ে শোনা যায় সদ্যজাত শিশুর কান্না।

এসব এলোমেলো লেখালেখির পর মোহিত চট্টোপাধ্যায়কে বললাম যদি সে আমার সঙ্গে কাজ করে। মোহিত সাধারণত যে কোনও মনোমতো কাজ পেলে লাফিয়ে ওঠে। কিন্তু এবারে মোহিত বলল, এটা নিয়ে ভেবে লাভ নেই। আমি সঙ্গে সঙ্গে সেটা নিয়ে আর ভাবলাম না। তারপর অনেকদিন আগে পড়া একটা গল্প নিয়ে ভাবলাম। এক কৃষক আর মেষপালকের কাহিনি, তারা তাদের ক্রোধ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আর ঘৃণা প্রশমিত করতে পারল না বলে পরস্পরের ধ্বংস ডেকে নিয়ে এল। এও এক আত্মহননেরই কাহিনি। নীতিবোধের এ-গল্পটা মুন্সি প্রেমচন্দের। 'মুক্তিমার্গ'। ওঁরই গল্প 'কফন' নিয়ে ছবি করেছিলাম, 'ওকা উড়ি কথা', ১৯৭৭-এ। এক সপ্তাহের ভেতর এ-ভাবনাটাও সরিয়ে রাখলাম আগের ভাবনার মতোই, কোনওটা নিয়েই কখনও আর ছবি করা হয়নি।

এমন সময় একটা টিভি-প্রজেক্ট এল। হিন্দিতে তেরোটা টেলিফিল্ম করতে হবে, কুড়ি মিনিটের প্রতিটি এপিসোড। ঠিক হল প্রতিটি ছবিই হবে নারী-পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে, সে-সম্পর্কের দুরূহ জটিলতা আর রহস্যময়তা নিয়ে। প্রথম এপিসোড বা গল্পটার নাম ছিল 'দশ সাল বাদ', দেড় দিনের ঘটনা, একটা পুরনো সম্পর্কের হঠাৎ জেগে ওঠা আর চাপা পড়ে যাওয়া।

ছবিটাতে গিরিশ কারনাড আর অপর্ণা সেন প্রাণমন দিয়ে অভিনয় করে। সম্পর্কজনিত বলে গোটা সিরিয়ালটার নাম দিলাম 'কভি দূর কভি পাস'।

প্রশ্ন এসে যায় ভিডিও ফিল্মের ওপর হঠাৎ ভালবাসা কেন! নতুন ধারার অভিজ্ঞতার জন্য? নতুন দিগন্ত খুলে দেওয়ার জন্য নাকি কোনও কিছু ভাঙবার জন্য? অথবা বুদ্ধিদীপ্ত অভিনয় ক্ষমতাকে তেমনভাবে ব্যবহার করবার জন্য? অথবা অতিরিক্ত অর্থ রোজগারের জন্য? আমি এবং আমার ইউনিটের জন্য অথবা রান্নাঘরটাকে ঠিক রেখে আনন্দ পাওয়ার জন্য? আমি নিজেকে উত্তর দিই হ্যাঁ এ সবকিছুর জন্যই। ভিডিওর কাহিনিগুলো শিশুর মতো খেলতে খেলতে শেষ করা যেত। যেমন একটি শিশু খেলনার বাড়ি তৈরি করে নেহাতই খেলার ছলে। সুন্দরভাবে সময় কেটে যায়। এভাবেই সিদ্ধান্ত নিই যে এগিয়ে যেতে হবে খুব তাড়াতাড়ি। এভাবেই আমার ইউনিট ও আমি এগিয়ে যাই।

ছোট পর্দায় কাজ করতে এসে আমার কাজের সীমা ও সম্ভাবনা নিয়ে বুঝলাম যে ভিডিও টেকনোলজি ব্যাপারটা কী। সেটা শিখলাম। ভুল ভ্রান্তির ভেতর দিয়ে, অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে শেখা হল অনেক কিছু। আমরা আনন্দে উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। আমরা বুঝতে পারলাম ছোট পর্দার শক্তিটা কোথায় লুকিয়ে আছে। গল্পগুলো বাছলাম বিখ্যাত লেখকদের ছোট গল্পের ওপর ভিত্তি করে। একটা সময়ে এমন পরিস্থিতি দাঁড়াল যে তেমন কোনও কাহিনি হাতের কাছে নেই। তখন আবার এমন অবকাশও নেই যে নতুন করে বাড়িতে বসে গল্প লেখা যায়। আমি তখন তিনজনকে জোগাড় করলাম, একই বয়সের তিনজন,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

যাদের বয়স কুড়ির কাছাকাছি। দুটো ছেলে আর একটি মেয়ে। এরা বুদ্ধিমান, সপ্রতিভ এবং অনুভূতিপ্রবণ।

মেয়েটি তার ঘনিষ্ঠ দুটি ছেলেবন্ধুকে তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করল দুপুরে খাওয়ার জন্য। যেদিন নিমন্ত্রণ করল সেদিন মেয়েটির বাবা ও মা বাড়ি ছিলেন না। মেয়েটি অত্যন্ত সচ্ছল পরিবারের মেয়ে। এরপর ওরা তিনজন সময়টাকে নিজেদের মতো করে কাটানোর জন্য একটা খেলা নিয়ে মাতল। সেটা একটা ইনডোর গেম। খেলার শর্ত হল যে মেয়েটি বিচারক হবে। সে খেলবে না। ওরা বাকি দু'জন খেলবে। এ খেলাতে যে ছেলেটি জিতবে সে মেয়েটির ভালবাসা পাবে। ওরা তিনজনেই এ ব্যাপারটা নিয়ে মেতে উঠল।

অভিনয় শুরু হল। ক্যারম খেলা, যখন খেলাটা শেষ হয়ে আসছে তখন ওই দুটো ছেলে কম কথা বলছে। মেয়েটি ভীষণভাবে গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে। অনেক সময় নিয়ে গুটিগুলোকে মারছে, যেমন অনেক সময় নিয়ে ভেবেচিন্তে দাবার চাল দেওয়া হয় ঠিক সেরকমটি আর কী। যখন খেলার ফলাফল সমান-সমান তখন দুটি ছেলের ভেতর নিজেদেরই অজান্তে ধীরে ধীরে শত্রুতা, হিংস্রতা বাড়ছে। দানা বাঁধছে রাগ, প্রতিশোধ স্পৃহা। মেয়েটিও এই অবস্থায় অসহায়ের মতো চুপ করে আছে।

খেলার শেষে সম্ভবপর বিজয়ীর শেষ গুটিকে মারার সময় যখন এল, তখন সম্পূর্ণ নীরবতা। দু'জনেই কী হয় কী হয় ভাব নিয়ে খেলছে। দু'জনেরই চোয়াল শক্ত হচ্ছে। ধীরে ধীরে মেয়েটির অবচেতন মনে দানা বাঁধছে একটি অস্বস্তিকর ভাব। মেয়েটি চেয়ার ছেড়ে উঠল, দু'জনের দিকে তাকাল আবার বোর্ডের দিকেও তাকাল, সম্পূর্ণ নীরবতা। অখণ্ড নীরবতা। কোনও শব্দ নেই। ভয়ংকর নীরবতা। হঠাৎই যে ছেলেটি বুঝল যে সে হার-এর মুখে সে আর ঠিক থাকতে পারল না, অসভ্যের মতো চেঁচিয়ে উঠল: 'স্ট্রাইক'!!!

একটি মুহূর্ত নষ্ট না করে মেয়েটি ক্যারম বোর্ডের ওপর লাফিয়ে পড়ে সমস্ত গুটিগুলোকে ফেলে দিয়ে ছেলে দুটিকে জড়িয়ে ধরল। সমস্ত কিছু তছনছ করে দিল। খেলার শেষে ছেলেদুটি ভাবল নিজেরাই দোষী। এখানেই কাহিনি শেষ।

ওরা ঠিক জায়গাটিতে আঘাত করল, এতটাই চমৎকার ওদের অভিনয়।

ছবিটি করতে গিয়ে দুঃসাহসিক অভিজ্ঞতা হল। এটাই ভিডিওর মজা। ছবিটার নাম দিলাম 'স্বয়ম্বর'। যখন দূরদর্শনে দেখানো হল তখন কেউ বলল

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভাল, কেউ বলল খারাপ। ব্যাপারটা আমার সবসময়ের সঙ্গী। দিনদিন প্রতিদিন।

তবে অভাবনীয় এমন অভিজ্ঞতাও হয় যা ভোলা যায় না কোনওদিন।

আমি তখন প্রসাদ ল্যাবরেটরিতে, সেই চেন্নাই-এ। সেখানে কাজ করছি ঘরে বসে। হঠাৎ দরজায় করাঘাত। তাকিয়ে দেখলাম দরজা খুলে ঢুকছে বিখ্যাত তামিল অভিনেতা এবং মেইনস্ট্রিম সিনেমার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব কমল হাসান। সে খবর পেয়েছিল আমি চেন্নাই-তে, প্রসাদ ল্যাবরেটরিতে কাজ করছি। সে বলল টেলিভিশনে ক্যারমের কাহিনিটা দেখেছে। সেটাও বেশ মজার ঘটনা। একদিন শুটিং শেষে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে টেলিভিশন সুইচ ঘোরাতে ঘোরাতে হঠাৎই আমার তৈরি ছবিটা দেখে সে বিছানা ছেড়ে সোফায় বসে পড়ে, চোখ ফেরাতে পারেনি টিভি থেকে। তারপর আমাকে বাকি ছবিগুলোর ক্যাসেটও পাঠাতে বলে, দেখবে ও। তখন যদিও কথা দিলাম যে ক্যাসেটগুলো পাঠাব, শেষ পর্যন্ত তা আর হয়ে ওঠেনি। আমার চরিত্রে যা বলে, কথা রাখিনি।

টোকিও থেকে আমন্ত্রণ এল। আমি আর গীতা ওখানকার চলচ্চিত্র উৎসবে যেন যাই। জুরি বোর্ডের চেয়ারম্যান হলেন গ্রেগরি পেক, আর আমি হলাম ন'জন বিচারকের একজন। উৎসবের কর্মকর্তারা বলেই দিয়েছিলেন আসতেই হবে। না বলা চলবে না। আমি গীতার ওপর ব্যাপারটা ছেড়ে দিয়েছিলাম। গীতা বলল, আমি কোনওদিন জাপান যাইনি। সুতরাং সম্মতি দিলাম।

সেপ্টেম্বর ১৯৮৭, আমরা টোকিয়ো পৌঁছলাম। পৌঁছেই টেলিফোন পেলাম গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বরের সেই সুপুরুষ মানুষটির, খ্যাতনামা অভিনেতা গ্রেগরি পেকের। বললেন, আমি এই মাত্র চিন থেকে এলাম। সুন্দর জায়গা। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কোনওদিন চিন গিয়েছি কিনা! আমি বললাম খুব শিগগিরই আমাদের দেখা হবে, এই তো প্রথম দেখা।

'প্রথমবার? আগে দেখা হয়নি? সে কী!' উনি অবাক হলেন।

'আমাদের ১৯৭৩ সালে তেহরানে দেখা হয়েছিল। কিন্তু আলাপ হয়নি। পরিচয় করানো হয়নি আমাদের।'

'হ্যাঁ। তেহরানে আমি ছিলাম।'

'সেটাই তো বলছি আমি।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'সুন্দর আতিথেয়তা ছিল সেখানে।'

'একেবারে ঠিক।'

'তুমি সেখানে ছিলে!'

'আমি বিচারকমণ্ডলীতে ছিলাম। ফ্রাঙ্ক কাপরা এবং জেমস ম্যাশনও ছিলেন।'

'ওহ! অপূর্ব!'

ঠিক এরকমভাবে পরপর না হলেও আমাদের কথাবার্তা প্রায় এরকমই ছিল। ফেস্টিভালে আমাদের কত মজার মজার অভিজ্ঞতা হয়। শুরুটা ভালই হয়েছিল। সন্ধেবেলা গ্রেগরি পেকের সঙ্গে যখন দেখা হল তখন কথা হল চিন ও তেহরান নিয়ে। ইরানের সুন্দরী মেয়েদের চোখের সৌন্দর্য নিয়েও কথা হল। আরবদেশের গানের সুর তারা যেভাবে ম্যান্ডোলিনে বাজিয়ে গায় তা নিয়েও কথা হল। ফ্রাঙ্ক কাপরার কথা শুনে খুব উৎসাহিত হলেন, কিন্তু জেমস ম্যাশনের কথাটা শুনে ততটা উল্লসিত হলেন না যতটা ভেবেছিলাম।

টোকিওতে ছবির কোনও আলোচনা, ছবির ওপর কোনও বিতর্ক হল না। এসব আবার অন্য চলচ্চিত্র উৎসবে হয়। ছবি দেখলাম। কোনটা ভাল কোনটা মন্দ সেগুলোও নিজের মধ্যে রাখলাম। শেষ দিনে বিচারকদের একটা মিটিং হল, সবকিছু যেন গোপন ব্যালটে ঠিকসময়ে ঘটে গেল। চেয়ারম্যান তাঁর ভাষণে বললেন যে, ব্যাপারটা একটু অস্বস্তিকর। ব্যক্তিগত মতামতে সব বিচার হবে, যে মতামতটি একান্ত ব্যক্তিগত। অন্যান্য সবাই মোটামুটি একই কথা বললেন। সবচাইতে সহজ পথ হল গোপনে ভোট দিয়ে বেরিয়ে আসা। কোনও মতান্তর বা মনান্তরের ব্যাপার নেই।

সমস্ত ব্যাপারটা 'টেকনিক্যালি পারফেক্ট'। ফলাফল বোর্ডে ফুটে উঠছে। কতজন সপক্ষে, কতজন বিপক্ষে ভোট দিয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। বাস্তবিক পক্ষে কোনও উত্তেজনা নেই। কোনও বিতর্ক নেই, কোনও আলোচনা নেই। এরপর মঞ্চে পুরস্কার দেওয়া হয়। হাততালি চলে। হই হই চিৎকার। আমার মনে পড়ে গেল, সত্যজিৎ রায় একবার বলেছিলেন যে, রেনোয়া রেগে যেতেন আমেরিকান ধাঁচের ব্যবস্থাপনা আর হলিউডের 'সিন্থেটিক' পরিবেশের ওপর। এ ব্যাপারটাও ঠিক তাই।

এতসব কিছুর মধ্যেও গ্রেগরি পেক ছিলেন অন্য মানুষ। সবসময় মজা করছেন, ঠাট্টা করছেন। এমনকী নিজের সম্পর্কেও হাসিঠাট্টা করছেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আমি ওঁকে আমার পছন্দের একটা গল্প বলেছিলাম, শুনে ওঁর এত পছন্দ হল যে লিখে নিলেন, পকেটে নোটটা রাখতে রাখতে চললেন, এটা আমার প্রাইভেট কালেকশনে থাকবে। গল্পটা আসলে গল্প লেখারই গল্প। আমি যেভাবে বলেছিলাম গ্রেগরি পেক-কে, সেভাবেই লিখলেন, না হলে মজাটা নষ্ট হয়ে যাবে। তাই বাংলার বদলে আপাতত ইংরেজির দ্বারস্থ হলাম।

An English teacher of a girls' school in London wanted her students to write short stories. She warned that stories to be written must not be anything but short, and must be written in the shortest possible time. A week passed by but no one could deliver one single short story. The teacher felt frustrated. When, at last, she decided to drop the idea, it so happened that one day she went to a drug store, and, good heavens, Somerset Maugham was there. In a desperate drive, she approached Maugham, told him about her problem and asked him for advice. Obviously, the great writer could not suggest any chemistry, because there was nothing of the kind. But, to give relief to her jaded nerves, he asked her to once try with the students, telling them about four necessary ingredients for a short story.

To start with, *divinity*, to lend a touch of sanctity to the story and to capture its ambience; and then, to build a classic ground in a simple elegant manner, *aristrocracy*; the third, *sex*, because of its primordiality; and lastly, the ultimate secret of success of storytelling, *mystery*. "Does it make any sense to you?" Maugham asked. The teacher felt infinitely grateful, particularly when it came so graciously from one of the great storytellers. She brought out her notebook from her wallet and wrote down the four key points. Then, like an obedient student, she repeated the points Maugham highlighted, the order being the same—*divinity, aris-*

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

tocracy, *sex* and *mystery*. Maugham was happy and wished her good luck. Next day she came to the classroom and in great excitement said it all to her students. They took notes, and without wasting a moment, got down to their business. "Must be short," the teacher said in a manner that befits a teacher. One particular girl, Martha, took just two minutes to write her stuff, and stood up.

"Yes!" the teacher asked, and with sympathy, came forward to help her.

"I have done it, miss," she said triumphantly.

"Done what?" The teacher was visibly irritated. "I asked you to write a story."

"That is what I have done," she asserted.

The teacher was furious. She said, "Martha, you are kidding around, aren't you?"

Martha said with confidence and pride that she had written just one single line and stuffed all four ingredients in an approprite manner. She followed the instruction of the great master of storytelling and so she could reasonably claim it to be the shortest story ever written. And she read it out for the teacher and her friends:

Oh God (*divinity*), cried the duchess (*aristocracy*), I am pregnant (*sex*), by whom I do not know (*mystery*).

ফেস্টিভাল যেমন হওয়ার হোক, কিন্তু গল্প বলার গল্পটা গ্রেগরি পেককে ভীষণভাবে মুগ্ধ করেছিল।

টোকিও ছাড়বার আগে গীতা আর আমি একটি সুন্দর সন্ধে কাটালাম আমাদের দীর্ঘদিনের বন্ধু নাগিসা ওসিমা এবং স্ত্রীর সঙ্গে। ওদের সঙ্গে ছিল ওদের ছেলে, আমেরিকা থেকে এসেছিল ক'দিনের জন্য বাবা ও মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। রাত্রিবেলা খাবার টেবিলে আলোচনা হল চমৎকার, ভারী সুন্দর পরিবেশ ছিল সেদিন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, মনে আছে কবে আমাদের প্রথম

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সাক্ষাৎ। একেবারে ঠিক বললেন ওসিমা! প্রথম দেখা ভেনিসে ১৯৬৯ সালে, একটা ছবি দেখার পর যখন সবাই মিলিত হলাম এক জায়গায়। এ ছাড়াও সেদিন আলোচনা হল আমার 'ভুবন সোম' নিয়ে।

একটি আশ্চর্য মানুষ ওসিমা, অসাধারণ চলচ্চিত্রকার, বামপন্থী মনোভাবের। সবসময় সামাজিক, রাজনৈতিক পটভূমিকায় ছবি করেন। আমেরিকার দাদাগিরির বিরুদ্ধে ইতিবাচক ভূমিকা নেন সেই ষাটের দশকে।

কলকাতায় নিজের শহরে ফিরে সপ্তাহ চারেক কাটানোর পর হঠাৎই আবার বেরিয়ে পড়লাম। এবারের আমন্ত্রণ এক অচেনা জায়গায়, যে জায়গায় কোনওদিন বেড়ানো বা দেখা হয়নি— কিউবা। আগে দু' দু'বার চলচ্চিত্র উৎসবে আমন্ত্রিত হয়েও আমি যেতে পারিনি সেই কিউবার রাজধানী হাভানাতে। কারণ তখন দু' দু'বারই ছবি করতে ব্যস্ত ছিলাম। এবারে আমন্ত্রিত আমি আর গীতা পনেরো দিনের জন্য। কিউবার ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন স্কুলে।

হাভানা এয়ারপোর্ট থেকে লম্বা প্রায় এক ঘণ্টার পথ গাড়িতে করে একটি গ্রামে এলাম। সেখানে বিরাট ক্যাম্পাস, সামনে বিরাট খোলা ময়দান এবং প্রচুর গাছ। অনেকগুলো দোতলা বাড়ি। সব হোস্টেল— ছাত্রদের জন্য, শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মচারী সবার বাসস্থান। আর কিছু বাড়ি অতিথিদের জন্য। সুন্দর সুন্দর যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজের জায়গা। সবকিছু হাতের কাছে। প্রথমেই গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ-এর উদ্বোধনী বক্তৃতা হল, তিনিই স্কুলের সভাপতি। তাঁর বক্তৃতার একটা লাইন এখনও আমার মনে আছে: '...behind everything there was the personal interest and care taken by *the world's least known cineaste, Fidel Castro*'।

পনেরো দিন আমাদের বিশ্রাম ছিল না। বিশ্রামের দরকারও পড়েনি। ক্যাম্পাসের ভেতরে শিক্ষক-ছাত্র সবার সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা। কখনও সবাইকে নিয়ে, কখনও আলাদা আলাদা। মার্কেজ যখন আসতেন তখন তাঁর কোনও বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না। সবকিছুই খোলামেলা কিন্তু কখনও কোনও কিছুর বাড়াবাড়ি নেই। ক্লাসে ছাত্রদের সঙ্গে খুব সহজ ভাষায় অনায়াস ভঙ্গিতে কথা বলছিলেন মার্কেজ আমার 'খণ্ডহর' নিয়ে, ছাত্রদের ক[illegible]নও ছবিটা দেখে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নেওয়ার কথা। বলতে বলতে হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কীভাবে এ-ছবি করার ভাবনা এসেছিল আমার। তারপর উত্তরের অপেক্ষা না করেই বললেন, 'Images come to me first.' একদিন আমার টেবিলে পড়ে-থাকা তাঁর লেখা *The Autumn of the Patriarch* হাতে তুলে নিয়ে বললেন, মেক্সিকোয় থাকাকালীন একটা অ্যালবামে ভারতীয় স্থাপত্যের ধ্বংসস্তূপ দেখতে দেখতে তাঁর মাথায় আসে এ উপন্যাসের বীজ। মধ্যপ্রদেশে বিশাল প্রাসাদের মতো বাড়িতে এক ভয়ংকর নিরালা খুঁজে পান যেন তিনি, তখনই তাঁর ডিক্টেটর চরিত্রের দ্বৈতরূপ তৈরি হয়। ভারতীয়ত্বের ছোঁয়া আছে বলে আমাকে এ-নিয়ে ছবি করার কথাও বললেন, বেশ উত্তেজিত ভাবেই। ফলে ওঁকে বোঝাতেই হল যে, এটি 'জেম অব আ বুক' নিঃসন্দেহে, কিন্তু ভারতীয়ত্বের ছোঁয়াটুকুই আছে শুধু, আদতে লাতিন আমেরিকা ছেয়ে আছে বইটির সর্বাঙ্গে, যা একেবারেই আমার এক্তিয়ারের বাইরে।

উপন্যাস থেকে ছবি, চলচ্চিত্র। প্রয়োজনবোধে মূলে আঘাত না ঘটিয়ে উপন্যাসকেও ভাঙচুর করা হয়। লেখক হয়তো অখুশি হবেন না। হয়তো বা হবেন। বললেন: নিজে গল্প লিখে চিত্রনাট্য করে নিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। এই নিয়ে মার্কেজের সঙ্গে একদিন কথা হয়েছিল, বলেছিলাম, আপনার অধিকাংশ উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ণ বড়ই কঠিন, প্রায় অসম্ভব। শুনে মার্কেজ হেসে ফেললেন, বললেন: কাটাকুটি করে নেওয়া যায় না কি! আমি বলি: বলছেন! পঠন পাঠন এতই সুখকর যে কলম ছোঁয়ানো যায় না। কমলকুমার মজুমদার আমাদের দেশের এক মহৎ লেখক। তাঁর সম্পর্কেও আমরা অনেকেই ওই এক কথাই বলব। দু'-চারজন চেষ্টাচরিত্র করেননি এমন নয়, কিন্তু হয়ে ওঠেনি। সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্রে।

বছরখানেক বাদে কিউবার এক সাপ্তাহিক পত্রিকায়, স্প্যানিশ-ইংলিশ-ফ্রেঞ্চ-পর্তুগিজ সব ভাষাতেই বেরোল তাঁর সাক্ষাৎকার, তাতে মার্কেজ বললেন: 'আসলে সাহিত্যের বিশ্বস্ত রূপটিই ফিল্মে দেখতে চায় দর্শক, কিন্তু সে-সাহিত্যের চলচ্চিত্রীয় রূপান্তর দেখতে চায় না, তাই আমার বইও ছবি না হওয়াই ভাল, বরং সিনেমার জন্যে আমি আলাদাভাবে কাহিনি রচনা করব।' মার্কেজ মানুষটি যেমন আশ্চর্য, আশ্চর্য তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ও পর্যবেক্ষণ, এক জায়গায় উনি লিখেছেন:

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

> The words are within the image. If you think about it, the written word is a primitive medium. You know what it is to have put one letter after another, and to read it to have to decipher one sound after another without knowing what it means. It is totally primitive... The image, on the other hand, produces an immediate and much deeper emotional impact, and you do not have to decipher anything. It goes straight to your heart.

কিউবায় আমরা সুন্দর সময় কাটিয়েছি। ক্যাম্পাসের ভেতরে ও বাইরে। ছাত্রছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকা সকলেরই সঙ্গে। মার্কেজ ছাড়া এসপিনোজা ও তাঁর স্ত্রীও ছিলেন। স্ত্রী লোলা। সঙ্গে উমবের্তো সোলাস। ছিলেন টমাস অ্যালিয়া— বিশ্ব চলচ্চিত্রের এক অসামান্য ব্যক্তিত্ব এবং মার্কেজ যাঁকে বলতেন লাতিন আমেরিকার সর্বশক্তিমান পোপ— সেই ফার্নান্দো বিরি-ও। যে ক'দিন আমরা কিউবায় ছিলাম রোজই আমরা সবাই সবাইকে নিয়ে ঘর করেছি, ঘুরে বেড়িয়েছি, নিত্যনতুন ভাবনায় জড়িয়ে পড়েছি, ছবি দেখেছি, ছবির বিষয় নিয়ে তর্ক তুলেছি, মতের গরমিল ঘটিয়েছি কথায় কথায়, মনান্তর অবশ্য সম্পর্কে কখনও চিড় ধরায়নি। সে আশ্চর্য এক সময়। এবং আশ্চর্য যে আমরা দু'জন ছাড়া বাকিরা সবাই কিন্তু কিউবার মানুষ নন। ফার্নান্দো বিরি আর্জেন্টিনার, মার্কেজ কলম্বিয়ার। ভাষা একাধিক— স্প্যানিশ, পর্তুগিজ...

একদিন সোলাস আমাকে নিয়ে গেল একটি বাড়িতে, যেখানে হেমিংওয়ে বাস করতেন এবং সেখান থেকে নিয়ে এল একটি কাফেতে, যেখানে এই বিখ্যাত লেখকটি প্রায়ই আসতেন কফি খেতে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়। এই মানুষটি কিউবায় আসেন সাংবাদিক হিসেবে ১৯৪৫ সালে। হেমিংওয়ে মৎস্যজীবীদের কাছে বেশি থাকতেন এবং অনেক মৎস্যজীবীর সঙ্গে ভাল পরিচয় ছিল যাদের উনি নামধামও জানতেন। কিছুদিন বাদে উনি লিখলেন *The Old man and the Sea*। এটা আমার সবচাইতে প্রিয় উপন্যাস ওঁর বিখ্যাত তিন-তিনটে উপন্যাসের মধ্যে।

বহুকাল আগে কলকাতারই সিনেমা হলে ওই উপন্যাসটা নিয়ে তৈরি যে ছবিটা দেখেছিলাম, তাতে চমৎকার অভিনয় করেছিলেন স্পেনসার ট্রেসি। আমি ফেরার পথে উমবের্তোকে বললাম একটি ডকুমেন্টারি *The Spanish*

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

Earth যেটি ১৯৩৭ সালে তৈরি করেন হল্যান্ডের এক পরিচালক ইয়রিস ইভেন্স— সেটির কথা। তখন হেমিংওয়ে স্পেনে ফ্রাঙ্কোর ফ্যাসিস্ট বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেডের হয়ে। সাংবাদিক হিসেবে কাজ করতে গিয়ে হেমিংওয়ে ওখানে ওই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি এ ছবিটি আমি বার্লিনে দেখি। আবার কান-এ ইয়রিস ইভেন্সের সঙ্গে দেখা হয়। উনি তখন অসুস্থ। হাঁটতে পারেন না। হুইল চেয়ারে উপবিষ্ট। সময়টা হল ১৯৮৯, চার্লি চ্যাপলিনের শতবর্ষ।

এই পনেরো দিনে অনেক কিছু ঘটে গেল। বিশেষ করে লোলার জন্য। যখন ফিরে এলাম সবাই বলল আমাদের বয়সটা কমে গিয়েছে।

ক্যাকটাসের এলিয়ান বলল আমি যেন অবশ্যই সিটি লাইফ ফাউন্ডেশনের একজন কেউ হই। এর নির্মাতা একটা ডাচ সংগঠন। সংগঠনটির মূল ব্যাপার ছিল পৃথিবীর বারোটি শহর নিয়ে বিভিন্ন দেশের বারোজন চলচ্চিত্রকারকে দিয়ে ছবি করানো, প্রতিটি ছবি হবে কুড়ি মিনিটের।

বারোজন চলচ্চিত্রকার বারোরকম ভাবনা ভাবলেন। শুধু তাই নয় বারবার ব্যাপারটা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হল। আমি যে ছবিটা করলাম নাম দিলাম *Calcutta, My El Dorado*। কলকাতায় শুটিং হলেও কিন্তু বাকি কাজ হল রটারডামে, হল্যান্ডে। অসাধারণ কাজ করল আমার ছবির সম্পাদক মৃন্ময় চক্রবর্তী।

'জেনেসিস' ছবির তিন বছর বাদে যে ছবিটা করলাম সেটা ১৯৮৯ সালে। 'একদিন অচানক'। সেই রমাপদ চৌধুরীর গল্প। যিনি খারিজের লেখক তাঁরই কাহিনি। এই শহর কলকাতারই ঘটনা। যে কলকাতা থেকে এক বৃষ্টির দিনে হঠাৎ 'হারিয়ে' যান অবসরপ্রাপ্ত এক অধ্যাপক, শহরের রাস্তাঘাট তখন বৃষ্টিতে জলবন্দি। স্ত্রী-সন্তানদের প্রচুর খোঁজা সত্ত্বেও আর ফেরেননি মানুষটি। বছরখানেক পরে তাঁকে নিয়ে যখন কথা চলছে স্ত্রী-ছেলে-মেয়েদের মধ্যে, তখন একটা লাইন যেন শুধু জেগে থাকে, টেক্সটের শেষে নয়, ছবির শেষে: 'The tragedy is that man has only one life, that he lives just once'।

ছবিটা করতে করতে নিজের জন্যই যেন একটা অনুচ্ছেদ লিখলাম ইংরেজিতে, হয়তো বা সকলের জন্যেই:

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

> Believe it or not, the fact remains that whatever we are, big or small, there is invariably an area of mediocrity in us. The moment we are aware of it, crisis begins to deepen. Crisis deepens because there is no way we can start again from scratch, because there is no way we can correct our own conclusions.

১৯৮৯-এর ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসব। সাংবাদিক সম্মেলনে প্রথম প্রশ্ন আসে এক সাংবাদিকের কাছ থেকে: 'এ-ছবি কতটা আত্মজীবনীমূলক?' উত্তরে আমি বলি, 'সেটা আমার ক্ষেত্রে যতটা সত্যি ততটা আপনার ক্ষেত্রেও।' যদিও জানি এ উত্তরটা সকলের জন্যে প্রযোজ্য নয়। পরে লন্ডন চলচ্চিত্র উৎসবে ছবিটা দেখানোর সময় ডেরেক ম্যালকম 'দ্য গার্ডিয়ান'-এ লিখলেন: "Sen's portrait of the self-doubting old gentleman is fascinating, since it is clearly intended to be autobiographical, and a discourse about success and failure that is as frank and honest as anything Sen has yet put on the screen..."

না, পুরস্কার-টুরস্কার কিছুই পেলাম না সেবার। কেউ পেল, অনেকেই পেল না। আমি ওই না-পাওয়ার দলে। গীতাকে বললাম, 'কী করবে? পালাৎসো-তে যাবে, না কি, অন্য কোথায়ও? স্যান মার্কো?' গীতা বলল, 'স্যান মার্কোই ভাল। যাবে?'

ওয়াটার বোটে চেপে স্যান মার্কো পৌঁছে গেলাম। স্যান মার্কো!

আকাশছোঁয়া ক্যাথিড্রাল যেন চিরনবীনই থেকে যায়, আর সেই বিখ্যাত পিয়াৎজা, আর হাজার হাজার পায়রা পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়ায়। আমি গীতাকে বললাম: তুমি ঘোরো, বেড়াও, যা দেখবার দেখো, আর আমি একা একা নিজের মনে সেই ১৯৭২ সালের ২ সেপ্টেম্বরের কথা ভাবব, ভাবব সেই সময়টাকে— স্যান মার্কোমুখী ভিড়ে ঠাসা ওয়াটার বাসগুলো ছুটে চলেছে চিরকালীন অপেরা হাউসের দিকে, 'লা ফেনিচে'-এর বিখ্যাত অপেরা হাউসে, যেখানে মানুষ আর মানুষ, যেখানে তেত্রিশতম চলচ্চিত্র উৎসবের অন্তিম দিনে আসছেন চার্লি চ্যাপলিন, বয়স বিরাশি, চ্যাপলিনের দু'সপ্তাহব্যাপী রেট্রোস্পেকটিভ— *Il Tutto Chaplin*— আগাগোড়া চ্যাপলিন। শুধুই চ্যাপলিন আর চ্যাপলিন, আমি দেখেই চলেছি ছবির পর ছবি— 'the conception of the average man. of

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

almost any man, of myself... of Monsieur Verdoux, the man who was charged with twelve murders: 'one murder making a villain, millions a hero. Numbers sanctify!'

অপেরা হাউসটি লোকে লোকারণ্য। আর আমরা গুটিকয়েক মানুষ যারা ফেস্টিভালে টুকিটাকি যেসব পুরস্কার পেয়েছিলাম, তাই নিয়ে বসেছিলাম সেই অসাধারণ মঞ্চের এক কোণে। চার্লি চ্যাপলিনের জন্য রয়েছে পুরো মঞ্চটাই আমাদের জন্যে কিঞ্চিৎ জায়গা ছেড়ে। আমরা কয়েকজন ভাগ্যবান। সত্যিই ভাগ্যবান... তিনি আসছেন, দু'পাশে দু'জন। তিনি আসছেন কিন্তু হাঁটছেন হাঁটতে হবে বলে। মঞ্চে উঠলেন, দু'পাশে দু'জন। অসীম ধৈর্য নিয়ে, অনন্ত বিশ্বাস নিয়ে তিনি এলেন, দু'পাশে সেই দু'জন।

সবাই উঠে দাঁড়াল। তারই সঙ্গে চলল হাততালি। আর তিনি স্থির দাঁড়িয়ে। আটোসাঁটো কোট নেই, হাতে লাঠি নেই, সেই ব্যবহার, সেই হুড়োহুড়ি, হাঁটাচলা, ছবির সেসব কিছুই নেই।

...তিনি মঞ্চের মাঝখানে। চারিদিকে উচ্ছ্বাস, উল্লাস আর করতালি। আর তিনি মঞ্চের মাঝখানে। চুপচাপ। দর্শকের শোরগোল চলল মিনিট পাঁচেক ধরে। ...আর তিনি যেন একটু নড়ে চড়ে নিলেন, হাত তুললেন কিছুটা কষ্টেই হয়তো। হাত তুললেন দর্শকের উদ্দেশ্যেই কয়েকটা চুম্বন উড়িয়ে দিতে।

পর্দা নেমে গেল। আর তিনি... তাঁর চেয়ারে ভেঙে পড়লেন। কিছুদিন বাদে একদিন বললেন, 'I'll never be able to retire because ideas just keep popping into my head.'

আরও পরে, কিছু পরে, বললেন, 'When I go, I go...'

আমরা যারা দু' সপ্তাহ ধরে ওঁর সমস্ত ছবি দেখছিলাম, সত্যি বলতে কী, চিনতে পারিনি প্রথমে, মঞ্চে আর পর্দায় এত তফাত!

টানা যে দু' সপ্তাহ ছবি দেখেছিলাম তাঁর, সেখানে 'গ্রেট ডিক্টেটর'ও ছিল, আর দর্শক হাসছিলও খুব। ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে মুসোলিনিকে নিয়ে হাসিঠাট্টা, হাজার হোক ইতালির জাতীয় হিরো বলে কথা! কমবয়সিরা কী করে চ্যাপলিনের এ-ছবিটাকে এত সহজে নিচ্ছে, আমার এ-খটকার উত্তর দিলেন এক জার্মান সমালোচক: 'খুব সহজ কারণ, মুসোলিনি যুদ্ধে হেরে গিয়েছিলেন।' ৭২-এর ভেনিস ফেস্টিভাল— এই '৯২-এর ভেনিস ফেস্টিভালে এসে বড়

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বেশি মনে পড়ে যাচ্ছিল। শুধু চ্যাপলিনের জন্যেই। তাঁর সম্পর্কে ফেলিনির মন্তব্য মনে পড়ে যাচ্ছিল: '(He was) a sort of Adam, from whom we are all descended'। ঘন্টাখানেক পর লিডো-র হোটেলে ফিরে গীতাকে বললাম, 'তুমি যখন স্যান মার্কোতে চিত্রকরদের ছবি দেখে আশ্চর্য হচ্ছিলে, আমি তখন স্মৃতির সরণি বেয়ে চ্যাপলিনের শতবর্ষ উদ্‌যাপন করছিলাম মনে মনে।'

১৯৮৯, চ্যাপলিনের শতবর্ষ। গোটা পৃথিবী চ্যাপলিন নিয়ে মেতে উঠল। কান চলচ্চিত্র উৎসবে প্রথম দিনের অনুষ্ঠানেও। অনেকের সঙ্গে আমিও সেদিন নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম। অসাধারণ অনুষ্ঠান, মাত্র পাঁচ মিনিটের অনুষ্ঠান। জিল জ্যাকব বললেন: মৃণাল, অনেকেই লিখছেন। তোমাকেও লিখতে হবে। হবেই। অগত্যা...

> The splendour was splendid, as always. The *Grande Salle* was packed to the hilt but not brimming over. There were the luminaries, semi-luminaries and the invitees coming from all over the world. Not a single seat was empty, not a single person was standing except the ushers, smiling.
>
> Music was not too loud, not too low either, made especially for the 42nd edition of the festival—the signature tune.
>
> The curtain was slowly raised, and what the stage revealed was a huge cut-out of Charlie who, having escaped the notice of the wily cops, was peeping from behind a wall. Behind his back was the 5-year old Jackie Coogan, *The Kid*, (1920), hiding and watching the large family of Chaplin in the middle of the sprawling stage. They were about twenty or more, looking normal, conscious, also stiff. They were Chaplin's children, some with their spouses, some singles, grandchildren too and, may be, two or three from the next generation. All but one: Chaplin's wife, Oona. Reportedly, she was sick—that was why.

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

The Family looked informal, behaved likewise: a mother breast-feeding her child, a boy scratching his hair, a couple of elders looking casual. In the background it was he, the giant of a man, the eternal tramp and that 5-year old, Jackie, *The Kid*. A sight to see and remember!

Geraldine, the actor-daughter, pulled out the microphone from the stand, spoke for a minute or so, touching on the domesticity of the father. Before she finished, a child slipped down from the mother's flank and crawled to one end of the stage to collect a rubber-ball, which was dropped a little while ago. The child crawled to be picked up by the mother, ball in hand. One of Chaplin's brother spoke for not more than half a minute, and handed over the mike to another. Having had it from one hand to another and yet another and so on, the microphone came to a small boy, hardly 10, who spoke the shortest line without knowing what it really meant. Holding the mike closest to his mouth, he said:

"I declare the festival open."

পর্দা নেমে এল সঙ্গে সঙ্গে। বিশাল প্রেক্ষাগৃহ উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল। মঞ্চে কেউ নেই, পরিত্যক্ত। দেখতে দেখতে পর্দা উঠল। মুহূর্তের মধ্যে বিশাল স্ক্রিনে ফুটে উঠল হিংকেল—ডিক্টেটর—দ্য গ্রেট, হাতে গ্লোব। গ্লোব নিয়ে খেলছে হিংকেল। অদ্ভুত খেলা— অদ্ভুত, উদ্ভট, অস্থির, উদ্দাম। জিলের ভাবনায়, এক মাতাল খেলায় মেতে উঠল হিংকেল। আমার ভাষায়:

...as if in a trance, the dictator plays savagely, laughs gustily, dances furiously, all intensely Chaplinesque, all caught in perfect rhythm. When, thus, 'the world floats into his hand', suddenly the globe pops.

দ্য গ্লোব পপ্‌স্‌!

বিস্ফোরণ—আশ্চর্য এবং ভয়ঙ্কর।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পৃথিবীর তাবৎ মানুষের সুখ-দুঃখ যতই জড়ো হোক চ্যাপলিনের ছবিতে, আশির দশকের শেষের ইতিহাস এক ভয়ংকর ভায়োলেন্স-এর দিকে মোড় নিল। নানা চড়াই উতরাই ডিঙিয়ে বিশেষ এক সময়ে সোবিয়েত রাশিয়ার প্রধান মিখাইল গর্বাচেভ লিখলেন: '...the world slid into a systematic crisis' (*The August Coup*). কত ঘটনাই না ঘটল, কত সংকট সৃষ্টি হল পৃথিবীতে, আশা আর বিশ্বাসের কিছুই থাকল না, দেউলে হয়ে গেল, আদর্শ-মূল্যবোধ-নীতি-বিপ্লব— সবই প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেল। দেখা গেল লেনিনের মূর্তি উপড়ে ফেলা হল, ভেঙে ফেলা হল পূর্ব আর পশ্চিম জার্মানির মধ্যবর্তী দেওয়াল। পূর্ব ইউরোপের তথাকথিত গণতন্ত্র ধরাশায়ী হয়ে পড়ল। চারিদিকে অশান্তি, চারিদিক উত্তপ্ত।

এরই মধ্যে একদিন অভিনেতা অঞ্জন দত্ত একটি নাটক লিখে আমাকে পড়তে দিয়ে গেল। বলে গেল, যদি পারেন তো পড়বেন। আমি পড়লাম, ভাল লাগল, বারবার কয়েকবার পড়লাম। পরের পরের দিনই অঞ্জন আর একবার এল, দিয়ে গেল নাটকটার একটা ছোটখাটো নোট। ইংরেজিতে। পড়লাম। আর কিছুটা মাজাঘষা করে দাঁড় করালাম আমারই জন্যে। এবং অবশ্যই অঞ্জনের জন্যেও। দুইয়ের লেখা আর মেরামত করা নোটটা যা দাঁড়াল তা হল এইরকম:

> Tucked away at the end of a lane, it all happens in a middle class home. It is about a family, not too large, not small either, but a family thrown into uneasy chaos. Living under the same roof, strangely, all are hopeless strangers. All are left to themselves, all preserving their own stories, their agonies, their secrets, and their failings. A family, condemned in many ways. The second son was killed in a Police-Naxalite encounter eighteen years ago. Ten years later, leaving his young wife and a child, the eldest son died of sudden illness. The third ran away to Germany with a petty job in a bid to break the clandestine affair with his sister-in-law. The youngest, bitter and cy[illegible] was yet to find his place in the s[illegible]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আমি আর অঞ্জন দু'-তিনবার লেখালেখি করে ব্যাপারটাকে দাঁড় করালাম। সেখানে চরিত্রগুলো সবাই সবাইকে প্রশ্ন করে, সবাই সবাইয়ের ওপর দোষ চাপিয়ে দেয়, কোনও জবাব নেই কোনও দিক থেকেই। তবু আমরা দু'জনেই উত্তেজিত।

কোথায়ও সাড়া জাগাতে পারল না ছবিটি। যা পেলাম, যতটুকু, শুধু জার্মানিতেই।

ছবির নাম, 'মহাপৃথিবী', বাইরে, দেশের বাইরে, 'World within, world without'.

রীতা জুৎসি, এক বিশিষ্ট মহিলা, আমার পরিচিত, পড়ান লন্ডনের এক স্কুলে। সাদাত হাসান মানটোর ভক্ত পাঠিকা ভদ্রমহিলাটি। একদিন তিনি এক গল্প শোনালেন আমাকে। গল্পই, বড় নয়। গল্পটির জাত আলাদা, না বলে দিলে চেনার উপায় নেই বিষয়টি মানটোর। নাম 'বাদ্‌সাহাৎ কা খত্‌মা'— 'Kingdom's End.'

রীতা বলল সে গল্পটাকে নিয়ে কিছুটা, সামান্যই, ওলোট পালট করেছে। একটা বড়সড় ছবি করা যায় না? আমি বলি, হয়তো না, তবে ছোটখাটো রেডিয়ো প্লে হওয়া সম্ভব, বেশ ভাল।...

বছর দু'-এক বাদে। ওই গল্পটা নিয়েই অনেক কিছু পালটে নতুন কিছু করা হয়তো সম্ভব। লিখতে গিয়ে বুঝলাম যে রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর সমর্থন চাই। চিত্রনাট্য তৈরি করলাম দুটোতে মিলিয়ে। ছবির লেখক-নায়ক এক পুরনো বিশাল প্রাসাদোপম বাড়িতে কয়েকদিনের জন্য গেছে— যদি সেই সুযোগে কিছু লেখার বিষয়বস্তু খুঁজে পাওয়া যায়। ওই পুরনো বাড়িতে যেন ক্ষুধিত পাষাণের গল্প আছে। অতীতের স্মৃতি জড়িয়ে আছে, আবার টেলিফোনও আছে বর্তমানের সঙ্গে সংযোগের। সেই টেলিফোন বাজেও গভীর রাতে, শোনা যায় এক নারী কণ্ঠস্বর। ক্ষুধিত পাষাণের কাহিনির মতো এই নারীও অনেকটা বন্দিনী। ভেতরটা খাঁ খাঁ করে। অথচ, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, যেখানে হতে পারে 'অসীম ঐশ্বর্য, অনন্ত কারাগার।' লেখক অতীত বর্তমান খুঁজে একই কাহিনির সূত্র পায়।

টেলিফোনে জানা যায়, যেন ইঙ্গিতেই বোঝা যায়, সবই সেই গভীর রাতে। দু'জনেই দু'জনকে চেনে না, জানে না, একজন বলে, অন্যজন শোনে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আবার দু'জনেই বলে। এইভাবেই দু'জনের ফোনে শব্দের খেলা আর কথার খেলা চলতে চলতে একদিন শেষ হয়ে যায়। একই ট্রেনে ওঠা-নামা করে দু'জন, তবু কারও সঙ্গে মুখোমুখি কথা হয় না, চিনেও চিনতে চায় না একে অপরকে। যেন কোনও নির্দিষ্ট নারী নয়, নির্দিষ্ট লেখকও নয়। খেলা শেষ পর্যন্ত শেষ হয়ে যায়। জীবন চলতে শুরু করে, ব্যথা ও কামনা সবই যেন চলছে সমানে। ওদের একজন বিষয়দাত্রী, অন্যজন বিষয়গ্রহীতা— দু'জনেই স্রষ্টা।

ছবির নাম 'অন্তরীণ' এবং দু'জনকে নিয়েই ছবি। কখনও কথা, কখনও বা দু'জনেই নির্বাক। রহস্যময়তা ঘিরে চারিদিকে।

ব্যবসা স্বভাবতই হয়নি, কিন্তু প্রশংসা কুড়িয়েছে।

ছবির পর ছবি করে গিয়েছি, এক আধবার একটু আধটু দেরি হয়েছে বা। এক-দেড় বছরের মতো। কিন্তু হঠাৎ মাঝে মাঝে লম্বা লম্বা থামা কেন? জানি না কেন, শুধু জানি, আমাকে ছবি করতে হবে। চ্যাপলিনের কথাটা মনে পড়ে যায়: To work is to live, and I love to live.

দেখা যাক!

আবার সেই অযোধ্যা কাণ্ড, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা। এলোপাথাড়ি গোলমাল। কার্গিলেও। মনে হল এই বুঝি কিছু ঘটল! কার্গিলের হই হুল্লোড় যখন চলছে দুটো দেশের মধ্যে, দু'দেশেই যখন নিউক্লিয়ার বোমার তোড়জোড় চলছে, তখন আমি একবার দিল্লিতে গিয়েছিলাম বিশেষ এক কাজে। সন্ধেবেলায় হোটেলে একা বসে আছি, টেলিভিশন দেখছিলাম একা একা। দেখি, এক টিভি সাংবাদিক, ভারতীয়, সবজিবাজারে ঘুরতে ঘুরতে এসে দাঁড়াল সবজিওয়ালার কাছে। ইসলামাবাদী সবজিওয়ালার কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই, বিক্রিবাটায় মন তার। ক্যামেরাটাকে পেছন থেকে ধরেছে ক্যামেরাম্যান। পেছন থেকেই ক্যামেরা চালাতে হবে, কারণ সামনে-ডাইনে-বাঁয়ে কেনাকাটায় ব্যস্ত লোকজন। ঘাড় উঁচিয়ে সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করে: এই যে যুদ্ধ হই হুল্লোড়, কেমন লাগছে এসব? সবজিওয়ালাটি পেছনে তাকাল, ঘাড় তুলল, সাংবাদিকের চোখে চোখ একবার রাখল, তারপর বেচাকেনার ব্যস্ততার মধ্যে থেকে ছোট্ট করে বলল: 'নুকসান!' (অর্থাৎ 'লোকসান')। আর একটা কথাও নয়। কাজে মন দিল যেমন দিচ্ছিল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কথাটা শুনে আমি চমকে উঠলাম। কে এই লোকটা? কে বলল কথাটা? কে আবার, ফুটপাথের এক সবজিওয়ালা! তুচ্ছ, ফালতু! একটা তুড়ি মেরে ইতিহাস যাকে উড়িয়ে দিতে জানে। ইতিহাসের কথা যে লোকটা আবার ভাবতেও নারাজ।

ভাবি, কার্গিল সীমান্ত ডিঙিয়ে যদি ওপারের বা এপারের বাজারে ঢুকে পড়ি, আর কোনও সবজিওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করি, অথবা অন্য কাউকে, মামুলি অবান্তর এমন কাউকে, যদি যুদ্ধের প্রসঙ্গ তুলি, সেও কী ওই একই কথা বলবে, না অন্য কিছু!

দস্তয়েভস্কির একটা কথা মনে পড়ল: মানুষ সর্বত্রই মানুষ।

ভাবি, মানুষের কথাই বলি।

'অন্তরীণ' হয়েছিল বছর সাতেক আগে। সাত বছর পরে নতুন এক ভাবনা আমাকে পেয়ে বসে। বয়সে আমার চেয়ে ঢের ছোট, নাম আফসার আমেদ, তারই লেখা-এক উপন্যাস। লেখকের দেওয়া নাম পালটে আমি নাম দিলাম 'আমার ভুবন'। গ্রামের নাম নেই, হাজার গ্রামের একটি গ্রাম। আমার নামে তোমার নামে কোনও ফারাক আছে কি? নেই।

কথায় কথায় 'আমার ভুবন':

পৃথিবী ভাঙছে
পুড়ছে
ছিন্নভিন্ন হচ্ছে

তবু মানুষ বেঁচে বর্তে থাকে
মমত্বে
ভালবাসায়
সহমর্মিতায়

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কথামুখ:

> When bigotry, vulgarity and unending violence spread in mad fury, the film moves away from the abyss of despair and walks quietly into a tranquil village. True, the unceasing toil in the day-to-day life of the villagers is gruelling, yet there is magic in their living. Three among them play key roles— two men, closely related, and a woman, divorced and remarried, With no flash-backs, no dramatics with ups and downs of their past, the film captures the instant present and brings into focus the loves among the three, with no malice against anyone.

ছবির মূল চরিত্র তিনটি: নুর, মেহের, সখিনা। 'আমার ভুবন' আমার শেষ ছবি। লোকে তাই বলে। হয়তো তাই, কিংবা...।

কায়রো চলচ্চিত্র উৎসবে আমার জুটল শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার। আর নন্দিতা দাস (সখিনা) পেল শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর উপহার।

পরের দিনই আমি ফিরে এলাম আমার শহরে, কলকাতায়।

খবরে প্রকাশ, চার্লি চ্যাপলিনের নাতনি কলকাতায়। ছোটখাটো এক ছবিতে অভিনয় করবে, শহরে নিয়ে এসেছে এক ভারতীয় পরিচালিকা, লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে এসেছে। কী ছবি আমি জানি না, জানার ইচ্ছেও নেই। তবে চ্যাপলিনের নাতনি বলেই জানতে ইচ্ছে করছে। কী নাম জিজ্ঞাসা করলাম এক ফটোগ্রাফারকে, তার নাম অরণ্য সেন। নাম জানে না, তবে চাইলে নিয়ে আসতে পারে। বেশ তো! একদিন এল অরণ্যর সঙ্গে। ঘরে ঢুকেই দেখল দেয়ালে আঁটা চ্যাপলিনের এক লম্বা ছবি। সেই ভবঘুরে দাদুর ছবি। বইয়ের র‍্যাক থেকে নামিয়ে চ্যাপলিনের একটা ভারী বই নাড়াচাড়া করতে করতে দু'-চারটে ফ্যামিলি গ্রুপের ছবি দেখালাম নাতনিকে পাশে বসিয়ে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'চেনো?' মেয়েটি হাসছে। 'তোমার বাবা কী ইউজিন, না, ক্রিস্টোফার', আমি জিজ্ঞাসা করলাম। মেয়েটি খিল খিল করে হেসে উঠল।

শুরুতেই অবশ্য ঘরে ঢুকেই [illegible] দেওয়ালে আঁটা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

চ্যাপলিনের ছবিটা দেখে একগাল হেসে বলল, 'এই ছবিটা কি আমার জন্য?' আমি বললাম, 'আমার জন্য, যে এখানে আসে তার জন্য।' তারপর একটু থেমে বললাম, 'He is for the world and will remain so for ages, for eternity.'

বাড়িতে ডাক্তার এসেছে। গীতার শরীরটা ভাল নয়। কুণাল ও নিশা প্রতি সপ্তাহে ফোন করে। খবর নেয়। নতুন কিছু বলার না থাকলেও ফোন করে। ই-মেল আসে। ঘন ঘন আসে। জীবন যেরকম গতিতে চলে সেরকমই চলতে থাকে।

দূরে থেকেও সবাই আমরা কাছাকাছি। চারজনেই।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শে ষ অ ধ্যা য়

সময় গড়িয়ে চলেছে। সেকালটা ফেলে এসেছি বহুদিন, আর একালটা ডিঙিয়ে চলেছি বছর বছর, আমরা চারজনেই। গীতার চেয়ে আমি বছর সাতেকের বড়, কুণাল নিশার চেয়ে কয়েক মাসের ছোট। আজ থেকে তিরিশ বছর ডিঙিয়ে গিয়েছিল ওরা। যখন ওদের বিয়ে হয়েছিল। কুণাল-নিশার বয়সের ফারাকটাকে জানতে পেরে, তা যে ক'মাসেরই হোক না কেন, তখন প্রাচীনপন্থী আত্মীয়স্বজনেরা এঁর ওঁর দিকে তাকান, মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেন, কেউ বা বলেন, 'তাই কি!' আমরা চারজনেই হেসে উঠি। এখন আর এসবে কেউ নেই, তিরিশ বছর পরে। বয়সের ধার ধারে না কেউই।

আমি জিজ্ঞাসা করি, 'সপ্তাহান্তে ফোন যে করতেই হবে একবার, কখনও বা দু'বার, তিনবারও বা, ভাল লাগে দু'পক্ষেরই, কিন্তু এত কেন!' ওরা হাসে দু'জনেই। হ্যাঁ ঠিকই, বয়স আমাদের দু'জনেরই হচ্ছে, সেই কবে থেকে! তাই বলে কী হঠাৎ কিছু ঘটে যাবে? তা ছাড়া, যা লিখে চলেছি, একটা হিল্লে তো হতেই হবে! আত্মজীবনী বা আত্মস্মৃতি যাই বলি না কেন, শেষ হলে তবেই না মুক্তি, আগে নয়। না, ঠিক তাও নয়, তেমন করে তো আর লিখছি না, লিখছি, লিখেই চলেছি, যখন যেমন মাথায় আসে, যেমন চলে কলম, সামথিং লাইক অটোবায়োগ্রাফি। ঠিক তাও নয়। ঠিক তো?

কুণাল বলে, 'ই-মেল'-এ লেখে, 'ঠিকই! কিন্তু একটা কথা বলি, কথাটা মনে রেখো স্মৃতিকে কখনও চোখ বুজে বিশ্বাস কোরো না।' আগেও বলেছিল, মাঝেমধ্যে বলেও বা, কি জানি হঠাৎ হঠাৎ উলটোপালটা বলে বসি যদি।

আমি বলি, 'ভয় পাইয়ে দিচ্ছিস না কি?'

কুণাল বলে, 'একেবারেই নয়। তবে, স্মৃতি আসলে রিকনস্ট্রাকশন র‍্যাদার দান বিইং ফোটোগ্রাফিক।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

বুঝি, কথাটা বেঠিক না। তবু হোক না অগোছালো, হোক অস্পষ্ট, নিজের স্মৃতিগুলি মনে করে রাখছি আয়াসহীনভাবে, অনেকটা আবছা আলোর মতো, ছেঁড়া ছেঁড়া স্মৃতির পুঞ্জ। আর তাই লিখে চলেছি— সামথিং লাইক অটোবায়োগ্রাফি।

আমি ভাবি, এইসব ছেড়েছুড়ে অতীতে ফিরে যাই না কেন! ইতিহাসে। আমার শেষ কথায়। আপাতত।

নানা তর্ক, নানা বিতর্ক, মন কষাকষি এবং শেষাশেষি আইনের শাসনে সাব্যস্ত হল সিনেমার আদিপুরুষ ফ্রান্সের লুই লুমিয়ের ও তাঁর ছোট ভাই অগাস্ত। শুনি, তাঁরা সেদিন অতশত ভাবেননি। তাঁদের কাছে— বিশেষ করে লুই লুমিয়ের— তাঁর কাছে ব্যাপারটা শুধুই 'সায়েন্টিফিক কিউরিওসিটি' হয়েই ছিল, তার বেশি কিছু না। এমনি করে যখন অননুকরণীয় শিল্পমাধ্যম হয়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিল এবং সাড়া পড়ে গেল এদিকে সেদিকে, লুই তখন স্থিরনিশ্চয় হয়ে বললেন, 'I now see that the cinema amuses the entire world.' আরও বললেন, 'What better thing could we have done... and could have given us more pride.'

লুইয়ের মাথা থেকে আরও অনেক কিছু বেরল এবং অন্যান্য দেশ থেকেও নিত্যনতুন ছোটবড় ঘটনা ঘটতে শুরু করল। দিন দিন নানা হাতে পড়ে সিনেমা বাস্তবিকই ম্যাচিওরিটি পেল এবং সঙ্গে সঙ্গে সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠল। এইভাবে ক্রমাগত পট-পরিবর্তনে, নান্দনিক উৎকর্ষ, সিনেমামনস্কতার বহুরূপী সাজে বিশিষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল সেই ইতিহাস। এমনি সময়ে এক বিশেষ মুহূর্তে একশো বছরের মুখে দাঁড়িয়ে ইউনেস্কোর প্রধান ফেডেরিকো মাইয়র প্যারিসে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক সমাবেশে ঘোষণা করলেন, 'Emerging as it does in painting, theatre, music, literature and photography, the art of the cinema, which was invented in 1895, is the custodian of the memory of the twentieth Century.'

সেদিন, ১৯৯৩-এর ২ নভেম্বর, ইউনেস্কোর সভাঘরে আমি উপস্থিত ছিলাম। মাইয়রের মুখে কথাটা শুনে আমি চমকে উঠলাম। আর সত্যিই, চমকে ওঠার মতোই কথা— বিংশ শতাব্দীর স্মৃতিপঞ্জি। সঙ্গে সঙ্গে যেন গোটা একশো বছর হাজার লক্ষ টুকরো হয়ে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল—

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অজস্র ছবি, নিত্যনতুন সৃষ্টির উদ্ভাবন, সীমানা গড়া আবার ভাঙা গড়া— অবিশ্রান্ত!

সেদিন ইউনেস্কো-র সভাঘরে ফেডেরিকো মাইয়র বললেন যে, সিনেমা যেমন উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে নতুন থেকে নতুনতর হয়ে অসামান্য বেনিয়মের খেলায় মাতোয়ারা হয়ে, অন্যদিকে ছবি ও শব্দের সর্বনাশ হবে যদি না বিশেষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে, অতি যত্নের সঙ্গে আগলে রাখা যায়। বললেন, 'a matter of pride for cinema's march to infinite and also, in the absence of proper scientific conservation in a large number of cases, a matter of grave concern.'

আমি যেমন ছিলাম সেদিন, ছিল আমার আরও কয়েকজন বন্ধু— ইউসুফ শাহিন (মিশর), আঁদ্রে ডেলভো (বেলজিয়াম), জঁ রুশ্ (ফ্রান্স), ফার্নান্দো সোলানাস (আর্জেন্টিনা), মিশেল পিকোলি (ফ্রান্স) এবং আরও দু'-একজন। ওরা যখন জানতে পারল যে আমার বেশ কিছু ছবি যত্নের অভাবে নষ্ট হওয়ার মুখে, তাদেরও আদৌ ভাল লাগছিল না। আমি বললাম এবং ওরাও জানে যে মেরামত করাটা, যদি অবশ্য করা যায়, মোটেই সহজ নয়। প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। তবু চেষ্টা চালাচ্ছি। দেখা যাক। ব্যাপারটা যে শুধু আমারই তা তো নয়, অনেকের।

অন্য একদিনের কথা। ১৮৯৫, ১৯ মার্চ। অর্থাৎ যেদিন ভাইকে সঙ্গে নিয়ে লুই লুমিয়ের প্রথম শটটি নিলেন।

শটটি নেওয়া হল ফ্রান্স-এর এক শহর— লিয়ঁ— সেই শহরে। ছোট্ট এক কারখানা, শ্রমিকের সংখ্যা বেশি নয়, ছুটি হতেই বেরিয়ে পড়ে শ্রমিকেরা। লুই তাঁর সেই হাতে ঘোরানো ক্যামেরা নিয়ে দাঁড়ালেন। ছবি তোলা হল। সিনেমার প্রথম শট, প্রথম ছবি।

আমিও নিমন্ত্রিত সেখানে, সেই অনুষ্ঠানে, ১৯ মার্চ, ১৯৯৫-এ, সিনেমার জন্মের ঠিক একশো বছর পরে। নিমন্ত্রিতের সংখ্যা আমাকে নিয়ে জনা তিরিশেক চিত্রপরিচালক। পৃথিবীর নানা অঞ্চল থেকে এক-আধজন করে। এদেশ থেকে আমি একাই। নিমন্ত্রণকর্তা বারট্র্যান্ড ট্যাভারনিয়ার।

আজ একশো বছর পরে কারখানার কোনও অস্তিত্ব নেই, থাকার কথাও নয়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তবে, সেই হাতে ঘোরানো ক্যামেরা তখনও বর্তমান, যেমন রয়েছে আরও অনেক কিছু, অগুনতি ছবিসহ। সবই অতি যত্নে রাখা হয়েছে, Institute of Lumière-এ।

কারখানা নেই, কিন্তু সামিয়ানা দিয়ে ছোট একটা কারখানার মতো বানানো হয়েছে বড়সড় এক ঘেরাটোপ। কারখানার দরজা বলতে যা বুঝি, সেই দরজার বাইরে কর্তাব্যক্তিরা। আর ফ্রান্স-এর সংস্কৃতিমন্ত্রী, এসেছেন প্যারিস থেকে। সামনে প্রশস্ত পার্ক, পার্কের ওপারে বিস্তর সমাবেশ। যারা ক্যামেরা নিয়ে এসেছে, তারা ঠেলেঠুলে সামনে জায়গা করে নিয়েছে। স্ট্যান্ডে হাতে ঘোরানো ক্যামেরা শক্ত করে বসিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে আছে লুই লুমিয়ের-এর নাতি। সে তৈরি দাদুর ক্যামেরায় ছবি তুলবে।

কার ছবি? দাদুর শ্রমিকদের ছবি, তিরিশজন শ্রমিক। নিমন্ত্রিত যাঁরা। তাঁরা মানে আমরা। যাঁদের ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে 'কারখানা'-র ভেতরে। যাঁরা তিরিশজনই পুরস্কৃত, প্রত্যেককেই স্মারক দেওয়া হল, বলা হল সিনেমার আদিপুরুষের উত্তরাধিকারী আমরা।

সবাই তৈরি নিজ নিজ কাজে। সংস্কৃতিমন্ত্রী হাঁকলেন, 'স্টার্ট!' শ্রমিকেরা বেরিয়ে এল, আর পার্কের বাইরেকার ক্যামেরাওয়ালারা স্থির দাঁড়িয়ে রইল।

তিরিশজন শ্রমিক মাঠে নেমে পড়ল, যে যেমন বুঝল ক্যামেরার দিকে এগিয়ে চলল। আর আমি লম্বা লম্বা পায়ে সবাইকে ডিঙিয়ে চলেছি সেই নাতির দিকে।

একটা টান পড়ল পেছন থেকে। তাকিয়ে দেখি এক বৃদ্ধ, খুবই বৃদ্ধ, এক চোখে ঠুলিপরা, চক্ষুবিশেষজ্ঞর ভাষায় যাকে বোধকরি বলা হয়: অক্লুডার।

অক্লুডার-পরা বৃদ্ধ বললেন, 'Hey, you walk like a rabbit!'

'তাই বুঝি!' আমি বলি, 'আমি এইভাবে শ্মশান পর্যন্ত যেতে পারি। হেঁটে হেঁটেই।'

পরের দিন হলিউডের সেই নিমন্ত্রণ পাওয়া বৃদ্ধের সঙ্গে আবার দেখা হল। হোটেলের কফি শপ-এ। জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার বয়সটা কত হে?' আমি বলি, 'বলব? শুনতে চান? I am one year younger than what I'll be next year.'

হাসলেন না, হাসির কথা নয় বলেই হয়তো, একটা কথাও বললেন না, শুধু দেখলাম এক-চোখো বৃদ্ধের চোখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

বয়স হচ্ছে, বয়স বাড়ছে, বেড়েই চলেছে— আমার আর, গীতার, দু'জনেরই। অক্লুডার-পরা বৃদ্ধ তো বুড়ো হয়েই রয়েছেন। আর কত দিন বাড়বেন আমার জানা নেই।

কিন্তু শেষ কথা না বললে আমার কথকতার শেষ হয় না। তাঁদের বয়সের বিস্তর ফারাক যদিও মানতে নারাজ দু'জনেই। উনা তো বটেই। উনার চোখে চার্লির বয়স বাড়ে না, প্রতিদিনই যেন কমতির মুখে। তবু জীবনের স্বাভাবিক নিয়মেই পরিষ্কার বোঝা গেল যে জরা চ্যাপলিনকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে নিচ্ছে। শেষের দিকে দেখা গেল কেউই তেমন কথা বলছেন না। শুধু কাছে কাছে বসা, ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপচাপ বসে থাকা, হাতে হাত রেখে নিজেদের মধ্যে গুটিয়ে যাওয়া। বাবার সম্পর্কে সেসব দিনের কথা বলতে গিয়ে তাঁদের এক ছেলে লিখল, 'She (উনা) is able to share that strange solitude of his.'

অফুরন্ত? অবিশ্রান্ত? না কি এই শেষ? কে বলবে সেই কথা! অথচ কত সহজ করেই না চ্যাপলিন বলেছিলেন: 'When I go, I go!'

আর আমি? কে আমি? কোথাকার কে? ক'টা মানুষ জানে আমাকে, কে-ই বা ভাবে আমাকে নিয়ে?

তবু কুণাল-নিশার ই-মেল থেমে থাকে না। আর কুণাল তো একদিন বলে বসল, ই-মেল লিখল:

তুমি আর ছবি করবে না?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পরিচালক মৃণাল সেন-এর নির্মাণপঞ্জি

[ছবি মুক্তির বছরের অনুক্রমে]

চলচ্চিত্র

১৯৫৫ **রাতভোর** (বাংলা/সাদা কালো)
কাহিনি : স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়
চিত্রনাটক : মৃণাল সেন
সংগীত : সলিল চৌধুরী
অভিনয় : উত্তমকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, শোভা সেন।

১৯৫৯ **নীল আকাশের নীচে** (বাংলা/সাদা কালো)
কাহিনি : মহাদেবী ভার্মা
চিত্রনাটক : মৃণাল সেন
সংগীত : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
অভিনয় : কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, মঞ্জু দে, স্মৃতিরেখা বিশ্বাস, বিকাশ রায়, সুরুচি সেনগুপ্ত।

১৯৬০ **বাইশে শ্রাবণ** (বাংলা/সাদা কালো)
কাহিনি : কানাই বসু
চিত্রনাটক : মৃণাল সেন
সংগীত : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
অভিনয় : মাধবী মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, উমানাথ ভট্টাচার্য, অনুপকুমার।

১৯৬১ **পুনশ্চ** (বাংলা/সাদা কালো)
কাহিনি : আশীষ বর্মন
চিত্রনাটক : মৃণাল সেন
সংগীত : সমরেশ রায়
অভিনয় : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, কণিকা মজুমদার, এন বিশ্বনাথন, পাহাড়ী সান্যাল, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, শেফালি বন্দ্যোপাধ্যায়।
পুরস্কার : জাতীয় পুরস্কার—তৃতীয় শ্রেষ্ঠ কাহিনিচিত্র।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৯৬৩ **অবশেষে** (বাংলা/সাদা কালো)

কাহিনি : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

চিত্রনাটক : মৃণাল সেন

সংগীত : রবীন চট্টোপাধ্যায়

অভিনয় : সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অসিতবরণ, উৎপল দত্ত, রবি ঘোষ, বিকাশ রায়, সুলতা চৌধুরী, পাহাড়ী সান্যাল, ছায়াদেবী, অনুপকুমার, তরুণকুমার।

১৯৬৪ **প্রতিনিধি** (বাংলা/সাদা কালো)

কাহিনি : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

চিত্রনাটক : মৃণাল সেন

সংগীত : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

অভিনয় : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসেনজিৎ, জহর রায়।

১৯৬৫ **আকাশ কুসুম** (বাংলা/সাদা কালো)

কাহিনি : আশীষ বর্মন

চিত্রনাটক : মৃণাল সেন

সংগীত : সুধীন দাশগুপ্ত

অভিনয় : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা সেন, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, সতী দেবী।

পুরস্কার : জাতীয় পুরস্কার— শ্রেষ্ঠ বাংলা কাহিনিচিত্র।

১৯৬৬ **মাটির মনিশ** (ওড়িয়া/সাদা কালো)

কাহিনি : কালিন্দীচরণ পানিগ্রাহী

চিত্রনাটক : মৃণাল সেন

সংগীত : ভুবনেশ্বর মিশ্র

অভিনয় : প্রশান্ত নন্দা, ভানুমতী, শরৎ পূজারী, দুখিরাম সাঁই, রাম মানিয়া, সুজাতা।

পুরস্কার : জাতীয় পুরস্কার—শ্রেষ্ঠ ওড়িয়া কাহিনিচিত্র।

১৯৬৯ **ভুবন সোম** (হিন্দি/সাদা কালো)

কাহিনি : বনফুল

চিত্রনাটক : মৃণাল সেন

সংগীত : বিজয় রাঘব রাও

অভিনয় : উৎপল দত্ত, সুহাসিনী মুলে, শেখর চট্টোপাধ্যায়, সাধু মেহের, রোচক পণ্ডিত, পূণ্যদাস।

পুরস্কার : জাতীয় পুরস্কার—শ্রেষ্ঠ কাহিনিচিত্র
" —শ্রেষ্ঠ পরিচালক
" —শ্রেষ্ঠ অভিনেতা (উৎপল দত্ত)।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৯৭০ **ইচ্ছাপূরণ** (বাংলা/সাদা কালো)
কাহিনি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
চিত্রনাটক : মৃণাল সেন
সংগীত : অলোকনাথ দে
অভিনয় : শেখর চট্টোপাধ্যায়, সুরজিৎ নন্দী, শোভা সেন, নিমাই ঘোষ, সাধু মেহের, কেয়া চক্রবর্তী, মণিকা রায়চৌধুরী।

১৯৭০ **ইন্টারভিউ** (বাংলা/সাদা কালো)
কাহিনি : আশীষ বর্মন
চিত্রনাটক : মৃণাল সেন
সংগীত : বিজয় রাঘব রাও
অভিনয় : রঞ্জিত মল্লিক, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, মমতা চট্টোপাধ্যায়, বুলবুল মুখোপাধ্যায়, উমানাথ ভট্টাচার্য।
পুরস্কার : ক্রিটিক্স অ্যাওয়ার্ড—শ্রীলঙ্কা চলচ্চিত্র উৎসব
শ্রেষ্ঠ অভিনেতা (রঞ্জিত মল্লিক)— কার্লোভি ভ্যারি চলচ্চিত্র উৎসব।

১৯৭১ **এক আধুরি কহানি** (হিন্দি/সাদা কালো)
কাহিনি : সুবোধ ঘোষ
চিত্রনাটক : মৃণাল সেন
সংগীত : বিজয় রাঘব রাও
অভিনয় : বিবেক চট্টোপাধ্যায়, আরতি ভট্টাচার্য, উৎপল দত্ত, শেখর চট্টোপাধ্যায়।
পুরস্কার : বিশেষ জুরি পুরস্কার—মানহাইম চলচ্চিত্র উৎসব।

১৯৭২ **কলকাতা ৭১** (বাংলা/সাদা কালো)
কাহিনি : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, সমরেশ বসু, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃণাল সেন।
চিত্রনাটক : মৃণাল সেন
সংগীত : আনন্দশঙ্কর
অভিনয় : রঞ্জিত মল্লিক, সুহাসিনী মুলে, উৎপল দত্ত, দেবরাজ রায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধনা রায়চৌধুরী, মাধবী চক্রবর্তী, সুচেতা রায়, বিনতা রায়, অশোক মুখোপাধ্যায়, গীতা সেন, সুরজিৎ নন্দী, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়।
পুরস্কার : জাতীয় পুরস্কার—দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ কাহিনিচিত্র
" —শ্রেষ্ঠ সিনেম্যাটোগ্রাফি (কে. কে. মহাজন)।

১৯৭৩ **পদাতিক** (বাংলা/সাদা কালো)
কাহিনি : আশীষ বর্মন ও মৃণাল সেন
চিত্রনাটক : মৃণাল সেন, আশীষ বর্মন
সংগীত : আনন্দশঙ্কর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অভিনয় : ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়, সিমি গাড়োয়াল, বিজন ভট্টাচার্য, প্রভাস সরকার, তপন দাশ।
পুরস্কার : জাতীয় পুরস্কার—শ্রেষ্ঠ চিত্রনাটক (মৃণাল সেন, আশীষ বর্মন)।

১৯৭৪ **কোরাস** (বাংলা/সাদা কালো)
কাহিনি : মোহিত চট্টোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস, মৃণাল সেন
চিত্রনাটক : মৃণাল সেন, মোহিত চট্টোপাধ্যায়
সংগীত : আনন্দশঙ্কর
অভিনয় : উৎপল দত্ত, শেখর চট্টোপাধ্যায়, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতা সেন, দিলীপ রায়, রবি ঘোষ, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মল ঘোষ, সুরজিৎ নন্দী।
পুরস্কার : জাতীয় পুরস্কার—শ্রেষ্ঠ কাহিনিচিত্র
" —শ্রেষ্ঠ সংগীত নির্দেশনা (আনন্দশঙ্কর)
রৌপ্য পদক—মস্কো চলচ্চিত্র উৎসব
FIPRESCI পুরস্কার—বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসব।

১৯৭৬ **মৃগয়া** (হিন্দি/রঙিন)
কাহিনি : ভগবতীচরণ পানিগ্রাহী
চিত্রনাটক : মৃণাল সেন, মোহিত চট্টোপাধ্যায়
সংগীত : সলিল চৌধুরী
অভিনয় : মিঠুন চক্রবর্তী, মমতাশঙ্কর, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, সজল রায়চৌধুরী, রেবা রায়চৌধুরী, সাধু মেহের, বব রাইট, অ্যান রাইট।
পুরস্কার : জাতীয় পুরস্কার—শ্রেষ্ঠ কাহিনিচিত্র
" —শ্রেষ্ঠ অভিনেতা (মিঠুন চক্রবর্তী)।

১৯৭৭ **ওকা উড়ি কথা** (তামিল/রঙিন)
কাহিনি : মুন্সী প্রেমচন্দ
চিত্রনাটক : মৃণাল সেন, মোহিত চট্টোপাধ্যায়
সংগীত : বিজয় রাঘব রাও
অভিনয় : বাসুদেব রাও, মমতাশঙ্কর, নারায়ণ রাও।
পুরস্কার : জাতীয় পুরস্কার—শ্রেষ্ঠ তেলুগু কাহিনিচিত্র
বিশেষ জুরি পুরস্কার—কার্লোভি ভ্যারি চলচ্চিত্র উৎসব
বিশেষ পুরস্কার—কার্থেজ চলচ্চিত্র উৎসব।

১৯৮০ **পরশুরাম** (বাংলা/রঙিন)
কাহিনি : মোহিত চট্টোপাধ্যায়, মৃণাল সেন
চিত্রনাটক : মোহিত চট্টোপাধ্যায়, মৃণাল সেন
সংগীত : বি ভি করন্থ
অভিনয় : অরুণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীলা মজুমদার, অশোক মুখোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী, রেবা রায়চৌধুরী, সজল রায়চৌধুরী, জয়ন্ত ভট্টাচার্য।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

পুরস্কার : জাতীয় পুরস্কার—বিশেষ উল্লেখ (শংসাপত্র)
" —শ্রেষ্ঠ অভিনেতা (অরুণ মুখোপাধ্যায়)
রৌপ্য পদক—মস্কো চলচ্চিত্র উৎসব।

১৯৮০ **একদিন প্রতিদিন** (বাংলা/রঙিন)
কাহিনি : অমলেন্দু চক্রবর্তী
চিত্রনাটক : মৃণাল সেন
সংগীত : বি ভি করন্থ
অভিনয় : সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতা সেন, মমতাশঙ্কর, শ্রীলা মজুমদার, তপন দাশ, অরুণ মুখার্জি, কৌশিক সেন, উমানাথ ভট্টাচার্য, গৌতম চক্রবর্তী।
পুরস্কার : জাতীয় পুরস্কার—শ্রেষ্ঠ বাংলা কাহিনিচিত্র
" —শ্রেষ্ঠ পরিচালক
" —শ্রেষ্ঠ সম্পাদনা (গঙ্গাধর নস্কর)।

১৯৮২ **আকালের সন্ধানে** (বাংলা/রঙিন)
কাহিনি : অমলেন্দু চক্রবর্তী
চিত্রনাটক : মৃণাল সেন
সংগীত : সলিল চৌধুরী
অভিনয় : ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়, স্মিতা পাটিল, দীপঙ্কর দে, রাজেন তরফদার, গীতা সেন, দেবিকা মুখোপাধ্যায়, শ্রীলা মজুমদার, রাধামোহন ভট্টাচার্য, প্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায়, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত, রাজা সেন, যিশু দাশগুপ্ত, জোছন দস্তিদার।
পুরস্কার : জাতীয় পুরস্কার—শ্রেষ্ঠ কাহিনিচিত্র
" —শ্রেষ্ঠ পরিচালক
" —শ্রেষ্ঠ চিত্রনাটক
" —শ্রেষ্ঠ সম্পাদনা (গঙ্গাধর নস্কর)
রৌপ্য ভল্লুক —বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসব।

১৯৮২ **চালচিত্র** (বাংলা/রঙিন)
কাহিনি : মৃণাল সেন
চিত্রনাটক : মৃণাল সেন
সংগীত : অলোকনাথ দে
অভিনয় : অঞ্জন দত্ত, উৎপল দত্ত, গীতা সেন, কৌশিক সেন, পূর্ণিমা দত্ত।
[আনুষ্ঠানিক মুক্তি পায়নি, দেশে-বিদেশে নানা উৎসবে প্রদর্শিত]

১৯৮২ **খারিজ** (বাংলা/রঙিন)
কাহিনি : রমাপদ চৌধুরী
চিত্রনাটক : মৃণাল সেন
সংগীত : বি ভি করন্থ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

অভিনয় : অঞ্জন দত্ত, মমতাশঙ্কর, ইন্দ্রনীল মৈত্র, দেবপ্রতিম দাশগুপ্ত, দেবতোষ ঘোষ, নীলোৎপল দে, শ্রীলা মজুমদার, গীতা সেন, বিমল চট্টোপাধ্যায়।

পুরস্কার : জাতীয় পুরস্কার—দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ কাহিনিচিত্র
" —শ্রেষ্ঠ সম্পাদনা (গঙ্গাধর নস্কর)
" —শ্রেষ্ঠ শিল্প নির্দেশনা (নীতিশ রায়)
জুরি পুরস্কার—কান চলচ্চিত্র উৎসব
ব্রোঞ্জ হুগো—শিকাগো চলচ্চিত্র উৎসব
গোল্ডেন স্পাইক—ভ্যাল্লাডয়েড চলচ্চিত্র উৎসব।

১৯৮৩ **খণ্ডহর** (হিন্দি/রঙিন)

কাহিনি : প্রেমেন্দ্র মিত্র
চিত্রনাটক : মৃণাল সেন
সংগীত : ভাস্কর চন্দভারকর
অভিনয় : শাবানা আজমি, নাসিরুদ্দিন শা, পঙ্কজ কপূর, অন্নু কপূর, রাজেন তরফদার, গীতা সেন, শ্রীলা মজুমদার।
পুরস্কার : জাতীয় পুরস্কার—শ্রেষ্ঠ পরিচালক
" —শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী (শাবানা আজমি)
" —শ্রেষ্ঠ সম্পাদনা (মৃন্ময় চক্রবর্তী)
গোল্ডেন হুগো—শিকাগো চলচ্চিত্র উৎসব
রৌপ্য পদক —মন্ট্রিয়ল চলচ্চিত্র উৎসব
ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম গাইড-এ বছরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি হিসেবে বিবেচিত।

১৯৮৬ **জেনেসিস** (হিন্দি/রঙিন)

কাহিনি : সমরেশ বসু
চিত্রনাটক : মৃণাল সেন
সংগীত : রবিশঙ্কর
অভিনয় : শাবানা আজমি, নাসিরুদ্দিন শাহ্‌, ওম পুরি, এম কে রায়না।

১৯৮৯ **একদিন অচানক** (হিন্দি/রঙিন)

কাহিনি : রমাপদ চৌধুরী
চিত্রনাটক : মৃণাল সেন
সংগীত : জ্যোতিষ্ক দাশগুপ্ত
অভিনয় : শ্রীরাম লাগু, শাবানা আজমি, উত্তরা বাওকর, রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, অপর্ণা সেন, শোহেল শেঠ।
পুরস্কার : জাতীয় পুরস্কার—শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেত্রী (উত্তরা বাওকর)।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৯৯১ **মহাপৃথিবী** (বাংলা/রঙিন)
কাহিনি : অঞ্জন দত্ত
চিত্রনাটক : মৃণাল সেন
সংগীত : বি ভি করন্থ ও চন্দন রায়চৌধুরী
অভিনয় : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়, অপর্ণা সেন, গীতা সেন, অনসূয়া মজুমদার, অঞ্জন দত্ত।

১৯৯৪ **অন্তরীণ** (বাংলা/রঙিন)
কাহিনি : সাদাত হাসান মান্টো
চিত্রনাটক : মৃণাল সেন
সংগীত : শশী আনন্দ, সমন্বয়ন, বাণীপ্রসাদ বণিক
অভিনয় : ডিম্পল কাপাডিয়া, অঞ্জন দত্ত, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপ্তি রায়, কাজল গুপ্ত, অমল মুখোপাধ্যায়, মৌসুমী মজুমদার, তথাগত সান্যাল।
পুরস্কার : জাতীয় পুরস্কার—শ্রেষ্ঠ বাংলা কাহিনিচিত্র।

২০০২ **আমার ভুবন** (বাংলা/রঙিন)
কাহিনি : আফসার আমেদ
চিত্রনাটক : মৃণাল সেন
সংগীত : দেবজ্যোতি মিশ্র
অভিনয় : নন্দিতা দাশ, কৌশিক সেন, শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী, অরুণ মুখোপাধ্যায়, সায়ন কুণ্ডু, শুভান্বিতা গুহ, শ্রীজাতা ভট্টাচার্য, অসিত বসু, জীবন গুহ, বরুণ চক্রবর্তী, নিমাই লাহিড়ী, অলোক মুখোপাধ্যায়, শিবানী ভট্টাচার্য।
পুরস্কার : শ্রেষ্ঠ পরিচালক—কায়রো চলচ্চিত্র উৎসব
শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী (নন্দিতা দাশ)—কায়রো চলচ্চিত্র উৎসব।

তথ্যচিত্র

১৯৬৭ **মুভিং পারসপেকটিভ্স্** (রঙিন)
তথ্য ও চিত্রনাটক : কে এ আব্বাস, মৃণাল সেন
সংগীত : বনরাজ ভাটিয়া
পুরস্কার : রৌপ্য পদক—নম পেন চলচ্চিত্র উৎসব।

১৯৮২ **ত্রিপুরা প্রসঙ্গ** (রঙিন)
তথ্য ও চিত্রনাটক : মৃণাল সেন
সংগীত : আনন্দশঙ্কর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৯৮৯ **ক্যালকাটা মাই এলডোরাডো** (রঙিন)
তথ্য ও চিত্রনাটক : মৃণাল সেন
সংগীত : আনন্দশঙ্কর

১৯৯৬ **অ্যান্ড দি শো গোজ অন** (রঙিন)
তথ্য ও চিত্রনাটক : মৃণাল সেন
সংগীত : কুমার বোস

দূরদর্শন চিত্র

১৯৮৪ **তসবির আপনি আপনি** (হিন্দি)
কাহিনি : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
চিত্রনাটক : মৃণাল সেন
সংগীত : সঞ্জয় ভট্টাচার্য
অভিনয় : এম কে রায়না, কে কে রায়না, শ্যামানন্দ জালান।

দূরদর্শন ধারাবাহিক

কভি দূর কভি পাস (হিন্দি, ১৯৮৬-১৯৮৭)

পর্ব: **দশ সাল বাদ**
কাহিনি : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
চিত্রনাটক : মৃণাল সেন
সংগীত : চন্দন রায়চৌধুরী
অভিনয় : গিরিশ করনাড, অপর্ণা সেন।

পর্ব: **আজনভি**
কাহিনি : দিব্যেন্দু পালিত
চিত্রনাটক : মৃণাল সেন
সংগীত : চন্দন রায়চৌধুরী
অভিনয় : নীনা গুপ্তা, দিলীপ ধবন।

পর্ব: **শাল**
কাহিনি : নরেন্দ্রনাথ মিত্র
চিত্রনাটক : মৃণাল সেন
সংগীত : চন্দন রায়চৌধুরী
অভিনয় : প্রিয়া তেণ্ডুলকর, দিলীপ ধবন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

পর্ব: **সালগিরা**
কাহিনি : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
চিত্রনাটক : মৃণাল সেন
সংগীত : চন্দন রায়চৌধুরী
অভিনয় : ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়, দীপ্তি নাভাল।

পর্ব: **জিত (১ম)**
কাহিনি : মতি নন্দী
চিত্রনাটক : মৃণাল সেন
সংগীত : চন্দন রায়চৌধুরী
অভিনয় : দীপঙ্কর দে, সুরেখা শিকরি।

পর্ব: **জিত (২য়)**
কাহিনি : মতি নন্দী
চিত্রনাটক : মৃণাল সেন
সংগীত : চন্দন রায়চৌধুরী
অভিনয় : দীপঙ্কর দে, সুরেখা শিকরি।

পর্ব: **দো বহেন**
কাহিনি : নরেন্দ্রনাথ মিত্র
চিত্রনাটক : মৃণাল সেন
সংগীত : চন্দন রায়চৌধুরী
অভিনয় : অনিতা কানওয়ার, নীনা গুপ্তা।

পর্ব: **আজকাল**
কাহিনি : রমাপদ চৌধুরী
চিত্রনাটক : মৃণাল সেন
সংগীত : চন্দন রায়চৌধুরী
অভিনয় : লিলি চক্রবর্তী, মনোহর সিং।

পর্ব: **রবিবার**
কাহিনি : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
চিত্রনাটক : মৃণাল সেন
সংগীত : চন্দন রায়চৌধুরী
অভিনয় : মমতাশঙ্কর, ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়, অশোক লাড।

পর্ব: **আয়না**
কাহিনি : দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়
চিত্রনাটক : মৃণাল সেন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সংগীত : চন্দন রায়চৌধুরী
অভিনয় : নীনা গুপ্তা, পঙ্কজ কপূর, দীপ্তি ভাট।

পর্ব: **স্বয়ম্ভর**
কাহিনি : মৃণাল সেন
চিত্রনাটক : মৃণাল সেন
সংগীত : চন্দন রায়চৌধুরী
অভিনয় : নিখিল ভগত, শোহেল শেঠ, অপরজিতা।

পর্ব: **কভি দূর কভি পাস**
কাহিনি : রমাপদ চৌধুরী
চিত্রনাটক : মৃণাল সেন
সংগীত : চন্দন রায়চৌধুরী
অভিনয় : অনিল চট্টোপাধ্যায়।

পর্ব: **অপরাজিত**
কাহিনি : মৃণাল সেন
চিত্রনাটক : মৃণাল সেন
সংগীত : চন্দন রায়চৌধুরী
অভিনয় : মনোহর সিং, উত্তরা বাওকর।

মৃণাল সেন-কৃত চিত্রনাটক

১৯৫৮ **রাজধানী থেকে** (বাংলা/সাদা কালো)
কাহিনি : নিকোলাই গোগল
সংগীত : নচিকেতা ঘোষ
অভিনয় : কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত, জীবেন বোস, মঞ্জু দে, জহর রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী, শ্যাম লাহা, অমর মল্লিক, হরিধন মুখোপাধ্যায়।

১৯৬১ **কানামাছি** (বাংলা/সাদা কালো)
কাহিনি : শৈলেশ দে
সংগীত : নচিকেতা ঘোষ
অভিনয় : সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার, পাহাড়ী সান্যাল, তপতী ঘোষ, সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মাদেবী, জহর রায়, তুলসী চক্রবর্তী, মাস্টার তিলক, প্রভাবতী জানা, শৈলেন ভট্টাচার্য।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৯৬৬ **জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার** (বাংলা/সাদা কালো)

কাহিনি : প্রমথনাথ বিশী

সংগীত : কালীপদ সেন

অভিনয় : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, রুমা গুহঠাকুরতা, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণকুমার, কমল মিত্র, অসিতবরণ, বিকাশ রায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ রায়।

১৯৬৬ **কাচ কাটা হীরে** (বাংলা/সাদা কালো)

কাহিনি : আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সংগীত : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

অভিনয় : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, লিলি চক্রবর্তী, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, জহর রায়, অপর্ণাদেবী, সবিতাব্রত দত্ত।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নির্দেশিকা

অগাস্ত (লুমিয়ের) ২৪৫
অঞ্জন দত্ত ৯, ১৬৩-১৬৬, ১৯৫, ১৯৭, ২৩৮, ২৩৯
'অন্তরীণ' ২৪০, ২৪১
অপর্ণা সেন ২২৪
'অপরাজিত' ৩১, ২১০, ২১১
অপূর্বকুমার চন্দ ২৪-২৬
অমলদা ১৪
অমলেন্দু চক্রবর্তী ১৩৩, ১৫৩
অমিতাভ বচ্চন ৮৭
'অযান্ত্রিক' ৩২
অরণ্য সেন ২৪২
অরুণ কউল ৮৪-৮৬, ৯০, ১০২
অরুন্ধতী রায় ২
অরোরা স্টুডিয়ো ১৬৩
অর্জুন সিং ১০৫, ১০৬
অলডাস হাক্সলি ২৫, ২৬, ২২৩
অশোক, সম্রাট ৭৭-৭৯
অশোকা গুপ্ত ২৪, ২৫
অসীম দত্ত ৯০
অঁরি লংলোয়া ১২৭-১২৯
অঁরি স্টর্ক ১৭১, ১৭২
অ্যানিয়েস ভার্দা ১৩১, ১৯৪
'অ্যাবসার্ড থিয়েটার' ২১৫
'অ্যাবাউট জন ফোর্ড' ১৬৬, ১৮০
অ্যালবার্ট জনসন ৯৬, ১০১, ১০৪
অ্যালান পার্কার ১৮৬
অ্যালাঁ রেনে ১৮৯
অ্যালেন ক্যামেরন, রেভারেন্ড ২২
'আ কেস ফর কমিউনিজম' ৬১
আইনস্টাইন ৪১
আইনজেনস্টাইন ৪২-৪৪, ১৯৬
আউট্রাম ৩
'আওয়ার অব দ্য ফারনেসেস' ১৭৮
'আকাশ কুসুম' ৭১
'আকালের সন্ধানে' ১৫০-১৫৪, ১৫৭, ২০২
আকিরা ইওয়াসাকি ৩৩-৪০, ৪২-৪৪, ৪৬, ৪৭
আকিরা কুরোসাওয়া ৪৪, ৪৫, ৬৪, ২১৪
'আগন্তুক' ২০৩
আন্তনিয়নি ১৮৬
আন্দ্রে মালরো ১২৭
আন্দ্রেই তারকোভস্কি ১৯৮
আফজল খান ১৩
আফসার আমেদ ২৪১
'আফ্রিকা' ১২৯
'আমার ভুবন' ২৪১, ২৪২
আর্নেস্ট হেমিংওয়ে ২১০, ২৩২, ২৩৩
আলবার্তো মোরাভিয়া ৫
আলব্যের কামু ১৩০
'আলিবাবা' ১৮৮
আশিস বর্মন ৭১, ৭২, ৯৬, ১০৭
আঁদ্রে ডেলভো ২৪৬

ইউজিন প্যালসি ২০১
ইউসুফ শাহিন ১৩১, ২৪৬
ইনস্‌পায়ার্ড ননসেন্স ৮৯
'ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম গাইড' ২১৪
ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন স্কুল, কিউবা ২৩০

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'ইন্টারভিউ' ৯৬, ৯৭, ১০২, ২০৯
'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' ১৪৩
ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউট ২০০
ইন্দিরা গাঁধী ৮৬, ১০৬, ১১৭
ইবসেন ২০৩
ইয়রিস ইভেন্স্ ১৭১, ১৭২, ২৩৩
ইয়ামাহাতা ইয়াসুকে ৩৫
ইলমাজ গুনে ১৪৫, ১৮৬

উইনস্টন চার্চিল ৪
উটে (গ্রাস) ৫
উৎপল দত্ত ৭৪, ৮৬-৮৮, ৯১
উনো নোগুচি ৩৬, ৩৭
উমবের্তো সোলাস ১৮৩, ১৮৬, ২৩২
উলরিশ গ্রেগর ১১৫, ১১৬

ঋত্বিক ঘটক ৩২, ৫৭, ৬৬, ৭২, ১১৭-১২০

'একদিন অচানক' ১৪৩, ২৩৩
'একদিন প্রতিদিন' ১৩৩, ১৩৪, ১৪৫-১৪৮, ১৯২
এত্তরে স্কোলা ১৮৬
'এনক আর্ডেন' ৬২, ২২৩
'এপ্ অ্যান্ড এসেন্স' ২৬
এম কে রায়না ২১৬
এম জে আকবর ১১৬
এরিকা ১৭২
এলিয়ান স্টুটারহাইম ১৪৫, ১৬৮, ১৭০, ১৯৭, ২০০, ২০৭, ২১৪, ২৩৩
এসপিনোজা ২৩২

'ওকা উড়ি কথা' ১২২, ১৩০, ১৩২, ১৭৭, ২২৪
ওয়ার্নার হাইসেনবার্গ ৪১
'ওয়েটিং ফর গোডো' ১৪৩
'ওয়েডিং ডে' ২৭
ওম পুরী ২১৬
ওসমান সেমবেন ১৩১, ১৯৪

'কফন' ১১৭, ১২১, ২২৪
'কভি দূর কভি পাস' ২২৪
কমল হাসান ২২৬
কমলকুমার মজুমদার ২৩১
করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৮
'কলকাতা ৭১' ৯৫, ১০২, ১০৩, ১০৫, ১০৬, ১৭৩
কলিম সরাফি ৫৭
'কল্লোল' ৭৪
কান চলচ্চিত্র উৎসব ১১২, ১২৩, ১৪৫-১৪৭, ১৬৬, ১৬৯, ১৭০, ১৭৭, ১৭৯, ১৮০, ১৮২-১৮৭, ১৯৭, ২০৫, ২০৭, ২০৮, ২১৮, ২৩৬
কান ক্লাসিক্স ২০৮
'কাবুকি' ৩৩, ৪২-৪৪, ৪৬
কায়রো চলচ্চিত্র উৎসব ২৪২
কার্থাজ ফিল্ম উৎসব ১৭৭
কার্ল ড্রায়ার ৩১, ২১১
কার্লো আলভারেজ ১৭১, ১৭২
কার্লো সওরা ১৯৮
'কালিঘাট টু ক্যালকাটা' ২
কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী ১১, ৮১
কাসিকো কাওয়াকিতা ৪৪, ১২৮
কিং ভিডর ১৩১, ২০৪, ২০৫
কিরণময় রাহা ৮১
কুণাল ৬৩, ৮৭, ৯৩-৯৫, ৯৯, ১০১, ১১২, ১২৬, ১৫৫, ১৬৩, ১৭৩, ১৮৫, ১৯৯, ২০০, ২০২, ২০৮-২১৩, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৮
কৃষ্ণ মেনন, ভি কে ৩১, ৮৫
কৃষ্ণমূর্তি ১২৫, ১২৬
কে কে মহাজন ৮৭, ৯৫, ৯৮, ১০১, ১৮৭
'কোরাস' ১১৩, ১১৫
গোল্ডেন লোটাস প্রাপ্তি ১১৫
কোস্টা গাভরাস ১৮৬
ক্যাকটাস ফিল্ম/ক্যাকটাস গ্রুপ ১৪৫, ১৪৬, ১৪৮, ১৮৭, ১৯৪, ১৯৭, ২০৫, ২০৭, ২০৮, ২১৪, ২৩৩

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ক্যারেল রাইস ১৩১, ১৬৭
'ক্যালকাটা' ১, ৩
ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি ৩০, ৬৫
ক্রিস্টোফার কডওয়েল ২০৯, ২১০
ক্লদ রেনোয়া ৬৩
ক্লাইভ, লর্ড ৪

'খন্ডহর' ১৯৪, ১৯৯, ২০৪, ২০৭, ২০৮, ২১৪, ২৩০
খয়ের খাঁ ৫৪
'খারিজ' ১৬৩, ১৬৪, ১৬৬-১৭০, ১৮৭, ১৯৫, ১৯৭, ১৯৯, ২০০, ২০৫, ২১৮
খুশবন্ত সিংহ ২

'গণশত্রু' ২০৩
'গাঁধী-জিন্না মিটিং এগেইন' ৭৩
গাঁধীজি দ্রষ্টব্য মহাত্মা গাঁধী
গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক ২২০
'গার্ডিয়ান লেকচার' ১৪৭
গিরিশ কারনাড ২২৪
গীতা ৪৫, ৬৪-৫৬, ৫৯-৬৩, ৭৫, ৮৭, ৯৩, ৯৫, ৯৯, ১১২, ১১৯, ১৩০, ১৩১, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৬, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৯, ১৬৩, ১৬৯, ১৭০, ১৭৩, ১৮৩, ১৯২, ১৯৫, ১৯৭, ১৯৮, ২০০, ২০২, ২০৯-২১১, ২১৭, ২২২, ২২৩, ২২৬, ২২৯, ২৩৪, ২৩৬, ২৪৩, ২৪৪
গুন্টার গ্রাস ৪-৬, ১৮৮
গুপ্পা কোম্পানি ১২৪
গুলজার ৭
'গোল্ড স্পাইক' ২০০
গোল্ডেন লায়ন পুরস্কার ১৬২
গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ ১১২, ১৮২, ১৮৩, ১৮৬, ১৮৭, ২৩০, ২৩১
গ্রেগরি পেক ২২৬, ২২৭, ২২৯
'গ্রেট ডিক্টেটর' ৩৮, ২৩৫
'গ্রেপস অফ রথ' ১৬৬
গ্লবার রশা ১৭৫-১৭
গ্লেসিয়ের ১৭৪, ১৭৫
গ্যালাচার ৬১

'ঘরে বাইরে' ২০৭
ঘোষণাপত্র, ভিক্টোরিয়া-র ৮০

চিত্তরঞ্জন দাশ, দেশবন্ধু ১৮
চিদানন্দ দাশগুপ্ত ৬৫
'চারুলতা' ২০৫
'চার্লি চ্যাপলিন' ৬৩
'চালচিত্র' ১৬৩
চ্যাপলিন ৩৭, ৩৮, ৫৯, ৬৩, ১১২, ১৮৩, ২৩৪-২৩৬, ২৩৮, ২৪০, ২৪২, ২৪৩, ২৪৮

ছেদি জগন ৮১

জঁ রুশ ২৪৬
জঁ রেনোয়া ৬৩, ১১৬, ২২৭
জওহরলাল নেহরু ৪৮, ১১৪, ১২২ দ্রষ্টব্য পণ্ডিত নেহরু
জগদীশ চৌখানি ১৮৮, ১৮৯, ২০৪
জন স্টাইনবেক ১৬৬, ১৬৭
জন স্টুয়ার্ট মিল ১৮৫
জর্জ ট্রেভিলিয়ন, স্যার ৪
জর্জ শাদুল ২৮
জসিমউদ্দিন, কবি ৫১, ৫২, ৫৬
জাঁ লুক গোদার ৪৪, ১৭৯, ১৮৬, ২০১
জাক তাতি ৬৪, ৬৯
'জাপান-যাত্রী' ৩৬
জাভাত্তিনি ৬৪
জারজি স্কলিমভস্কি ১৮৬
জিন মাসকোভিচ ২৮, ১৬৮-১৭০
জিল জ্যাকব ১৬৯, ১৭০, ১৮৭, ১৯৫, ২০৫, ২০৭, ২০৮, ২১৭, ২৩৬, ২৩৭
জীবনানন্দ দাশ ১৩০
জুবিলি পার্ক ১২
জুলিয়া (আলভারেজ) ১৭১, ১৭২

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নীরেন রায় ৬৯
'নীল আকাশের নীচে' ৩১, ৩২
নৃপেন গঙ্গোপাধ্যায় ৫৭
নেহরু, পণ্ডিত ৩১, ৩৪, ৩৭, ৫০, ১১৬, ১১৭
'নোটস ফ্রম দ্য গ্যালোজ' ৬০
নোরিয়াকি সুচিমোতো ৩৩, ৪৫
ন্যাশনাল ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন ৮৬
ন্যাশনাল ফিল্ম থিয়েটার, লন্ডন ২৮, ১৪৭

'পথের পাঁচালী' ৩০, ৬৫, ৯০, ৯৮, ৯৯, ১৬২, ২০৭
'পদাতিক' ১০২, ১০৭, ১১০
'পরশুরাম' ১৩৩
'পরিচয়' ১১৪, ১১৫
পল চট্টোপাধ্যায় ১১০
পল রোথা ৪৬
পাবলো নেরুদা ৫৭, ৫৯, ১২১, ১২৩
'পাম দ' ১৭৯
পি সুন্দরায়া ১২৫
পিটার কাওই ২১৪
পিটার বোইসে ১৩৩
পিয়ের পাওলো পাসোলিনি ৫
পূর্ণ দাস ১৫, ১৬, ১৮
প্যাট্রিসিয়ো গুসমান ১৭৩, ১৭৪
'প্যাশন অব জোয়ান অব আর্ক' ৩১
'প্রতিদ্বন্দ্বী' ১০০
প্রবোধকুমার স্যান্যাল ১০৪
প্রাগ চলচ্চিত্র উৎসব ১০২
প্রাণ চোপরা ৭২
প্রেমেন্দ্র মিত্র ১৮৯, ২০৫-২০৭

ফরিদপুর ১০-১২, ১৬, ১৮-২২, ৫০
ফার্নান্দো বিরি ২৩২
ফার্নান্দো সোলানাস ৯৪, ১২৩, ১৭৭-১৭৯, ২৪৬
ফিলিপ ইয়ারমাস ২০৪
'ফিল্ম' ৩০
ফিল্ম ফাইনান্স করপোরেশন ৮৫, ৮৯, ৯৩
ফেডেরিকো মাইয়র ২৪৫, ২৪৬
'ফ্রন্টিয়ার' ১০৮
ফ্রাঙ্ক কাপরা ২২৭
ফ্রান্সিস ফোর্ড কোপোলা ২০৪
ফ্রেডরিক নিৎসে ৩০
ফ্র্যাংক ব্রুনে ২০২

বংশী চন্দ্রগুপ্ত ৬৫, ৭৩, ১১৭
বনফুল ৮৭
'বন্দেমাতরম' ১২
বব ডিলান ৯
বব রাইট ১১৮
'বরিনাজ' ১৭১
বলশেভিক বিপ্লব ১৮
'বাইশে শ্রাবণ' ২৪-২৬, ২৮, ২৯, ৩২, ১২৯, ১৫৭, ১৫৯, ১৭০
'বাদ্‌সাহাৎ কা খত্‌মা' ২৩৯
বাদল সরকার ৭৪, ৭৫
বাবুলাল চৌখানি ১৮৮
'বায়োস্কোপ ফিল্ম' ১৮৮
বারট্রান্ড রাসেল ১৪
বারট্রান্ড ট্যাভারনিয়ার ২৪৬
বার্নাডো বার্তোলুচি ১৯৪, ২০০
বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসব ১১৫, ১৬৯, ১৭২, ১৭৫, ১৮১, ২০৫
বাল গঙ্গাধর তিলক ১১
বাসুদেব রাও ১২৪
বি কে কারাঞ্জিয়া ৮৯
বি ডি গর্গ ১২৯
বি ভি করন্থ ১৮৭
বিজন ভট্টাচার্য ৭৪
বিজয় রাঘব রাও ৮৭
বিপিনচন্দ্র পাল ১১, ১২
বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ৫৭
বিলি ওয়াইলডার ৬০
বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ২০

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'বেলে লেটার' ২২২
বেসিল রাইট ৪৫, ১০৬, ১৭১
'ব্যাটল অব চিলি' ১৭৩
'ব্রিটানিয়া হসপিটাল' ১৬৭, ১৮০
'ব্রুটালাইজেশন অফ ফ্রান্‌জ ব্লুম' ১৮৮

ভলকার স্লেয়েনডর্ফ ১৮৮
ভারতীয় গণনাট্য সংঘ ৭৪
ভিক্টোরিয়া, রানি ৩, ৭৯-৮১
ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ৩, ৭৯, ৮০, ২১২, ২১৩
ভিত্তোরিও ডি সিকা ৬৪, ১৯৬
ভিম ভেন্ডারস ১৮৬
'ভুবন সোম' ৮৭-৯৩, ৯৫, ১০২, ১১৯, ১২৭, ১২৮, ২৩০
ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসব ২৭, ২৮, ১২৭, ১২৮, ১৬২, ১৬৩, ১৭০, ১৯৪, ১৯৮, ২০০, ২৩৪, ২৩৫
'ভ্যারাইটি' ২৮, ১৬৮, ১৬৯

মধু বসু ১৮৮
মমতাশংকর ১১৮, ১২৫, ১৬৩-১৬৬, ১৯৫, ১৯৭
মরিৎস দ্য হ্যাডেল্‌ন ৪৫, ১৭২
মস্কো চলচ্চিত্র উৎসব ১১৩
মহাত্মা গাঁধী ১১, ২৫, ২৬, ৩২, ৩৪, ৪৮-৫০, ৫৬
'মহাপৃথিবী' ২৩৯
'মাই রোমান্টিক অ্যাসোসিয়েশন উইথ ক্যালকাটা' ৬
মাইকেল কাকোয়ানিস ১৩১
মাও সে তুং ৯৩, ১৩১
'মাটির মণিশ' ৮১-৮৪
'মানকড়' ১৫৬, ১৫৮
মানহাইম ফিল্ম উইক ১৭৩, ১৭৪
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৩
মার্শাল জুকভ ৩৭, ৩৮
'মাসেস অ্যান্ড মেইন [illegible]
মিখাইল গর্বাচেভ ২৩৮
মিঠুন চক্রবর্তী ১১৮
'মিনামাতা' ৪৬
মির্জা গালিব ৬
মিশেল পিকোলি ২৪৬
'মুক্তিমার্গ' ২২৪
মুন্সি প্রেমচাঁদ/প্রেমচন্দ ১১৭, ১২১, ১২২, ১২৪
মুসলিম লিগ ১৩
'মৃগয়া' ১১৭-১১৯
মৃন্ময় চক্রবর্তী ১৯৪, ২৩৩
মেড হোন্ডো ১২৯
মোহিত চট্টোপাধ্যায় ১১২, ১১৩, ১২১, ১২৬, ১৩২, ২১৫, ২২৩
'ম্যাজিক মাউনটেন' ৬৯
ম্যানহাটান প্রোজেক্ট ৪০, ৪১
ম্যানুয়েল ১৭১

রঞ্জিত মল্লিক ৯৭-১০২, ২০৯
রথীন ভট্টাচার্য ৮, ৯
রব গ্রিয়ে ১৮৯
রবার্তো রোসিলিনি ৬৪
রবিশঙ্কর, পণ্ডিত ২১৭
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯, ২৪, ২৫, ৩৪, ৩৬, ৩৭, ৫২, ১১৪, ১২৯
রমাপদ চৌধুরী ১৬৩, ২৩৩
রাইনার্ড হফ ১৮৮, ২০০-২০২, ২১৪
'রাতভোর' ৩০, ৩১
'রামলীলা' ৭৩
রিচার্ড অ্যাটেনবরো ১১৭
রীতা জুৎসি ২৩৯
রুজভেল্ট ৪১
রুডইয়ার্ড কিপলিং ৪
রুডলফ আর্নহেইম ৩০
রেবা ৫০-৫৩, ৫৬
'রেসিডেন্স অন আর্থ' ১২১
রোনাল্ড কোলম্যান ৫৫
রোবেয়ার ফ্রেবে লে ব্রে ১৮৬

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রোবেয়ার ব্রেসঁ ১৯৮, ১৯৯

লক্ষ্মী (ঘটক) ১২০
লন্ডন চলচ্চিত্র উৎসব ২৮, ২৯, ২৩৪
লরেন্স অলিভিয়ের ১৮২
'লস্ট হরাইজন' ৫৫
'লায়ন হ্যাজ সেভেন হেডস' ১৭৫, ১৭৬
লাল বাল পাল ১১
লালা লাজপত রায় ১১
লিন্ডসে অ্যান্ডারসন ১১৩, ১৩১, ১৬৬, ১৬৭, ১৭৯, ১৮০, ১৮৬
লুই মাল ৮, ৯, ১০৫, ১২৮, ১২৯
লুই লুমিয়ের ২৪৫-২৪৭
লোকনাথ ভট্টাচার্য ৯০
লোটে আইসনার ১২৮
লোলা ২৩২, ২৩৩

'শতরঞ্জ কী খিলাড়ি' ১১৭
শম্ভু মিত্র ৭৪, ১৪৩
শরৎচন্দ্র বসু ৩২
শশী আনন্দ ৫৪
'শাখা-প্রশাখা' ২০৩
শান্তিসেনা ১৬
শাবানা আজমি ১১৭, ২১৬
শিবাজি ১৩
শুভেন্দু মুখোপাধ্যায় ১৩২
শেখর চট্টোপাধ্যায় ৮৬
শৈলেশ সেন ৫১
'শো ইয়োর টাং' ৫, ৬
'শোল্ডার আর্মস' ৩৭
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১২, ১৩, ৬৭
শ্রীলা মজুমদার ১৪৪, ১৪৬, ১৫১

সজল রায়চৌধুরী ১১৮
সঞ্জীবকুমার ১১৭
সত্যজিৎ রায় ৩০, ৩২, [illegible]
১০০, ১১৬, ১১৭, [illegible]
১৪৮, ১৬২, ১৭০, ২০২, ২০৩, ২০৫, ২০৭, ২০৮, ২১০, ২১১, ২২৭
'সভ্যতার সংকট' ১৯
সমর সেন ১০৮
সমরেশ বসু ১০৪, ২১৫
সরযূবালা সেন ১২
সলিল চৌধুরী ৫৭, ৬৬, ৭২
সাদাত হাসান মানটো ২৩৯
সাধনা বসু ১৮৮
'সানডে' ১১৬
'সানডে অবজারভার' ১৪৮
সালভাদোর আইয়েন্দের ১৭৩
সিটি লাইফ ফাউন্ডেশন ২৩৩
সিনেমাথেক ১২৭, ১২৮
(ড.) সুধেন্দু মুখোপাধ্যায় ১৩২, ১৩৩
সুনীতি চট্টোপাধ্যায় ১২২
সুব্রত মিত্র ৬৫
সুভাষচন্দ্র বসু ১২, ১৩, ২১, ৩২
সুলতানিয়া ৯৯, ১০১
সুসুমো হানি ১৩১
সুহাসিনী মূলে ৮৭
'সেভলোড পুডভকিন ৬৩
'সেভেন ইয়ার ইচ' ৬০
সৈয়দ জাফরী ১১৭
সোমরাবাজার ১৫০, ১৫৪, ১৫৫
'সোলেই হো!' ১২৯
সোহেই ইমামুরা ১৯৮
স্কটিশ চার্চ কলেজ ১৩
'স্টেজকোচ' ১৬৬
'স্টেটসম্যান' পত্রিকা ১৯৯
স্ট্যানলি কাউফম্যান ১৬৪, ১৯৭
স্তালিন ৩৭, ৩৮
স্পেনসার ট্রেসি ২৩২
'স্বয়ম্বর' ২২৫
স্মিতা পাতিল ৬[illegible]১, ১৫২, ১৫৬-১৫৮, [illegible]
স্যামুয়েল বেকেট ১৪৩

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হর্হেস সানসিনেস ১৭৭
হাইকু ৩৬
'হাইয়েস্ট ডিপ্লোমা অফ দি ইয়ার, ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ ফিল্ম ক্রিটিকস অ্যাসোসিয়েশন' পুরস্কার ১১৩
হাতুই ১৫০
হান্স আইসনার ১২৮
হারজগ ১৮৬
'হারভেস্ট ৩০০০ ইয়ারস' ১২৯
হিচকক ১৮২
হিন্দু মহাসভা ১২, ৬৭
হিটলার ৩৭
হিম্মৎ সিং ৮৫, ৮৬
'হিরোশিমা' (বই) ৩৯
হিরোশিমা ৩৪-৩৯, ৪১, ৪২
হীরেন মুখোপাধ্যায় ৩১
হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায় ৫৮, ৬৫, ৭২
হেইলে জেরিমা ১২৯
হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ৩১
হেলমা স্যানডারস ব্রাহামস ১৮১

Aesthetics of Violence ১৭৭
Alexander Walker ২১৮
Antonio das Mortes ১৭৬

Ballad of Narayama ১৯৮
Bertrand Tavernier ২১৪
Bicycle Thieves ১৯৬
Blood of the Condor ১৭৭

Calcutta, My El Dorado ২৩৩
Cecilia ১৮৩, ১৮৪, ১৮৬
Coup de Foudre ২১৪

Deep Focus ২১৮
Diane Kurys ২১৪
Diary For My Children ২১৪

E La Nave Va ২১৪
Eyeless in Gaza ২২৩

Federico Fellini ২১৪
Fidel Castro ২৩০
Fipresci-র আন্তর্জাতিক স্তরের পুরস্কার ১১৩

Ganashakti ২১৯
Geoff Brown ২১৮

If... ১১৩, ১৭৯
Il Tutto Chaplin ২৩৪
Illusion and Reality ২০৯

Jack Long ১৯৪
Jackie Coogan ২৩৬
Jean-Claude Carriere ২১৯
John Huston ২১৪

Kaos ২১৪
Knife in the Head ২০২

L' Argent ১৯৯
L' Express ১৪৭
Last year at Marienbad ১৮৯
Les Lettres Francaise ২৮
Les Visiteurs de Cannes ৭২
Libération ২১৯
Living to Tell the Tale ১৮৩

M. K. Raghavendra ২১৮
Madadayo ২১৪
Mérta Meszáros ২১৪
Moving Perspectives ৮১

Nostalgia ১৯৮

Our Films, Their Films ১১৬

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

Outside in the Teaching Machine ২২০

Passion of Joan of Arc ২১১
Paris Texas ২১৪
Prenom Carmen ২০১

Somerset Maugham ২২৮, ২২৯

Taviani Brothers ২১৪
Ten Days in Calcutta: A Portrait of Mrinal Sen ২০২, ২১৪
The Autumn of the Patriarch ২৩১
The Childhood of Ivan ১৯৮
The Hour of the Furnaces ৯৪
The Italian Journey ১৯৮
The Kid ২৩৬, ২৩৭
The Negro Street ২০১
The old man and the Sea ২৩২
The Spanish Earth ২৩৩
The Standard ২১৮
The Times ২১৮
Thus Spake Zarathustra ৩০

Un Dimanche à la Campagne ২১৪
Under the Volcano ২১৪
Utpal Dutt ২১৯

Wim wenders ২১৪

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জুলিয়াস ফুচিক ৫৯, ৬০, ৮৪
'জেনেসিস' ২১৫, ২১৮, ২২০, ২২১, ২৩৩
জেমস ক্যামেরন ৬, ১০২, ১০৭, ১১০
জেমস ম্যাশন ২২৭
জেরালডিন চ্যাপলিন ১৮৩-১৮৫
জেরোম কে জেরোম ২২২
জোন ফনটেন ১৮২, ১৮৩
জোব চার্নক ২, ৩
জঁ্য-ক্লদ কেরিয়ার ২১৯, ২২০
জ্যাক লং ২২১

টনি রিচার্ডসন ১৩১, ১৬৭
টম অলটার ১১৭
'টম জোনস' ১৩১
টম লাডি ১৭৬
টমাস অ্যালিয়া ২৩২
'টিন ড্রাম' ৪, ১৮৮
টেনিসন ৬২, ২২৩

'ডিকেন্স, গ্রিফিথ অ্যান্ড ফিল্ম টুডে' ১৯৬
ডেভিড অক্টারলোনি ৩
ডেভিড ওভারবি ২০১
ডেভিড ফেরারিয়ো ২০০, ২০১
ডেভিড রবিনসন ২১৪
ডেভিড স্ট্রাটন ১৮১
ডেরেক ম্যালকম ১৪৭, ২৩৪
ডোনাট জয়েশ ১৪৫

তাপস সেন ৫৬, ৬৬, ৭৩
তাভিয়ানি ব্রাদার্স ১৮৬
তৃপ্তি মিত্র ১৪৩, ১৪৪
তেলেনাপোতা আবিষ্কার ১৮৯, ১৯০

'থ্রি মেন ইন আ বোট' ২২২

'দশ সাল বাদ' ২২৪
'দি ফ্লাউনডার' ৪
'দি সেন্ট অফ ইন্ডিয়া' ৫
দীনেশচন্দ্র সেন ১১
দীপঙ্কর মুখোপাধ্যায় ১০
দীপঙ্কর হোম ৪০
দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৪, ১১৫
দুলাল কবিরাজ ১৫৭
'দৈনিক যুগান্তর' ৫৭
'দ্য গার্ডিয়ান' ২৩৪
'দ্য ট্রেইটর' ১৭৫
'দ্য ফার্স্ট ইয়ার' ১৭৩
'দ্য ফিউজিটিভ' ৫৮
'দ্য মাভেরিক মায়েস্ত্রো' ১০
'দ্য রিভার' ৬৩, ১১৬
'দ্য লোনলিনেস অফ দ্য লং ডিসট্যান্স রানার' ১৩১
'দ্য স্টেটসম্যান' ৭১

ধৃতিমান ১৫৭

'নকশিকাঁথার মাঠ' ৫২
'নট টু স্পিক অফ আ ডগ' ২২২
নন্দিতা দাস ২৪২
'নবান্ন' ৭৩
নরম্যান বেথুন ২১০
নাউম ক্লিম্যান ৪৪
'নাগরিক' ৩২
নাগিসা ওসিমা ১৯৪, ২২৯, ২৩০
নাতালি সারৎ ৯০
নাসিরুদ্দিন ২১৬
'নিউ রিপাবলিক' পত্রিকা ১৯৭
নিকোলাই চেরকাসভ ৬৩
নিমাই ঘোষ ১০০
নিয়োঁ চলচ্চিত্র উৎসব ৪৫, ১৭১, ১৭২
নিল্‌স বোর ৪১, ৪২
নিশা ১৫৫, ১৬৩, ২০০, ২০২, ২০৮, ২০৯, ২১১, ২১৩, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৮
নীতিশ রায় ১৬৭, ১৬৮

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও